অরণ্যের অধিকার
মহাশ্বেতা দেবী

অরণ্যের অধিকার

মহাশ্বেতা দেবী

(১৯৭৯ সালে অকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত)

করুণা প্রকাশনী / কলকাতা-৯

ISBN : 81-8437-084-9

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৮৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : কার্তিক ১৩৮৬
তৃতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৮৬
চতুর্থ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৮৭
পঞ্চম মুদ্রণ : ১লা বৈশাখ ১৩৮৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৮৯
সপ্তম মুদ্রণ : পৌষ ১৩৯০
অষ্টম মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩
নবম মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫
দশম মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯৯
একাদশ মুদ্রণ : মাঘ ১৪০২
দ্বাদশ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪০৪
ত্রয়োদশ মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪০৫
চতুর্দশ মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪০৮
পঞ্চদশ মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪১০
ষোড়শ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১২
সপ্তদশ মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৩
অষ্টাদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১৫
ঊনবিংশ মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৪১৫
বিংশ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৬
একবিংশ মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১৬
দ্বাবিংশ মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৪১৮
ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ, ১৪১৮

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রণ :
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা—৭৩

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

বর্ণ সংস্থাপন :
প্রদীপ্তা লেজার
১/৫ তারক কৃষ্ণ নস্কর লেন
কলকাতা-১০

মূল্য : ৮০.০০

উৎসর্গ

মঞ্জু ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে

ভূমিকা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিরসা মুণ্ডার নাম ও বিদ্রোহ সকল অর্থেই স্মরণীয় ও তাৎপর্যময়। এ দেশের যে সামাজিক ও অর্থনীতিক পটভূমিকায় তাঁর জন্ম ও অভ্যুত্থান, তা কেবলমাত্র এক বিদেশী সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, একই সঙ্গে এ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। এ সমুদয় ইতিহাসের বিবেচনা ভিন্ন বিরসা মুণ্ডা ও তাঁর অভ্যুত্থানের যথার্থ বিবেচনা অসম্ভব।

লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না। আমার বিরসা কেন্দ্রিক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।

তবু উপন্যাস সর্বদাই তার আঙ্গিকরীতি মেনে চলে। এ উপন্যাসও তাই শেষ করতে হয় বিরসার মৃত্যুতে। কিন্তু জীবন, বিদ্রোহ, যা কিছু চলমান তার সত্যতা কোনোকালে কোনোদেশে নেতার মৃত্যুতে শেষ হয় না। কালে-কালান্তরে উত্তরাধিকারের ধারাপথে অব্যাহত থাকে তার অগ্রগতি। বিদ্রোহ থেকে জন্ম নেয় বিপ্লব। আমার উপন্যাসের সমাপ্তির পরেও তাই সংযোজন করতে হয় পরিশিষ্ট।

এই উপন্যাস রচনায় সুরেশ সিং রচিত "Dust storm and Hanging Mist" বইটির কাছে আমি সবিশেষ ঋণী। সুলিখিত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি ছাড়া বর্তমান উপন্যাস রচনা সম্ভব হত না।

অরণ্যের অধিকার ১৯৭৫ সালে 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ হয়। বর্তমান বই সেই একই উপন্যাসের পরিমার্জিত রূপ। বইখানি প্রকাশ করে প্রকাশক আমার ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবী

অরণ্যের অধিকার এবং ....

১

"অরণ্যের অধিকার" বই হিসেবে বেরোয় ১৯৭৭ সালে। বইটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পায় ১৯৭৯ সালে। এই বই লেখার কথা আমার মনেই হত না হয়তো। আগে এই বই লেখার পিছনের ইতিহাস একটু বলা যেতে পারে। ১৯৭২ / ৭৩ সালে প্রয়াত চিত্রপরিচালক শান্তি চৌধুরি আমাকে কে. এস. সিং রচিত "ডাস্ট স্টর্ম অ্যান্ড হ্যাংগিং মিস্ট" বইটি পাঠিয়ে দেন। অনুরোধ জানান, বিরসা মুণ্ডাকে নিয়ে কিছু লিখতে। শান্তি চৌধুরি বিরসাকে নিয়ে একটি ছবি/তথ্যচিত্র, কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন। কে. এস. সিং হল কুমার সুরেশ সিং-এর নাম। সুরেশ সিং-এর সেই বইয়ের নাম ছিল "ডাস্ট স্টর্ম অ্যান্ড হ্যাংগিং মিস্ট"। প্রকাশ করেছিলেন ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়। ফার্মা কে. এলের বইটি শেষ হয়ে যাবার সময়ে বোঝা গিয়েছিল বইটি খুব সমাদৃত হয়েছে। এর পরে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস "বিরসা মুণ্ডা অ্যান্ড হিজ মুভমেন্ট" নামে প্রথম বইটির সংশোধিত ও পরিমার্জিত অক্সফোর্ড সংস্করণ বের করেন। এরপর ওই বই বের করে সীগাল। তৃতীয় সীগাল সংস্করণের নামও দেখছি "বিরসা মুণ্ডা"। এই বই নিয়ে আরেকবার পড়তে বসলাম। এর পিছনে আছে "ভাষাবন্ধন"-এর প্রধান সম্পাদকের নির্দেশ। "ভাষাবন্ধন"-এর জন্য এবার "অরণ্যের অধিকার" নিয়েই লিখতে হবে। প্রধান সম্পাদক তাড়া দিলে কিছু লেখা লিখেও ফেলি। কয়েকটি লেখা সেভাবেই লিখেছি। তাই এ লেখাটিও লিখতে চেষ্টা করছি। একটা দরকারি কাজই সেরে ফেলা গেল। ১৯৭৭-এ বইটি বেরোয়। তার আগে, অর্থাৎ শান্তি চৌধুরির অনুরোধে সুরেশ সিং-এর বই পড়ে ফেলার পর "উল্টোরথ" কাগজে বোধহয় একটি ছোটো লেখা লিখে ফেলেছিলাম। উপন্যাস লেখার ইচ্ছেটা থেকেই যায়। তারই ফলশ্রুতি "বেতারজগৎ" কাগজে ধারাবাহিক "অরণ্যের অধিকার" উপন্যাস প্রকাশ। তারপর বেরোয় বই।

এই বইয়ের বিষয়ে আরও কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সে সময়ে হিন্দিতে আমার বই অনূদিত হয়ে প্রকাশ হচ্ছিল। হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করছিলেন রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন। "অরণ্যের অধিকার" হিন্দিতে অনুবাদ করেন জগৎ শংখ্ধর। উনি দিল্লিতেই ছিলেন সে সময়ে। আমি একবার দিল্লি গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখাও করলাম। ইনি তখন খুব বৃদ্ধ। খুব আত্মস্থ। সম্মানী মানুষ। কী নিষ্ঠায় ওই বইয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন ও অনুবাদ করেন। কী বলি! ইনি প্রেমচন্দ্-এর সাথী ছিলেন। রাজনীতি করা মানুষ। জগৎজি তাঁর অনূদিত বইয়ের সর্বভারতীয় পরিচিতি দেখে যাননি। "অরণ্যের অধিকার" হিন্দিতে "জঙ্গল কে দাবেদার" নামে বেরোয়। ১৯৭৯ সালে বাংলা বইটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পায়। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি হিন্দি বইটি ভারতে বিশাল বিক্রি হয়ে চলেছে। হিন্দি বইটি দীর্ঘকাল অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত। আজ হিন্দি থেকে গুজরাটি, মারাঠি, রাজস্থানি,

পাঞ্জাবি, নানা ভাষায়, আর বাংলা থেকে উড়িয়া ও অসমিয়াতে অনুবাদ হয়েছে। খুব অভিভূত হওয়ার মতো খবর। ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত সকল অঞ্চলেই বিরসা আজ এক বন্দিত নাম। দূরদূরান্তে বিরসা মুণ্ডার স্ট্যাচু, তাঁর নামে স্কুল, জলাশয়, এমন কত কী! বিরসা একমাত্র আদিবাসী, যাঁর ছবি পার্লামেন্টে শোভা পায়। বলা যায়, বিরসার আন্দোলন স্বীকৃতি পেয়েছে।

যাক্, "অরণ্যের অধিকার" নিয়ে লেখা শুরু করার প্রারম্ভে নিজের কিছু অমার্জনীয় ত্রুটি সংশোধন করে নিই। (১) কুমার সুরেশ সিং-এর লেখা সীগাল সংস্করণে দেখছি তিনি একটি চমৎকার কথা লিখেছেন। "মহাশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার'-এর নামকরণে অরণ্যের বিপন্নতার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। বিরসার আন্দোলনের পিছনে অরণ্যজনিত উদ্বেগ যত, তার চেয়েও বড়ো উদ্বেগ ছিল আদিবাসীদের জমি-ভূমি চলে যাওয়ার জন্য বিপন্নতা।"

আজ সুরেশ সিং বেঁচে নেই। থাকলে হয়তো এ বিষয়ে তাঁর আর আমার কথা হত। আমি আদিবাসী মানুষদের জমি-ভূমি থেকে নিরন্তর, লাগাতার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দুই-আড়াই দশক ধরে লড়ে যাচ্ছি কাগজে লিখে, তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে, সে কাজ আজও চলছে। ব্রিটিশসরকার, ভারতসরকার, রাজ্যসরকার, আদিবাসী জমি হরণের কাজ করে চলেছে লাগাতার। এই ২০০৬ সালেও "শিল্পায়ন" কর্মসূচির নামে উত্তর ২৪ পরগনায় যে বিশাল জমি অধিগৃহীত হল, তার কারণেও ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতালদের জমি চলে গেল। এঁরা প্রায় দেড়শো বছর ধরে ওখানে চাষ করছিলেন। অর্থ? বিরসার আন্দোলনের পিছনে জমি-ভূমি থেকে উচ্ছেদের কারণে যে ক্ষোভ এবং নিরাপত্তাহীনতার ভয় জমে ওঠে, তার কারণেই আন্দোলন তীব্রতা পায়।

আমি অরণ্যের অধিকার চলে যাবার কথার ওপর জোর দিয়েছিলাম। জমি-ভূমির ওপর সেদিন তত জোর দিইনি। আবার ১৯৮০-র দশক থেকে জমি-ভূমি (কৃষিজমি-বাসভূমি) থেকে আদিবাসী উচ্ছেদ নিয়েই অনেক লড়াই করেছি সহযাত্রীদের সঙ্গে। আজ, কী আশ্চর্য জল-জঙ্গল-শস্যক্ষেত্র সবই আক্রান্ত, লুণ্ঠিত। গত ৩০ বছরে অরণ্যজেলা পালামৌ ও পুরুলিয়াকে নির্বৃক্ষ শ্মশানে পরিণত হতে দেখেছি। একই অবস্থা রাজ্যে রাজ্যে। এমনটা হল বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরেই। আর শেষ কথাটি বলব "বিরসা' নাম প্রসঙ্গে। আমি লিখেছিলাম "বীরসা"। সঠিক বানান হবে "বিরসা"। বৃহস্পতিবার যে-ছেলে জন্মায় তাকেই বিরসা নাম দেওয়া হয়। জন্মবারের সঙ্গে মিলিয়ে জাতক-জাতিকার নাম দেওয়া খুব প্রচলিত আদিবাসী এবং অন-আদিবাসী সমাজে। আমাদের সমাজেও তা একদা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এ পর্যন্তই আমার প্রস্তাবনা। সর্বশেষে স্বীকারোক্তি, প্রধান সম্পাদক লিখতে বললেন বলেই "অরণ্যের অধিকার" বইটি এতকাল বাদে প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়ে ফেললাম। এত বছরে গোটা বইটা আরেকবার পড়িনি।

কে. এস. সিং-এর "ডাস্ট স্টর্ম অ্যান্ড হ্যাংগিং মিস্ট" বইটি পড়েই আমি "অরণ্যের অধিকার" লিখতে প্রাণিত হই। কে. এস. সিং-এর বই তখন পড়ছি, একই সঙ্গে খুঁজছি আর পড়ছি সাঁওতাল পরগনা, রাঁচি, পালামৌ, ডিস্‌ট্রিক্ট গেজেটিয়ার। তখন থেকেই গেজেটিয়ার পড়ার একটা রুটিন অভ্যাস হয়ে যায়। "রুটিন"-বা বলি কেন। কথার মধ্যে কথা থাকে। কেন গেজেটিয়ার? তা লেখার পিছনে খুব শৃঙ্খলা থাকত। ইংরেজদের গেজেটিয়ারে তথ্য থাকত প্রচুর। সেসব তথ্য যথেষ্ট খেটেখুটে জোগাড় করা। কত অজানা তথ্য আবিষ্কার করে পুলকিত হতাম। বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে পড়েছিলাম, এগেট /Agate এক বহুমূল্য পাথরের স্তর। Agate খুব সহিষ্ণু, তাকে ভাঙা কঠিন। রং সবুজ। এই Agate দিয়ে কম দামি গহনা, মূর্তি তৈরি হয়। একদা নিউমার্কেটে জেড্ পাথরের সদৃশ Agate পাথরের নেকলেস্, মালা, মূর্তি এসব বিক্রি হত। যা হোক, পড়লাম, বাঁকুড়ার মাটির নীচে অনেক Agate ছিল। রেললাইন পাতার সময়ে চাং চাং Agate বিছিয়ে তার উপর লাইন পাতা হয়। বাঁকুড়া যাবার সময়ে শুধু মনে হত, এত গরিব এই জেলা! Agate খনি কাজে লাগালে জেলাটি ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ হত একদিনের যুক্তবঙ্গের। এছাড়া সাঁওতাল পরগনা, রাঁচি, সিংভুম, পালামৌ, এসব জেলা গেজেটিয়ার খুবই তথ্যসমৃদ্ধ ছিল। ১৭৮৫, ১৮৫৫-৫৬, ১৮৬৪ এসব বছরের সাঁওতাল বিদ্রোহ; ১৮৫৫-৫৬-র খেরোয়ার বিদ্রোহ; ১৮৩১ সালের কোল বিদ্রোহ, এসব বিদ্রোহ বিষয়ে গেজেটিয়ারগুলিই আমার মতো দুরাকাঙ্ক্ষী মানুষদের অসংখ্য তথ্য জানাত। তখনকার গেজেটিয়ারে কত-না কথা জানা যেত। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতাল মেয়েরাও বেশ কয়েকজন শাড়িটা ধুতির মতো মালকোঁচা মেরে পরে যোগ দিয়েছিলেন। এ লেখাটি পড়লেই ধীরেন বাস্কে বলবে, দিদি! আমাকে তো বলেননি? যাক গে, গেজেটিয়ারের কথা বলতে বসে ধান ভানতে শিবের গীতই গাইলাম হয়তো।—ছিল, জমির প্রশ্নই মূল ছিল। তার সঙ্গে ছিল অরণ্যের বিষয়ে আদিবাসীদের তীব্র অধিকারবোধ। "অরণ্যের অধিকার" শব্দটি আজ খুব বেশি দ্যোতক হয়ে উঠেছে সারা বিশ্বেই। আমার উপন্যাসের নামটি আজ গোটা বিশ্বেই খুব তাৎপর্যময়। সমস্ত বিশ্বজুড়েই আমরা, মানুষরা, সর্বনাশা লোভের তাড়নায় আফ্রিকা ও এশিয়ায় বনভূমি নিঃশেষ করেছি। সুনামি তো সামান্য কথা। সমুদ্রের জল তেল দূষণেই বিষাক্ত। পৃথিবীতে বসবাসের অধিকার উদ্ভিদ জগতের, জীব জগতের, মানুষের, সবার ছিল। সর্বত্র সব কিছু ধ্বংস করেছি আমরা। আজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দরকার মানুষই ভাবছে। ভাঙন শুরু হবার অনেক আগেই ধ্বংস তো সর্বত্র। হিমালয়ের তুষার প্রাচীরের বরফ কবে থেকে গলছে। হিমালয়ের পাদদেশে তরাইয়ের যে বিশাল অরণ্যবলয় ছিল, তাও ধ্বংস হয়ে গেছে। কলকাতার দিকে তাকালে বুঝি জল নেই, গাছ নেই, পাখি নেই। একেবারে শ্মশান। উঠেছে শুধু হাইরাইজ। সবুজের জন্য আমার তীব্র উদ্বেগ ছিল।

পালামৌ, সিংভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দেখেছি কি নির্মমতায় গাছ কাটা চলেছে। "ডাস্ট অন দি রোড" বইয়ে আমার যেসব ইংরেজি লেখার সংকলন আছে, তাতে দেখা যাবে স্বভাবঅরণ্য উৎপাদন করে চূড়ান্ত অবিবেচনায় ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি ও সদৃশ গাছ দিয়ে তথাকথিত সামাজিক বনসৃজন কার্যসূচি চালাবার ফলে কীভাবে আমরা প্রকৃতির উপর অত্যাচার করেছি। গণেশ দেভীর "নোমাড কল্‌ড থিফ" বইয়ে এক প্রবন্ধের প্রথম অংশে দেখছি "একদা অরণ্য তার বার্তা পাঠাত জনপদে। অর্থাৎ, মহারাষ্ট্রের ওই অরণ্য অঞ্চলে বিশ্বাস ছিল অরণ্যচণ্ডিকা দেবী হচ্ছেন 'বাঘজাই'। তাঁর দূত হিসেবে আসত তাঁরই সেবক বাসুদেব। একটি পুরুষ মাথায় ময়ূরপুচ্ছ বেঁধে অরণ্যের বার্তা আনত জনপদে। গণেশ লিখেছেন, "সেভাবেই অরণ্য চলে আসত জনপদে" ঃ "দি ফরেস্ট দাস ভিজিট্‌স দ্য ভিলেজ"। এই বাসুদেব, অরণ্যদেবীর দূত এরা, সেদিনের জনজীবনে সে প্রাসঙ্গিক ছিল। অবশ্যই এই বাসুদেবরাও আদিবাসী। আদিবাসী ব্যতীত কেউ বোঝে না অরণ্য। আজ বাসুদেবদের দেখা যায় শহরে (মুম্বাই, সাতারা, পুনে), তারা দাঁড়িয়ে থাকে, ভিক্ষা করে। অবশ্যই "ভিক্ষা দাও" বলে না। কেউ দেবে, বিশ্বাসে অপেক্ষা করে। আদিবাসী জগৎ, প্রাচীন বৃক্ষের মতো। ঘাতকের কুঠারের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। নীরবে অপেক্ষা করাই তার কাজ। এটুকু লিখলাম, অরণ্য বিষয়ে আমার অনেক চিন্তা বিরসার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম যেন হয়ে গিয়েছিল, "অরণ্যের অধিকার' সেই উদ্বেগ থেকেই লেখা।

অবশ্যই জমি-ভূমিতে আদিবাসীদের অধিকার আদৌ বিনিশ্চিত করা যাবে কি না, সেই চিন্তায়, লেখালেখিতে, বাস্তবক্ষেত্রে লড়াইয়ে অনেক বছর কেটে গেছে। এই কাজ এখনও জারি আছে, তবে অকূল সমুদ্রে যেন দিগন্তে তটরেখা দেখা যাচ্ছে। আজও দেখি, সাধ্যমতো লড়াই করে যাচ্ছি, দেখা যাক।

যা বাস্তব, তা হল, আমার (বহুজনের মতো) যে উদ্বেগ ছিল, তা আজ বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। আমি এবং সমচিন্তক মানুযরা বহু কোটি মানুষের সঙ্গে আছি। গাছ, মাটি, জল, বাঁচাবার প্রয়োজনীয়তা আজ পৃথিবীর মানুষ বোঝে। এটুকুই। বিরসার প্রাণদান বৃথা হয়নি।

৩

আদিবাসী বিদ্রোহ নিয়ে আরও লিখেছি। বাবা তিলকা মাঝির বিদ্রোহ, সিদো-কানহুর বিদ্রোহ, আরও অনেক অভ্যুত্থান নিয়ে লিখেছি। "অরণ্যের অধিকার" লিখবার সময়ে বইয়ের নামটি কিছু পাঠকের ভালো লেগেছিল। এই আন্দোলনের কোনো অভিঘাত যে হয়নি, তা সঠিক নয়। "ভাযাবন্ধন" যাঁরা পড়ছেন, তাঁরা সরকারি "অরণ্য-নীতি" বিষয়ে কতটা আগ্রহী তা জানি না। তবে ২০০৩-২০০৫—৩ বছরের "ভাযাবন্ধন" পড়ছি আর

দেখছি, এখনকার পাঠকদের মধ্যে বহুমুখী আগ্রহ খুবই লক্ষণীয়। আসলে আমি, বা আমার বয়সী লেখকরা আজকের লেখকদের বা পাঠকদের তেমন চিনি না। নিঃসংশয়ে এটা আমাদের ব্যর্থতা। এটা মেনে নিয়েই লিখতে চেষ্টা করছি।

"অরণ্যের অধিকার" যখন লিখি, তখন "আদিবাসী" শব্দটি সমগ্রতা নিয়ে আমার ওপর সেই প্রচণ্ড অভিঘাত হানেনি, যে জন্য আমার নাম "আদিবাসী" শব্দটির সঙ্গে এতই জড়িয়ে গেছে আজ। আদিবাসীরাও আমাকে তাদের আপনজন মনে করে, এটাও ঘটনা।

আসলে সেই সময় থেকে আদিবাসী সম্পর্কে আমার অবাধ্য জিজ্ঞাসার শুরু। ১৯৬৩-৭৫, বছরে একবার তো পালামৌ যেতাম। অরণ্য দেখতাম,—অরণ্যজীবী মানুষদের দেখতাম। লাগাতার অরণ্যনিধন তখন শুরু হয়ে গেছে। "জঙ্গল চলে যাচ্ছে, আমরাও আর থাকব না", এ কথা ওদের কাছেই শুনেছি। ১৯৮০-র দশক থেকে পালামৌ কেন্দ্র করেই ঋণবন্ধ দাসমজুর বা বন্ধুয়ামজদুর বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে যাই। তার আগেই দেখেছি একদা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের "পালামৌ" যদি-বা বেঁচে ছিল, ভারতে স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্বে অবাধ অরণ্যনিধন এক নতুন মাত্রা পেয়ে গেল। জিম করবেটের "মাই ইন্ডিয়া" বইয়ে পড়েছিলাম রেল চালনার প্রথম পর্বে কয়লাখনি তখনও অনাবিষ্কৃত ছিল। তাই ভাবারের জঙ্গল কেটে কাঠকয়লার আগুনে রেলের ইঞ্জিন চালানো হত। রেলের ইঞ্জিন চালাবার জন্য ব্যাপক অরণ্য উচ্ছেদের আদিপর্ব ব্রিটিশের হাতেই সূচিত হয়। মহারাষ্ট্রের অমরাবতী অঞ্চলে বিশাল সেগুন অরণ্য ছিল, সেখানে বাস করত "কোরকু" আদিবাসীরা। নাসিক থেকে হাওড়া অবধি রেলপথ পাতার জন্য সেগুনগাছ কেটে রেলপথ নির্মিত হয়। এই কাহিনী জানার পর এই পটভূমিতেই আমার "মাহ্‌দু" নামে গল্পটি লিখি। 'কোরকু' আদিবাসীদের অমরাবতীতে দেখেছিলাম। আবার তাদের নাম খবরে উঠে এল বছর দুই আগে। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে একটি কোরকু বসতি ছিল। বনবিভাগের কর্মীরাই তাদের উচ্ছেদ করে সব ধ্বংস করে দেয়। ১৯৮০-র দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়াতে ব্যাপক অরণ্যনিধন, ট্রাকে বোঝাই করা এবং বাইরে চালান করা দেখেছি। যতদূর জানি, বনবিভাগ এবং দলীয় মানুষজন তা জানত। আমরা বিরসার কাছে জেনেছি অরণ্য ধাত্রী, পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী। —আমি চাষীবাসী মুণ্ডাদের দেখেছি (এই রাজ্যে ও অন্যত্র তারা অনেককালই কৃষিজীবী)। সেই সঙ্গে অরণ্যই যাদের কাছে সব, তাদের পেয়েছি আমাদের লোধা ও শবর, আজকের ঝাড়খণ্ডে নাগেশিয়াদের মধ্যে।

বিরসা এবং তার সময়ের সন্ধানে আমাকে অনেক পুঁথিপত্র স্বভাবতই ঘাঁটতে হয়েছে। একটু গভীরে ডুব দিলে দেখা যায়, আদিবাসীদের (সকল আদিবাসী গোষ্ঠীরাই) জনম কথা বা সৃষ্টির ইতিহাস মূলে একই। আমরা পড়েছি "প্রলয় পয়োধি জলে",—।

অর্থাৎ একদা ছিল অনন্ত বা অন্তহীন মহাসাগর। কচ্ছপ ভেসে উঠলে পরে কেঁচোর মুখ থেকে মাটি নিয়ে আদি সৃষ্টিকর্তা কচ্ছপের পিঠে মাটি দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তিব্বতে এভারেস্টের নাম বোধকরি চোমোলাংমা (স্মৃতি থেকে লিখছি)। পড়েছিলাম চোমোলাংমা সেই শিখর, যেখানে মজ্জমান জাহাজকে বেঁধে রাখা হয়। সে জাহাজে মানুষ, পশু, পাখি সবই ছিল। অর্থাৎ প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির ব্যবস্থাও ছিল। ওই সব মানুষ ও আদি প্রাণীদের থেকেই পৃথিবীর আদিবাসীদের সৃষ্টি। আবার ১৯৯০ সালে আমেরিকায় দেখলাম আদিম ইণ্ডিয়ানদের 'টার্ট্‌ল সেন্টার'। ওদের আদিম মানুষরাও বিশ্বাস করত, মহাপ্লাবনে পৃথিবী ডুবে গেলে এক কচ্ছপের বা "টার্ট্‌ল"-এর পিঠেই আজকের পৃথিবী রচিত হয়েছিল। কেউ কি আমরা এর আগে, ও-পরে এই ক্রম মেনে একদা এসেছি, না একটাই মানবসমাজ এ ভারতে—এ দুনিয়াতে একসঙ্গেই জন্মেছিলাম? ওই নেটিভ আমেরিকানদের "আর্থ ফেস্টিভ্যাল"-এ দেখেছিলাম ওদের বিশালকায় পুরুষরা একেবারে সাঁওতাল মুণ্ডা, শবরদের যৌথ নৃত্যের মতো পায়ের তালে তালে নাচে। আমি ওদের সঙ্গে নেচেছিলাম। বলি, এমন তালে পা ফেলতে শিখলে কোথায়? ওরা বলে, তুমি বা আমাদের মতো ছন্দে নাচছ কি করে? সে সময়ে ভেবেছিলাম, পৃথিবী একদা অখণ্ড ছিল, পরে তা টুকরো টুকরো হয়। ভূ-তত্ত্ব এ কথা বলেছে। যৌথ নৃত্যের এই পদক্ষেপ কি সুদূর অতীতের? যাক্ গে, এ বয়সে মন, যাকে বলে, খুশই অসার চিন্তায় নেচে ওঠে।

সেসব কথা থাক। "আদিবাসী" সমাজের উপর প্রচণ্ড মূলস্রোতীয় অত্যাচারের কারণেই বিরসার বিদ্রোহ। অবশ্য আমি এবং আমার মতো মানুষ যাঁরা বিশ্বাস করেন, ওঁরাই মূলস্রোত, ভারতে আগে থেকেই ছিল, আমরা পরে এসেছি, আমরা একসঙ্গেই আছি। যেসব কারণে বিরসার বিদ্রোহ হয়, মোটামুটি সেসব কারণেই ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ সালের কোল বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সালের খেরোয়ার বিদ্রোহ, এগুলি ঘটে। বহিরাগত সমাজকে (যে সমাজে প্রধানত হিন্দুরা ছিল, মুসলিম সমাজ কিছু থেকে থাকবে) এনেছিল ব্রিটিশ। অথবা ব্রিটিশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কারণেই জমিদার-জোতদার-মহাজন-নায়েব-গোমস্তা-পুলিশ-থানা-আদালত ইত্যাদি আদিবাসী জনজীবনে ঢুকে পড়ে। ছিল ছিনে জোঁকের মতো লেবার-ঠিকেদার। বেগার প্রথা—বন্ধুয়া মজদুরি এসব পাপও ঢোকে। শেষোক্ত দুটি প্রথা আজও কিন্তু ভারতে আছে। এর আগে থেকেই লেবার-ঠিকাদার আদিবাসী মানুষদের নিয়ে যাচ্ছিল চা-বাগানে। (পরে কয়লা খাদানে)। আজ আসমুদ্র হিমাচল "মেরা ভারত মহান" ভারতবর্ষে ঠিকাদারের হয়ে ভিন রাজ্যে খাটতে যাওয়া থেকে আদিবাসী সমাজের মুক্তি নেই। এখন পশ্চিমবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম ধাত্রীভূমি সুন্দরবন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার কৃষক পরিবার অন্ধ্রে মজুর খাটতে যাচ্ছে। যদি বিরসার সময়ের কথা ভাবি, তখন আড়কাঠির প্রলোভনে লেবার খাটতে আসামের চা-বাগানে চলে যাওয়ার

বেদনা নিয়ে অনেক লোকগীতির কথা মনে হয় বইকি।

এ সকল শোষণই ছিল। 'খুটকাট্টি' সাঁওতাল-মুণ্ডা-কোল-হো ইত্যাদির মধ্যে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থা বহিরাঘাতে ভেঙে পড়েছিল। খুটকাট্টি ব্যবস্থায় কোনো গ্রামে যখন লোকসংখ্যা বেড়ে যেত, চাষের জমিতে টান পড়ত, জলাশয়, বনভূমি সব কিছুই বিপন্ন হয়ে পড়ত, তখন গ্রাম্যসমাজের প্রধানমানুষ একটি জায়গা চিহ্নিত করতেন একটি গাছের গায়ে কোপ মেরে/অথবা কোনো গাছের গুঁড়ির ওপর থেকে কেটে দিয়ে। সীমানাও চিহ্নিত করে দিতেন। সেখানেই গড়ে উঠত নতুন গ্রাম। সেসব খুটকাট্টি গ্রামের জমিজমা নেবার জন্য কোনো জমিদার, নায়েব, কোর্টকাছারির দরকার হত না। মহাজন, বেনে, পুলিশ, এসব ব্যবস্থাও থাকত না। তখনও আদিবাসীরা স্বাধীনই থাকত। ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় এ সবই চলে যায়। আদিবাসী জীবনে ক্রিশ্চান মিশনারি, হিন্দু ধর্মীয় মানুষজন ঢুকে পড়ে। ধর্মান্তকরণ শুরু হয়ে যায়। বলা চলে, আদিবাসীরা ছিল অরণ্যের মতোই অসহায়। গাছ কেটে ফেললে গাছ কী করবে? আদিবাসীদের সব ধর্মাচরণই প্রকৃতির উপাসনা। প্রকৃতি যেমন, আদিবাসীও তেমনই অসহায়। গাছ কাটা হবে কি না, সেটা গাছ কথা বলে জানাতে পারে না। মানুষের শুভবুদ্ধির উপরেই প্রকৃতির যথার্থ ভারসাম্য রক্ষা পায়। সুখের বিষয়, আজ দুনিয়া জুড়ে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশে দেশে যে জনমত গড়ে উঠছে, তাতে মানুষকে এই শুভবুদ্ধি প্রয়োগ করেই প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করতে বলা হচ্ছে। এসব কথা ভাবতে বসলেই বিরসাকে আমার খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

"অরণ্যের অধিকার" পড়ার ব্যাপারটা সম্পর্কে লেখকের আরও কিছু নিবেদনের আছে। এ কথা বলেছি, বিরসার মধ্যে আমি পরিবেশ চেতনার ব্যাপারটি আনতে চেয়েছিলাম। ইতিহাসে উল্লিখিত তিলকা মাঝি, বা সিদো-কানহুকে নিয়েও উপন্যাস লিখেছিলাম। তিলকা বা সিদো-কানহুর উপন্যাস লিখি, "অরণ্যের অধিকার" লেখার পরে। "শালগিরার ডাকে" বা "সিদো-কানহুর ডাকে" উপন্যাসে "অরণ্যের অধিকার"-এর ব্যাপ্তি নেই। বই দুটি অনেক পরে বেরোয়। তিলকা মাঝি, বা সিদো-কানহুর বিদ্রোহের কারণ হিসেবে বিদেশী শাসকের শাসন-শোষণকেই তুলে ধরেছিলাম। যা হয়তো খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল ওই বইগুলির ক্ষেত্রে। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে বেশ কিছু গল্পও লিখেছি। জনগণের সচেতন বিদ্রোহেই বিশ্বাস ছিল, তাই আদিবাসী বিদ্রোহ যেমন, ১৮৫৭-৫৮ সালের প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান নিয়েও লিখেছি।

আবার বিরসা। "অরণ্যের অধিকার"-এ বিরসার অরণ্যপ্রাণতার কথা আছে। বিরসা অরণ্যবাসীর কান্না শুনতে পাচ্ছিল। এর পরেই সে 'ধরতি-আবা' হয়ে বেরিয়ে আসে, এখান থেকেই বিরসা সেদিনের বিদ্রোহের মশালটি হয়ে ওঠে। আমি পাঠকদের বলব, বিরসা একজন "মডার্ন ম্যান" বা আধুনিক মানুষ, তিলকা মাঝি সহ অন্যান্য আদিবাসী

বিদ্রোহের নেতাদের তুলনায়। যে অর্থে "কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু" উপন্যাসের নায়ক আধুনিক, এক Renaissance man, সেই অর্থেই। ওই বইয়ের নায়ক লিখতে চেয়েছিল, যেহেতু তার সময় ও সমাজের কাছে সে দুর্বোধ্য ছিল, সেহেতু হাতির পদপিষ্ট হয়েই তাকে মরতে হয়। সেদিনের যোড়শ শতক তাকে শাস্তি দেয়। তবুও, স্বীয় প্রতিবাদ দ্বারা প্রমাণিত হয় সেই ছিল সেদিনের মডার্ন ম্যান। সময়ের ধমনীর ধক্‌ধক্ সে শুনতে পেয়েছিল। যোড়শ শতকে চৈতন্য, কবীর, নানক প্রমুখের নেতৃত্বে দেবতাকে মন্দিরের বাইরে এনে সর্বসাধারণের হৃদয়ে স্থাপন করার যে কাজটি সূচিত হয়, আমার কাছে সেটাই আমার দেশের প্রেক্ষিত নবজাগরণ। সেই অর্থে কবি বন্দ্যঘটী অবশ্যই নতুন যুগের মানুষ ছিলেন।

বিরসা, অন্যান্য আদিবাসী বিদ্রোহের ক্রম অনুযায়ী আধুনিক মানুষ। সে মিশন স্কুলে কিছুটা পড়েছিল। সর্দার আন্দোলন বিরসার সময়ের অব্যবহিত আগেই ঘটে যায়। তার আগে যে বিরসা তার বাপের সঙ্গে গিয়ে মিশনে নাম লেখায় সে সর্দার আন্দোলনের বিক্ষোভের আঁচ টের পেয়েছিল। মিশনে সে বাইরের মানুষজনের কিছুটা সংস্পর্শে আসে। বিরসার নাম ঘিরে যেসব কাহিনী খুব ছড়িয়ে গেছে, তা থেকে আমার ও গণেশ দেভীর সেই আদ্যিকালের বিশ্বাসটিতে ফিরে আসা যায়। তা হল, oral tradition- এর মার নেই। বিরসা legend হয়ে ওঠে, কেননা জীবিতকালেই সে oral tradition- এ জায়গা পেয়ে গিয়েছিল। আজকের তথ্য + তথ্যপ্রযুক্তি রোগজর্জর বিশ্বেও oral tradition দ্বারা জনচেতনাকে আক্রমণ ও সংক্রমণ করা দরকার। এটা গণপ্রতিরোধের একটি পরীক্ষিত সফল আয়ুধ।

বিরসা তার জীবিতকালেই oral tradition-এ জায়গা পেয়ে যায়। কেননা সে ছিল তার সময়ের ও সমাজের চেয়ে চিন্তায় ও প্রতিবাদে অগ্রসর। সে খ্রিশ্চান হয়েছিল, মিশনারিদের বিশ্বাস করতে চেয়েছিল। কিন্তু মুণ্ডাদের "সর্দার আন্দোলন" থেকে মিশনারিরা যখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিরসা বুঝেছিল যে সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়াই, তারা শাসক, মিশনারিরাও শাসকদের জাতভাই। "সাহেব সাহেব এক টোপি হ্যায়" বলে সে চলে আসে। হিন্দু সর্দার, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব এদেরকে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু এরাও মুণ্ডাদের (তথা আদিবাসীদের) ধর্মান্তকরণে বিশ্বাসী ছিল। আদিবাসী-বিদ্রোহগুলির পিছনে মিশনারি ও হিন্দুদের একটা বিশ্বাসই কাজ করে, ওরা কালো। পাথর-গাছ-মাটি উপাসক, অসভ্য। বিরসা সেটা ধরেছিল। সে ধরতি আবা হিসেবে প্রচারিত হয়। ধরতি-আবা concept টি মুণ্ডারা তড়িৎগতিতে মেনে নেয়। এই concept মানা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। হাজার হলেও বিরসার পূর্বপুরুষদের নামানুসারেই, ইতি-শ্রুতি, ছোটনাগপুর নামটি হয়। এভাবে সেই সময়টিতে, যখন জমি-ভূমি থেকে মুণ্ডাদের উন্মূলিত করতে ব্রিটিশ সরকার তাদের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, বিলিতি ও ভারতীয়

শাসক, বাংলা-বিহার-এর জমি ও মুনাফালোভী জমিদার-জোতদার-মহাজন-ঠিকাদার বাহিনী, পুলিশ-উকিল কোর্টকাছারি নিয়ে বেজায় সচেষ্ট, ছোটনাগপুর মালভূমি (অরণ্য খনিজ সম্পদ---পরিশ্রমী মজুর ও কুলিতে সমৃদ্ধ অঞ্চলে আদিবাসীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম দেখে আতঙ্কিত) এই সময়ের নাড়ি বিরসা ধরতে পেরেছিল। এসব কারণেই সে ধরতি-আবা। আমার মতে ও বিশ্বাসে সে modern man।

বিরসা modern man। এজন্যই তার অভ্যুত্থান দমন করতে ইংরেজ সরকার এত আগ্রহী হয়। সে modern man. তার অরণ্যচেতনা দিয়ে আমি সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছি। অরণ্য যে এক লুণ্ঠিতব্য সম্পদ, তা ইংরেজ এবং তাদের প্রবাদপুষ্ট ভারতীয়রা ভালোই বুঝেছিল, আজও শাসকরা বোঝে। সসাগরা ভারতভূমি ১৯৪৭—আজ শুধু ব্যবসায়ী নয়, ঠিকেদার-প্রোমোটার-ডেভেলপারদের হস্তগত। আজ বহুকাল অরণ্য-ভারত-এর গাছগাছড়া-ওষধি-ফল-মূল পণ্য হয়ে বিদেশে যায় (অথবা স্বদেশে। নামে ভারতীয় হলেও এরা দেশের মাটি থেকে উন্মূলিত চিন্তায় ও কাজে)। আমি আজ, একুশ শতকে পৌঁছে বিশ্বাস করছি, "অরণ্যের অধিকার" নামকরণ একেবারে আজকের প্রেক্ষিতেই প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে।

বিরসা ও তার সহযোদ্ধাদের বিচার যেভাবে হয়, তা আমাদের সমসময়কেই মনে করাবে। আমাদের সময়ে দেখছি, মানুষকে রাস্তা, জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, অন্ন সবেতে বঞ্চিত রেখে প্রতিবাদী কণ্ঠকে "সন্ত্রাসবাদী" আখ্যা দেওয়া লাগাতার চলছে। সত্যকে বিকৃত করে অপব্যাখ্যা দেওয়া এখন আচরিত রীতি। বিরসার বিচারকালে শাসক-সরকারের অফিসাররা ভূরি ভূরি মিথ্যাচারণ করে। এমনটা আজও চলছে সর্বত্র। আমরা এই অতীব প্রগত স্বরাজেও, কৃষক আন্দোলনের জমি-ভূমি থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করছি, সেখানে যারাই এসে দখল নিচ্ছে, তারা চিন্তা ও কর্মে কর্পোরেট। বস্তুত আমার স্মৃতিতে এমন দুঃসময় আগে দেখিনি।

প্রতিবাদ করা আজ অপরাধ।

বিরসা, তার জ্ঞান-বুদ্ধি-চেতনা ও বিবেকমতো মানুষকে প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছিল। আর বিশ্বমানবকে অরণ্য-জল-পরিবেশ রক্ষায় সেনানী হতে বলেছিল।

অরণ্যরক্ষার কাজ মানুষের জনজীবনেই লোকসংস্কৃতিতে নিয়ত নন্দিত হতে দেখে এসেছি মণিপুরে। মণিপুরের মানুষ "অরণ্যের অধিকার" নামটি ভালোবাসে।

এভাবেই বিরসা থেকে যাচ্ছে।

(ভাষাবন্ধন ঃ অক্টোবর ২০০৬)

৯ই জুন ১৯০০। রাঁচি জেল।

সকাল আটটার সময়ে বিরসা রক্তবমি করে অজ্ঞান হয়ে যায়। বিরসা মুণ্ডা, সুগানা মুণ্ডার ছেলে, বয়স পঁচিশ, বিচারাধীন বন্দী। তেসরা ফেব্রুআরি বিরসা ধরা পড়েছিল কিন্তু মে মাসের শেষ সপ্তাহ অবধি বিরসা আর অন্য মুণ্ডাদের বিরুদ্ধে কেস তৈরি করা যায়নি। তবে মুণ্ডাদের হয়ে লড়েছিলেন ব্যারিস্টার জেকব, তিনি এখনও লড়ছেন, বিরসা জানত জেকব ওদের হয়ে লড়বেন। বিরসা জানত জেকবকে ওর জন্যে লড়তে হবে না। ক্রিমিনাল পুলিশ কোডের বহু ধারায় বিরসাকে বাঁধা হয়েছিল, কিন্তু বিরসা জানত ওর দণ্ড হবে না।

অজ্ঞান বিরসা, অজ্ঞান, কিন্তু সব জানতে পারছে ও, সব দেখতে পাচ্ছে ছবির 'পর ছবি। মুণ্ডার জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে। ঘাটো একমাত্র খাদ্য যা মুণ্ডারা খেতে পায়, তাই ভাত একটা স্বপ্ন। কোনো না কোনো ভাবে ভাত বিরসার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বেশির ভাগ সময়েই বিরসার যে-উদ্ধত ঘোষণা, "মুণ্ডা শুধা ঘাটো খাবে কেন? কেন সে দিকুদের মতো ভাত-খাবে না?" আর তেসরা ফেব্রুআরি বিরসা ধরা পড়েছিল ওরা ভাত রাঁধছিল বলে। বিরসা ঘুমোচ্ছিল, মেয়েটা ভাত রাঁধছিল, নীল আকাশে ধোঁয়া উঠছিল, বিরসা ঘুমোচ্ছিল, সেই লোকগুলো ধোঁয়া দেখতে পায়।

তারপর বন্দগাঁও, তারপর খুনটি, তারপর রাঁচি। হাতে হাতকড়া ছিল বিরসার, দুদিকে দুজন পুলিশ। বিরসার মাথায় পাগড়ি ছিল, পরনে ধুতি। গায়ে কিছু ছিল না তাই বাতাস আর রোদ একই সঙ্গে বিঁধছিল চামড়া। পথের দুপাশে লোক ছিল। ওরা সবাই মুণ্ডা। ওরা সবাই কাঁদছিল। মেয়েরা বুক চাপড়াচ্ছিল, আকাশ পানে হাত তুলছিল। পুরুষরা বলছিল, "যারা তোমাকে ধরা করাল তারা মাঘ মাস ফুরাতে দেখবে না। তারা যদি জাল পেতে থাকে, সে জালে ধরা বরা আর খরা তারা ঘরে নিবে না।"

কিন্তু বিরসা তাদের ওপর রাগ করেনি। ধরিয়ে দিয়েছে, ধরিয়ে দেবে না কেন? ডেপুটি কমিশনার তাদের গুনে গুনে পাঁচশো টাকা দেয়নি? পাঁচশো টাকা অনেক টাকা। কোনো মুণ্ডার পাঁচশো টাকা থাকে না। মুণ্ডা যদি রাতে শুয়েও স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নে সে বড় জোর মহারানীর ছাপ মারা দশটা টাকা দেখতে পারে। ওদের পাঁচশো টাকা গেল, বিরসাকে ধরাবে না কেন?

আসলে বিরসার নিজের ওপরে রাগ হচ্ছিল। ঘুম এল কেন? না ঘুমালে ত ও জেগে থাকত। আগুন জ্বেলে ভাত রাঁধতে দিত না। তাহলে আগুন জ্বলত না, আকাশে ধোঁয়া উঠত না, কেউ দেখতে পেত না। পথ চলতে চলতে বিরসার মনে হচ্ছিল, এখন অচৈতন্য বিরসার মনে হল, সে আগুন ওরা নিভিয়ে দিয়েছিল ত? মুণ্ডাদের খেয়াল বড় কম। ধিকধিক আগুন থেকে জঙ্গল জ্বলে যায়, দাবানল লাগে, আর কয়েক বছর ধরে জঙ্গল বড় শুকনো, বড় খরা, তাই ত বিরসা উলগুলানে সব ভাল করে জ্বালাতে চেয়েছিল। উলগুলানের আগুনে জঙ্গল জ্বলে না, মানুষদের হৃদয় আর রক্ত জ্বলে। সে আগুনে জঙ্গল জ্বলে না। জঙ্গলে নতুন করে মুণ্ডা মায়ের মতো, বিরসার মায়ের মতো, জঙ্গলের সন্তানদের কোলে নিয়ে বসে।

তাই ত বিরসা অরণ্যের অধিকার চেয়েছিল।

অরণ্যকে ছিনিয়ে নেবে দিকুদের দখল থেকে। অরণ্য মুণ্ডাদের মা, আর দিকুরা মুণ্ডাদের জননীকে অপবিত্র করে রেখেছে। উলগুলানের আগুন জ্বেলে বিরসা জননীকে শুদ্ধ করতে চেয়েছিল। তারপর মুণ্ডা আর হো, কোল আর সাঁওতাল, ওরাওঁ, অরণ্যের অধিকার, ছোটনাগপুরের অরণ্যের অধিকার, পালামৌ, সিংভূম, চক্রধরপুর, সকল অরণ্যের অধিকার যাদের, তারা জননীর কোলে ফিরে যেত।

বিরসা বুঝতে পারল ও কোথাও চলে যাচ্ছে। কেননা ভীষণ রক্তবমি করেছে ও আজই সকালে। নিজের রক্তের রং দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বিরসা অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে। রক্তের রং এত লাল। সকলের রক্তের রংই লাল হয়, কথাটা ওর কাছে খুব দরকারী এবং জরুরী বলে মনে হল। যেন কথাটা কাউকে জানানো দরকার ছিল। কাকে জানানো দরকার ছিল? কে জানে না। অমূল্য জানে, বিরসা জানে, মুণ্ডারা জানে। সায়েবরা জানে না। জেকব জানে। কিন্তু জেল সুপার, ডেপুটি কমিশনার, এরা জানে না। পুলিশ সুপার জানে না। জানে না বলে ওরা সৈন্যবাহিনী আর বন্দুক আর কামান নিয়ে নেংটিপরা, তীর-বর্শা-বলোয়া-পাথরসম্বল মুণ্ডাদের মারতে এসেছিল। বিরসা যদি কথা বলতে পারত, বলে যেত, "সাহেবরা! রক্তের কোনো ভেদ নাই। মারলে তোমাদের যত লাগে, মুণ্ডাদের তত লাগে। মুণ্ডাদের জীবনগুলো তোমরা জবরদখল করেছ। সে দখল ছাড়তে তোমাদের যত লাগে, জঙ্গল আবাদ করা জমি দিকুদের হাতে তুলে দিতে মুণ্ডাদের তত লাগে।"

কিন্তু কিছু বলতে পারবে না বিরসা। চোখ খুলতে পারছে না, ভেতরে কে যেন মহুয়া তেলের মশাল আর টেমি নিভিয়ে দিচ্ছে। কে যেন দোলাচ্ছে বিরসাকে। বলছে, ঘুমাও, ঘুমাও, ঘুমা রে।

সকাল আটটার সময় বিরসা রক্তবমি করে অজ্ঞান হয়ে যায়। তখনি রাঁচি জেলের ঘরে -ঘরে কান্না শোনা গিয়েছিল, কিন্তু রাঁচি জেলের সুপার সাহেব তাতে কান দেননি। বোঝাই যাচ্ছে বিরসা মারা যাবে। লেফটেনান্ট গভর্নরকে কী খবর দেবেন ভাবছিলেন তিনি। ঘন-ঘন ঘড়ি দেখলেন। আশ্চর্য সমর্থ লোকটার শরীর। মে মাসের ত্রিশ তারিখ থেকে ভুগছে তো ভুগছেই। ফেব্রুআরি থেকে বিনাবিচারে আটক আছে একা একটা সেলে। ফেব্রুআরির আগে কতদিন পাহাড়ে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে থাকছিল। খাওয়া-দাওয়া কী জুটেছে তা ওই জানে। শরীর ভাঙছে না, মরছে না। এখন ওর মরা দরকার। নইলে প্রমাণ হয়ে যাবে বিরসা সত্যিই ভগবান। ভগবান না হলে এতদিনে ও মরেই যেত।

বিরসা মারা গেল সকাল ন-টায়। জেল সুপার অ্যান্‌ডারসন ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন, মাঝে-মাঝে নাড়ি দেখছিলেন। ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ নাড়ি। বিরসার চোখ বন্ধ। কপাল একটু কুঁচকে আছে। আন্‌ডারসন কৌতূহলে নিচু হলেন।

এখন নিচু হওয়া যায়। যে সাদা হাত, সাদা চামড়াকে ও ঘৃণা করত, সেই হাতে ছোঁয়া যায় ওর চটচটে কপাল, গাল। ওর মুখ ছুঁতে আশ্চর্য অনুভূতি হল অ্যান্‌ডারসনের।

এই নাকি বিরসা, যার জন্য দুটো জেলার পুলিশ আর সৈন্য ছুটে এসেছিল? সুকুমার, সুন্দর চেহারা। কে বলবে মুণ্ডাদের ছেলে? এখন ওর মুখে মৃত্যুর ছায়া। ওর নাড়ি ধরলেন অ্যান্ডারসন। ন-টা নাগাদ নাড়ি ক্ষীণ হতে হতে থেমে গেল। সহসা শরীর এলিয়ে পড়ল। কপালের রেখা মিলিয়ে গেল। চেহারা প্রশান্ত স্থির। মৃত্যু ছাড়া আর কেউ এমন প্রশান্তি এনে দিতে পারত না বিরসা মুণ্ডার শরীরে।

ন-টায় মারা গেল ও। তখন ওর হাত-পা থেকে শেকল খুলে নেওয়া হল। জীবিত অবস্থায়, এই নিঃসঙ্গ সেলে যখন ও অজানা অচিকিৎস্য অসুখে ভুগছিল, তখন শেকল খুলে নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিশ্বাস করা যায়নি ওকে। সাঁওতালদের 'হুল' নয়, সর্দারদের 'মূলকি লড়াই' নয়, বিরসা ডাক দিয়েছিল 'উলগুলান'-এর এক মহা বিদ্রোহের।

মরে গেল বিরসা। তখন ওর শরীর থেকে শেকল খোলা হল, মুখ থেকে রক্ত মোছা হল। বাইরে আনা হল। একে একে ওদেরও বাইরে আনা হল, মুণ্ডা বন্দীদের। ভরমি, গয়া, সুখরাম, ডোন্‌কা, রামাই, গোপী, চারশো ষাট-সত্তর জন বন্দীর আসতে সময় লাগে, কোমর-হাত-পায়ের শেকল টেনে হাঁটতে সময় লাগে, তাছাড়া আকাশ এখনও জ্বলছে, জুন মাসের দুর্দান্ত গরমে শরীর, লোহার শেকলের ভারে অবনত কালো শরীর, শ্লথগতি।

তাই অনেক সময় লাগল ওদের আসতে, বিরসার শরীর বেড় দিয়ে হেঁটে চলে যেতে। অ্যান্ডারসনের ধৈর্য থাকছিল না। তিনিই জেল সুপার, আবার সরকারী ডাক্তারও বটেন। বিরসার শরীর কাটতে ছিঁড়তে হবে। তার আগে খসখসের পাখা-টানা ঘরে বসে ঠাণ্ডা হওয়া দরকার, ঠাণ্ডা বিআর খাওয়া আরও বেশি দরকার। রাঁচি জেলের দুরন্ত গরমে ওঁর কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু বড় অবাধ্য এই মুণ্ডারা। কিছুতেই চোখ তুলছে না। চোখ নিচু করে ওরা দেখে যাচ্ছে ওদের ভগবানকে, মৃত ঈশ্বরের শরীর ঘিরে শেকলবাঁধা কালো-নেংটি পরা বন্দীরা হেঁটে, বেড় দিয়ে চলে যাচ্ছে। চলে গেল, একজনও শনাক্ত করল না। বলল না, "হ্যাঁ, এই আমাদের বিরসা ভগবান।"

—'শনাক্ত করো! শনাক্ত করো!' অ্যান্ডারসন চেঁচিয়ে উঠলেন।

হ্যাঁ, একজন দাঁড়িয়ে গেছে। কপালে বেয়নেটের ঘা আছে—তাই বুঝলেন, এ ভরমি মুণ্ডা। নইলে এদের প্রত্যেকের মুখ, কালো কালো মুখ, অ্যান্ডারসনের চোখে একরকম মনে হয়। ভরমি দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে।

— 'কে? কাকে দেখছ?

ভরমি কথা বলল না. দাঁড়িয়ে একটু দুলতে লাগল। তারপর, যেন ওর ভেতর থেকে গান উঠে এল। দুর্বোধ্য, মুণ্ডারী ভাষার গান, কান্নার মতো সুর, মন্ত্রের মতো গভীর। ভরমি বলল,

"হে ওতে দিসুম সিরজাও
নি' আলিয়া আনাসি
আলম আনদুলিয়া
আমা' রেগে ভরোসা

বিশ্বাস মেনা!!"
(হে পৃথিবীর স্রষ্টা,
আমাদের প্রার্থনা ব্যর্থ ক'রনা
তোমাতে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস!!)

ব্যর্থ আক্রোশে অ্যান্‌ডারসন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হটাও, হটাও।' ওআর্ডার ভরমিকে ধাক্কা দিল। ওরা চলে গেল।

ন-ই জুন বিরসা মারা গেল ন-টায় কিন্তু বিকেল ৫-৩০ টার আগে সুপার ময়না করতে পারলেন না। ময়না করে লিখলেন, "পাকস্থলী জায়গায় জায়গায় কুঁচকে দলা পাকিয়ে গিয়েছে। ক্ষুদ্রান্ত্র সরু হয়ে গিয়েছে ক্ষয় হতে-হতে। বহু পরীক্ষাতেও পাকস্থলীতে বিষ পাওয়া যায়নি।"এই পর্যন্ত লিখে উঠলেন, হাতে অডিকোলন লাগালেন। হাত শুঁকলেন। সুগন্ধি সাবানে স্নান করেও গা থেকে বিরসার গন্ধ যাচ্ছে না! আশ্চর্য! ফর্মালিন ও স্পিরিটে মোছা শরীর থেকে মৃদু পচা গন্ধ বেরোচ্ছিল। শরীর পচ ধরতে শুরু করলে একেবারে গোড়ায় ও-রকম গন্ধই বেরোয় বটে।

লিখলেন সুপার, "রক্তামাশার পর কলেরার সংক্রমণের ফলে বৃহদন্ত্রের উপরিভাগ কুঁচকে জড়িয়ে যায়। পরিণামে হৃৎপিণ্ডের বাঁদিকে রক্তক্ষরণ হয় এবং ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে বিরসা প্রাণত্যাগ করে।" তারপর ভেবে দেখলেন, বিরসা কোনো সময়েই জেলের বাইরে একবিন্দু জলও খায়নি। কলেরার কথাটা লিখেছেন বলে মনের ভেতর খচ্‌ খচ্‌ করতে লাগল। অবশেষে লিখলেন, "কিভাবে বন্দী কলেরায় আক্রান্ত হয়, তা জানা যায়নি!" লিখতে-লিখতে মুখ তুললেন, "কে?"

—'আমি' ময়না ঘরের ডোম এসে দাঁড়াল।

—'কি হয়েছে?'

—'বাবু বলছিল.....'

—'কোন্ বাবু?'

—'ডিপুটি বাবু!'

—'কি বলছিল?'

—'ওর কি হবে?'

—'কার?'

—'ভগবানের।'

—'ভগবানের? তোমার ভগবান না কি ও? তুমি কি মুণ্ডা?

—'না।'

—'না, ভগবান বল না।'

—'না, হুজুর, বলব না।'

—'কি বলছিলে?'

—'ভগবানের কি হবে?'

—'চুপ কর।'

—'হ্যাঁ, হুজুর।'

—'ঠিক করে কথা বল।'

—'ভগবানের শরীরটা কী হবে?'

অ্যান্ডারসনের শরীর ও মন যেন পরাজয়ের গ্লানিতে অবসন্ন হয়ে পড়ল। যারা বন্দুক নিয়ে বিরসার সঙ্গে লড়েছিল, তাদের লড়াই শেষ হল। যারা বিরসাকে বেঁধে এনেছিল, তাদের লড়াই শেষ হল। বিরসা কেন তাঁর সঙ্গে লড়াই শেষ করছে না? কি করেছেন তিনি? ওকে সলিটারি সেলে রেখেছিলেন? ওর হাতে পায়ে কোমরে শেকল বেঁধে রেখেছিলেন? কি করেছিলেন? কি জন্যে এই লড়াই? কেন মুণ্ডারা বিরসাকে 'বিরসা' বলে শনাক্ত করল না? কেন তাঁর অধীনস্থ নগণ্য এই লাশঘরের ডোমটা বিরসাকে 'ভগবান' বলে চলেছে?

—'যাও, ডেপুটিবাবুকে পাঠিয়ে দাও।'

—'বাবু এসেছেন।'

—'ভেতরে আসতে বল।'

ডেপুটি সুপার অমূল্যবাবু ঢুকল। বয়স কম, দেখতে আরও কম দেখায়। ছেলেটির ব্যবহার কথাবার্তা সংযত, ভদ্র। সাহেবের সামনে ঠোঁট এঁটে থাকাই ওর অভ্যেস। তবু অ্যান্ডারসনের মনে হয় বিরসার বিদ্রোহের খবরগুলো কলকাতায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'দি বেঙ্গলী' ও 'দি হিন্দু পেট্রিঅট' কাগজে ওই পাঠায়। মনে হয় প্রমাণ কিছু পাননি। মনে হয়, ও মুণ্ডা বন্দীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। নইলে প্রত্যেকটি সেলে খাবার জলের ব্যবস্থা যাতে ঠিক ঠিক থাকে সেজন্যে ও এত তৎপর কেন? কেন বন্দীদের স্নান করার জন্যে ও দু-ঘটির জায়গায় দশ ঘটি জলের ব্যবস্থা করল? কেন কথায়-কথায় 'জেল কোড'-বুক হাতে করে এসে বলে, 'সার, এতে লেখা আছে ওদের ভরপেট খাবার মতো চাল দিতে হবে কিচেনে?'

মনে হয়, প্রমাণ কিছু পাননি। ডেপুটি সুপার, ক্রিশ্চান ছেলে। ভালো টাকা পায়। কিন্তু রাঁচি শহরে সবসময় পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরবে, সকলের সঙ্গে মিশবে, সমাজসেবা করতে যাবে।

—'কি, অমূল্যবাবু?'

ছেলেটা এমন বেয়াড়া! শুধু 'বাবু' বললে রেগে ওঠে। একদিন ওঁকে বলেছিল, বেশ মিষ্টি হেসেই বলেছিল, 'রেগে ওঠা ঠিক নয়, তা আমি জানি। তবে ওই যে শুনেছিলাম, 'বাবু' কথাটা 'বেবুন' শব্দ মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে, সেই থেকে 'বাবু' শুনলে যেন কিরকম...'

বেশি কিছু বলতে পারেন না অ্যান্ডারসন। কেননা যদি চলে যায়, যদি সত্যিই খবর পাচার করতে শুরু করে কলকাতার ওই অখাদ্য কাগজগুলোতে, তাহলে মুশকিল হবে। দেশি কাগজগুলোকে তত ভয় নেই, ভয় ব্যারিস্টার জেকবকে। লোকটা ইংরেজ, কিন্তু মুণ্ডাদের হয়ে বিনা পয়সায় লড়েন। এবারও লড়তে আসছেন ওদের কৌসুলী হয়ে। মুণ্ডারা তাঁরই অধীনে জেলহাজতে আছে। তাঁর বিরুদ্ধে যায়, এমন একটি খবর পেলেও

জেকব তাঁকে ছাড়বেন না।

অ্যান্‌ডারসন বললেন, 'কি অমূল্যবাবু?'

—'মৃতের সৎকার বিষয়ে নির্দেশ পাইনি।'

—'সো?'

—'কি করা হবে?'

—'কি করা হবে মানে?'

—'কিভাবে সৎকার হবে? ওদের নিয়ম সমাধি দেওয়া।'

—'জেল হাজতে বিনাবিচারে আটক কোনো বন্দি সহসা কলেরায় মারা গেলে যে-ভাবে সৎকার করা হয়, তেমনি করেই সৎকার হবে। নিশ্চয় রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা হবে না? এটা নিশ্চয় কোনো ' স্পেশাল' কেস নয়?'

পরাজয়, পরাজয়। অ্যান্‌ডারসন কি আসলে কেসটা 'স্পেশাল' মনে করেন? মনোভাব চাপা দিতে চান বলেই এত চেঁচাচ্ছেন? অমূল্যবাবুর মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

—'অলরাইট স্যার।'

—'আর কি বলবে?'

—'ওর ভাই কনু মুণ্ডা কি মুখাগ্নি করবে?'

—'ওহ, নো। কখনোই না। কয়েকজন বিরসাইত যদি সৎকার দেখে, তাহলে তখনি এসে গল্প ছড়াতে শুরু করবে। তারা বলবে ধুমধামে বিরসাকে পোড়ানো হয়েছে। তারপর নানা রকম অলৌকিক গল্প ফেঁদে বসবে। আমি, আমি বিরসার নামে কিংবদন্তী আর শুনতে পারছি না।'

অমূল্যবাবুর মুখ পাথর-পাথর। ভাবলেশহীন।

—'তোমারও সে-সব কথায় প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। তুমি শিক্ষিত, তুমি আমাদের ধর্মের লোক। দেখ, আমি আজ কয়েক বছর ধরে বিরসার নামে গল্প শুনতে শুনতে.. গল্প শুনতে শুনতে .... কিন্তু এবার, এর আগের বারও এই জেলেই ছিল। তুমিও দেখলে ও সাধারণ একটা মানুষ, একটা সাধারণ মুণ্ডা, কলেরায় মরে গেল তাতে ও কি...

—'আমরা কি সেলটা কার্বলিকে ধোব?'

—'কার্বলিক! কেন? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

—'কিন্তু স্যার, কলেরা তো ছোঁয়াছে।'

— 'কলেরা? কলেরা তুমি পাচ্ছ কোথায়।'

—'আপনিই বললেন বিরসা কলেরায় মারা গেছে।'

অ্যান্‌ডারসনের চোয়াল ওঠানামা করল কিছুক্ষণ। তারপর কাটা-কাটা কথায়, রুক্ষস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ আমি বলেছি বিরসা কলেরায় মারা গেছে। আমি বলেছি কোত্থেকে কলেরা নিয়ে এল তা বোঝা যায়নি। আমি বলছি কার্বলিকে সেল ধোওয়ার দরকার নেই। আমি বলছি ওর সৎকার জেলের মেথররা করবে। একজন বিরসাইত যেন

সৎকার না দেখে, নোট কর, একজন বিরসাইতও যেন সৎকার না দেখে। দেখলে ওরা ছড়াবে গল্প, আর জেকব বলবে হতভাগ্য মুণ্ডাদের সৎকার দেখতে বাধ্য করে জেলকর্তৃপক্ষ মৃতদেহের অবমাননা করছে। এখন সব পরিষ্কার হল?'

—'সময়?'

—'পকেট ঘড়ি নেই।'

—'আরও অন্ধকার হলে।'

—'আমি যাব কি?'

—'নো। এটা আমার অর্ডার।

—'রাইট স্যার!'

—'তুমি বড় বেশি জড়িয়ে পড় কাজে। তুমি ছুটি নিয়ে বাড়ি ঘুরে এস না? ট্রায়াল শুরু হবে কবে তার ঠিক কি?'

—'আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই স্যার। আমি অরফানেজের ছেলে। রাঁচির অরফানেজের।'

—'যাও, যাও এখন।'

—'ইয়েস স্যার।'

অমূল্যবাবু তেমনিই ভাবলেশহীন মুখে বেরিয়ে এল। জেলের একদিকে ওর বাসা। ও সোজা বাসায় এল। শিবন মেথর ওর ঘরের মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে। শিবনের দিকে না চেয়েই অমূল্যবাবু বলল, 'আরে রাতে দাহ হবে। কবর হবে না। মেথররা দাহ করবে। যেতে হলে এখন থেকেই জেলে গিয়ে থাকা ভালো।'

—'হ্যাঁ সাব।'

—'আমি সাহেব নই।'

—'হ্যাঁ বাবু।'.

শিবন বেরিয়ে গেল। অমূল্যবাবু একটি কাগজে লিখল, বিরসা মুণ্ডা প্রথম অসুস্থ হয় ২০-৫-১৯০০ তারিখে। ৩০-৫-১৯০০ তারিখে সিংভূমের একটি বিচারাধীন বন্দী রাঁচি জেলে কলেরায় মারা যায়। সে জেল থেকে কোর্টে যাবার পথে গার্ডের সহযোগিতায় বোনপোর দেওয়া প্রসাদ খেয়েছিল। বিরসার প্রসঙ্গে সরকারী বিবৃতি তৈরি হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছে জেল থেকে কোর্টে যাবার পথে বিরসাও বাইরের কিছু খেয়েছিল। কিন্তু গার্ড ও অন্য বন্দীদের কড়া জেরা করলেই জানা যাবে বিরসা একদিন মাত্র কপাল ও ঘাড় ধুয়ে ফেলতে জল চেয়েছিল, জল নিয়েছিল হাবিলদারের ঘটি থেকে। সে জল বিরসা হাতে নিতে-না-নিতেই কোমরের শেকল টেনে গার্ড বলে, "সময় হয়ে গেছে" অতএব সে-জল বিরসা ব্যবহারই করেনি।

আরেকটু ভেবে লিখল, ২০শে মে থেকেই বিরসা অসুস্থ বোধ করে। অসুস্থ অবস্থায় তার চিকিৎসা ও পথ্য সব কিছুরই তত্ত্বাবধান করেছিলেন জেলসুপার।

কাগজটি খামে ভরল অমূল্যবাবু। ওপরে ব্যারিস্টার জেকবের নাম ও ঠিকানা লিখল। গতবার যখন বিরসা প্রথমবার বন্দী হয় তখনি ওঁর সঙ্গে অমূল্যবাবুর কলকাতায়

আলাপ হয়। বিরসা যদি কিংবদন্তী হয়, জেকবও কম যান না। কতদিন ধরে যে উনি কোল, ওরাওঁ, মুণ্ডাদের হয়ে লড়ছেন সেটা একা উনিই বলতে পারেন।

—'কেন তুমি আমাকে সাহায্য করছ বাবু?'

সকলেই অমূল্যবাবুকে 'বাবু' বলতে পারে, সকলকেই ও অধিকার দিয়েছে, শুধু অ্যান্‌ডারসনের বেলা ওর যত কড়াকড়ি। জেকবের কথায় ও কোনো জবাব দেয়নি।

—'কেন সাহায্য করছ?'

—'আমার নাম বলবেন না।'

—'তুমি খুব দুঃসাহসের, নাকি গোঁয়ার্তুমির কাজ করছ?'

—'জানি না।'

—'পাগলামিও বলতে পার। এমনকি ডি. এস. হয়েছ, না পাকা হওনি?'

—'বোধ হয় আমরা সকলেই একটু-আধটু পাগল। ডি. এস.-এর কাজ করছি, পাকা হব।'

—'তুমি রাঁচির ছেলে, তাই না?'

—'হ্যাঁ।'

—'স্কুলে-কলেজে ঐখানেই পড়েছ?'

—অমূল্যবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেছে, 'চাইবাসায় জার্মান মিশনের স্কুলে আমি বিরসার সহপাঠী ছিলাম।'

—'ও। কিন্তু তাতেও কেন তুমি মুণ্ডাদের সাহায্য করছ, তা বোঝা গেল না।'

—'বোঝার কিছু নেই।'

অমূল্যবাবু এখন বাইরের অন্ধকারের দিকে চাইল। চৌদ্দ বছর, নাকি পনেরো বছরের কথা? বিরসা দাউদ বহুপথ হেঁটে হেঁটে ক্ষতবিক্ষত পায়ে চাইবাসার স্কুলে গিয়েছিল।

অমূল্যবাবু একটু হাসল। জেলে দেখা হতে বিরসা ওকে ইচ্ছে করে চেনেনি। সেবার নয়, এবারও নয়।

রাত আটটা নাগাদ কাঠের খাটুলিতে বিরসার ময়না-করা সেলাই-করা শরীরটা নিয়ে মেথরেরা বেরোল। আজ রাতে মুণ্ডা বন্দীরা রাতের খাবার খায়নি। সেলে সেলে গাদাগাদি অবস্থায়, দুরন্ত গরমে পচতে পচতে ওরা গান করছে। যে-গানের সুর কান্নার মতো, যে-গানের ভাষা দুর্বোধ্য—জঙ্গলের বুকে ঝড়ের ভাষার মতোই আদিম, যে-গান মন্ত্রের মতো গম্ভীর।

লাশঘরের সান্ত্রী, পুলিশ, গার্ড, শবদাহী মেথররা সকলে সে-গান শুনে এ-ওর দিকে তাকাল। অস্বস্তিতে গুমরে উঠল ওদের মন। আজকের রাতটার উত্তাপের মতোই গুমরে উঠল চাপা ভয়, ক্ষোভ, দুঃখ। কেন ভয়, কেন ক্ষোভ, কেন দুঃখ! কি হয়েছে? একটি বিচারাধীন বন্দী মারা গেছে। কিন্তু মুণ্ডা বন্দীদের বিনা বিচারে জন্তুর মতো আটক রাখা, সেই অবস্থায় তাদের মাঝে মাঝে মৃত্যু হওয়া. এ কি আগে হয়নি?

এ-রকম তো হয়েই থাকে। মাঝে-মাঝেই হয়। আজ না হয় গরমটা খুব বেশি। খরা

তো আজ দু-তিন বছর ধরে চলছেই। তার ওপর বিরসার 'উলগুলান'-এর আঁচেও তো সব শুকিয়ে উঠেছে। মন থেকে বিচার বিবেচনা সব জ্বলে গেছে 'উলগুলান'-এর তাপে। এমন খাক হয়ে জ্বলে গেছে যে কেমন করে মুণ্ডা বন্দীরা ছোট ছোট সেলে গায়ে গায়ে ঠেসে জন্তুর মতো দেওয়ালের আংটায় শেকলবাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে তা ভেবে কেউ কষ্ট পায়নি। কেউ ভাবেনি শরীরে বুলেটের ঘা, ক্ষতের পচন আর জ্বর নিয়ে সুনারা মুণ্ডা কেমন করে বিনা চিকিৎসায় মরেছে।

কিন্তু এখন। বিরসার শরীর তুলে নিতে, আগুনের মতো গরম বাতাস ছিঁড়ে ফেলে জেল থেকে বেরুতে সকলের যেন ভয় ভয় করল। শিবন মেথর বলে ফেলল, 'এ কিরকম হয়ে গেল হে? জাতের মানুষ, ধর্মের মানুষ কাঁধ দিবে, কবর দিবে, না কি হয়ে গেল?'

—'চুপ কর্ শিবন।'

—'তুমি বল কি সিপাহসাহেব, এ পাপ হল না?'

সিপাহী মুনেশ্বরপ্রসাদ বলল, 'পাপ হলে সাহেবের হবে, আমরা হুকুমের চাকর।'

—'বাপ আছে, মা আছে, বয়েসের ছেলে তুই। কি জন্যে মরতে গেল বল দেখি?'

—'বাবা ওর জংলা জাত, জঙ্গুলে বুদ্ধি। আমার দাদা আদালত হতে রায় পেয়ে জমি নিল। তো বলে, আমাদের উচ্ছেদ করলি কেন? বলে, তোরাও দিকু। আইন বোঝে না, আদালত বোঝে না, জজ কি বলে তা বোঝে না। শুধু বলে, কেন? জমি ছাড়ব কেন? জঙ্গল আমাদের নয়? জমি আমাদের নয়? নে শিবন, এই লণ্ঠনটা নে। চলে যা তোরা।'

—'তোমরা কেউ আসবে না?'

—'না। হরমু নদী তো ওই হোথা, যা চলে যা।'

—'বড় আঁধার গো।'

—'আঁধারে যা, চুপিসারে যা। কেউ যেন জানে না কারে জ্বালাস, কোথা জ্বালাস।'

—'ওকে ওরা ভগবান বলেছিল।'

—'বড়সাহেব আরও বড় ভগবান, শিবন।'

—'হরমুতে জল নাই।'

—'জলে কি করবি? চিতা ধুবি? আগুন জ্বেলে দিয়ে চলে আসিস না। শেষমেশ দেখে চলে আসিস।'

শিবনরা হঠাৎ দেখল শুধু ওরা আছে, সান্ত্রী, সিপাহী, গার্ড সবাই ফিরে চলে যাচ্ছে। ওরা হাঁটতে লাগল। বড় তাপ মাটিতে বাতাসে অন্ধকারে। ওদের কথাবার্তা, আপনা থেকে বন্ধ হয়ে এল। সন্তর্পণে চলতে-চলতে শিবনের মনে হল একটা নতুন কাপড়ও ওরা ভগবানকে দিল না।

চিতা সাজাতে দেরি হল না। কাঠ নেই। শুধু শুকনো গোবরের ডেলা। ধরমু মাথা নেড়েই বলল, 'এটা অধর্ম। আমরা জাতের-ভাদের মানুষ নই। বিরসার মুখে আগুন হল না, স্নান হল না, কবর হল না, পুরুত এল না। কাঠে পুড়বে, রাঁচিতে কি কাঠের আকাল

আছে কিছু?'

—'নাও হে, তাড়াতাড়ি তুল। পচ ধরে গেল বুঝি?'

বিরসাকে চিতায় শোয়াতে-শোয়াতে ধরমু বলল, 'কেমন হায়জা হল, কেউ জানল না?'

—'নাও আগুন দাও!'

ধরমু হাত জোড় করে বলল, 'বিরসা তুমি দেখছ সব, জানছ সব। আমরা হুকুমের চাকর। হুকুমের কাজ করি। তুমি আমাদের দোষ নিও না।' ধরমু চিতায় আগুন দিল।

ওরা দূরে সরে এল। বিরসাকে ঘিরে আগুন উল্লাসে জ্বলে উঠল, আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল।

আগুনের দিকে চেয়ে ধরমু মেথর বলল, 'উলগুলানে, অনেক আগুন জ্বালিয়েছিল, আগুন ওরে চিনে। জ্বলছে কেমন দেখ।'

—'হা তোর 'উলগুলানের' হেথাই শেষ রে?'

ঠাট্টা করতে গেল ভিখন, ঠাট্টাটা মাঝপথে থেমে গেল। সকলে সভয়ে এ ওর দিকে চাইল।

শিবন দেখতে লাগল চিতা জ্বলছে।

তারপর, চিতা জ্বলে-জ্বলে যখন শেষ হয়ে এল, তখন হাতের লাঠি দিয়ে আগুন খুঁচিয়ে শিবন বলল, ' তোমরা যাও। আমি চিতা ধুয়ে দিব।'

—'তুই একা?'

—'হ্যাঁ, একা।'

ওরা শিবনের দিকে চাইল, কি বলতে গিয়ে বলল না। চলে গেল।

ওরা চলে যাবার পর শিবন সামনের দিকে চাইল। চিতার আগুন এখন গুমরে গুমরে জ্বলছে। শিবন জানে এরকম আগুন অনেকক্ষণ জ্বলে। গুমরে, ধুঁইয়ে, বহুক্ষণ ধরে। হাজারিবাগে, ওর ছোটবেলা জঙ্গল থেকে ওরা বসন্তকালে বনফুলের শুকনো ঝোপ কুড়িয়ে এনে উঠোনের কোণে পাঁজা করে রাখত। শীত এলে সেই কাঠ জ্বালিয়ে হাত পা সেঁকত। কুলকাঠের আগুন অনেকক্ষণ জ্বলত। শিবনের মা বলত, 'আমার শীত লাগে না রে। আমার বুকে কুলকাঠের আংরা জ্বালিয়ে দিয়ে গেচে তোর বাপ, তোর দাদা, ভাইটা।'

শরীরটা চিতায় ছাই হয়ে এল। শরীরে তো ছিল না কিছুই। যেন পাতার মতো হয়ে গিয়েছিল। ওর ঘর সাফ করতে গিয়ে শিবন কতদিন দেখেছে শেকলের ভার টেনে-টেনে বিরসা ওই ছোট্ট ঘরে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সলিটারি সেল। কথা বলতে মানুষ নেই। ও একা-একা ভুরু কুঁচকে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বড় ছোট ছিল ঘরখানা। এদিক থেকে ওদিকে হাঁটলে মাত্র চোদ্দ পা হাঁটা যেত। তারপরই দেওয়াল। উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে-পশ্চিমে দেওয়াল, শুধু দেওয়াল। ভরমি, ধানী, সুখরাম, কনু মুণ্ডারা কান পেতে ওর শেকল ঘষটাবার আওয়াজ শুনত।

কনু বলত, 'ছেলেবয়স হতে দাদারে কেউ ঘরে বাঁধতে পারে নাই। ওর মতো এমন জঙ্গলে-পাহাড়ে কেউ হাঁটে নাই কোনোদিন। এই 'উলগুলানের' কালো আঁধার রাতে পাহাড় ভেঙে দাদা কোথায় কোথায় চলে যেত হেঁটে।'

কিন্তু তিরিশ তারিখ রাতে, যখন শেকলের আওয়াজ শোনা যায়নি তখন মুণ্ডারা এ-ওর দিকে তাকিয়েছিল সভয়ে। ধানী মুণ্ডা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, 'শেকল টান ভগবান, হেঁটে বেড়া, টু খানি হা রে, ওই শেকলের আওয়াজ শুনে মোরা বেঁচে আছি যে।'

কিন্তু ভগবান আর ওঠেনি। আর কপাল, ভুরু কুঁচকে হেঁটে হেঁটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়নি। তিরিশ তারিখ থেকেই ওর নাড়ি দুর্বল, দ্রুতগতি। জিভ শুকনো, জ্বালা করছে। অসম্ভব তেষ্টায় ও জল খাচ্ছিল চেয়ে-চেয়ে। খাবার খায়নি একদানা। একদিনেই চোখ কোটরে। কিন্তু পরদিনের আগে ডেপুটি কমিশনার আসতে পারেনি। ডেপুটি সুপারবাবু ডাক্তারি পাসও বটেন, কিন্তু তাঁর ওর ঘরে যাবার হুকুম ছিল না। ডি. সি-র কথায় সুপারসাহেব এসে বিরসাকে কি-সব শুধালেন। বিরসা ইংরেজিতে কথা বলল। সেদিন সুপার বলে দিল ওর কলেরা হয়েছে, ও বাঁচবে না। কলেরা শিবনরা অনেক দেখেছে। হায়জা, চেচক, সাপকাটা কতভাবে মৃত্যু ওদের টোলিতে ঘুরে ঘুরে প্রজা নিয়ে যায় যমপুরীতে দাস খাটাতে। ভেদ নেই, বমি নেই। এমন হায়জা বুঝি ভগবানেরই হয়।

চিতা নিভে এল। এখন, গভীর প্রত্যাশায় চিতার আগুনের আলোকিত বৃত্তের ওপারে অন্ধকারের দিকে চাইতে লাগল শিবন। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল সালী, ভগবানের উলগুলানের সঙ্গী, বন্ধু। ওর কালো শরীরে হলুদরঙা কাপড়, চোখে কুয়াশা।

সালীর হাতে কলসি। ও আর শিবন কোনো কথা না বলে হরমু থেকে জল এনে চিতায় ঢালতে লাগল। চিতা ফোঁস করে উঠল। খানিক ছাই আর বাষ্প আকাশপানে উঠে গেল। তারপর সব নিশ্চুপ।

একমুঠো ছাই আঁচলে বেঁধে নিল সালী। শিবনের কাছে এল। হাসল। গভীর, মধুর, আশ্চর্য হাসি। এমন করে হাসতে ওকে বিরসা শিখিয়েছিল।

সালী শিবনের কাছে। খুব কাছে। কিন্তু শিবনের শরীর নিথর, বোবা। অচল সালী এত কাছে যে, ওর নিঃশ্বাস শিবনের গায়ে লাগছে।

সালী বলল, 'তুই আমায় অনেক দিলি শিবন।'

—'কি করবি?'

—'জঙ্গলে উড়িয়ে দিব।'

—'কেন?'

—'বলেছিল জঙ্গলে ছাই উড়ায়ে দিলে জঙ্গল জানবে বিরসা তারে ভোলেনি। ছাই মাটিতে পড়বে, মাটিতে গাছ জন্মাবে। সেই গাছ বড় হবে সালী।'

—'বলেছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'তুই চলে যাবি?'

—'হ্যাঁ।'

—'মোরে বলে যা কিছু!'

—'বলব! শুন।'

—'বল্।'

—'উলগুলানের শেষ নাই। ভগবানের মরণ নাই।'

—'মরণ নাই?'

—'না।'

—'তবে আমি কারে জ্বালালাম?'

—'ভগবানের মরণ নাই।'

সালী চলে গেল। নিমেষে মিলিয়ে গেল নিকষ কালো অন্ধকারে।

শিবনের রক্তে চিতার ফুলকি জ্বলে উঠল পরপর। একেকটি শব্দে একেকটি ফুলকি—উলগুলানের। শেষ। নাই। ভগবানের। মরণ। নাই।

শিবন সভয়ে, চমকে আকাশের দিকে চাইল। ওর রক্ত বড় প্রাচীন। বড় আদিম হয় কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসীর রক্ত। ওর রক্তে অনাহার, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা। রূপকথায়, কিংবদন্তীতে, অলৌকিকে, অসম্ভবে বিশ্বাস করে ওর রক্ত চিরকাল পালিয়ে বাঁচতে চায়। ছ-টি শব্দ ওর প্রাচীন রক্তের ছ-টি ফুলকি হয়ে জ্বলে উঠল।

শিবন কলসি আছড়ে ফেলে রেখে ছুটতে লাগল।

জেলে ধানী মুণ্ডা বসেছিল। বসেছিল, ভরমি, কনু, গোপী, রামাই, শত-শত মুণ্ডা শরীরে শেকল নিয়ে। শেকল নিয়ে শুয়ে থাকা বড় কষ্ট। একশো-দশ, একশো-পনেরো। ডিগ্রি উত্তাপে রূপান্তরিত শিলার দেওয়াল বড় গরম হয়। সে-গরমে চোখে ঘুম আসে না।

বুকের ভেতর ব্যর্থ 'উলগুলান'-এর উত্তাপ, বাইরে জ্যৈষ্ঠের গরম, আজ সে-গরমে বিরসার চিতার আঁচ লেগেছে। মুণ্ডাদের চোখে ঘুম ছিল না। ওরা বসেছিল। শুয়েছিল শুধু সুনারা। কিশোর, আঠারো বছরের মুণ্ডা কিশোর সুনারা। ওর শরীর দুমড়ে পড়েছিল, ঠোঁটের কোল বেয়ে, কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। আজ ক'দিন ধরেই গড়াচ্ছে। সেই বুকে পাথর বেজেছিল ডোমবারির যুদ্ধে। সেই থেকে।

আজ ও যেতে পারছিল না বিরসাকে শনাক্ত করতে। হাঁটার শক্তি ওর ছিল না।

—'তুই যাস না সুনারা', ধানী বলেছিল।

—'মোকে তোরা নিয়ে চল্।'

—'যাস না তুই।'

—'মোকে নিয়ে চল্।'

—'মরবি যে!'

—'ভগবানকে তোরা দেখবি, আমি দেখব না?'

—'মরবি সুনারা।'

—'তোরা কি জানবি, ভগবান মোকে বলে নাই, যদি বাজ হয়ে ফিরে আসি, তোরা ডরাবি। যদি বাজ হয়ে ভেঙে পড়ি, তোরা ডরাবি। যদি বাঘ হয়ে ফিরে আসি, তোরা ডরাবি। যদি জানোয়ার হয়ে ফিরে আসি, তোরা মোকে চিনবি না। তাই মানুষ হয়ে ফিরে আসব হে আমি, নতুন ধরতি গড়ে নিব। বাস্তোন হয়ে এলে, গোঁসাই হয়ে এলে তোরা মোকে চিনবি না। আমি মুণ্ডা হয়ে ফিরে আসব রে, যে-মুণ্ডাটা ফের উলগুলানের কথা

বলবে, তারে আমি বলে চিনে নিবি।'

'বলেছিল, বলেছিল', ভরমি হাহাকার করে উঠেছিল।

'কি বলেছিল?'

'ধানী, তুই বল্!'

'আমি বলব?'

'তোর সাথে সকল কথা বলে গেছে সে।'

'তবে শুন্ তোরা! তারে যা বলেছি, সে যা বলেছে, সার কথা বলেছে ভরমিকে।'

'ভরমি, তুই বল্।'

'আমারে বলল, ভরমি, জেহেলে এই চারশো মুণ্ডারে বাঁচায়ে যাব। ম্যাজিস্ট্রেটে যখন আদালতে আমাদেরকে উঠাবে তখন আমি বলব তোদের চিনি না। যা করেছি, অন্যাদের নিয়া। তোরা তাতে ছিলি না। তোরাও বলবি আমাকে চিনিস না।'

'বলল?'

'বলল। বলল এরা আমাদের জেহেল হতে বেরাতে দিবে না। আর এই মাটির শরীর না ছাড়লে তোরা বাঁচবি না। আশা ছাড়িস না। ভাবিস না আমি তোদের ভাসিয়ে গেলাম। সকল হাতিয়ার তোদের দিয়াছি, সব শিখায়েছি। তাই দিয়ে লড়ে বাঁচবি।'

'বলল।'

'আরও কত বলে গেল। আমি ফিরে আসব রে ভরমি। বুন্দু, তামার, কত জায়গায় হোলির আগুন জ্বালাব। সোনপুরে ধুলার আঁধি উড়াব। জানবি বানোর পাহাড়ে রেশম পোকা ডিম পেড়েছে। সে ডিম হতে যেমন অ—নেক রেশম পোকা বারায়, আমার কথা হতে নতুন কথা বারাবে।'

'চল্, সুনারাকে নিয়ে যাই।'

তখন সুনারাকে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। বিরসার শরীর ঘিরে হেঁটে ও ঘরে চলে আসে, সেই থেকে মাথা তুলতে পারেনি। এখন সবাই জানে ও মরেছে। কিন্তু ও জানে কি না, তা কেউ জানে না।

সকলের চেয়ে বয়সে ছোট ও। জমি ছিল না, গাইবলদ, ঘর, কিছুই ছিল না। চেন্দু গ্রামে সুরজ সিং দিনান্তে এক থালা ঘাটো আর এক ডেলা নুন, বছরে তিনটে খাটো কাপড় দিয়ে ওর জীবন-মরণ কিনে নিয়েছিল।

নিজের বলতে ওর ছিল একটা কাঠের কাঁকই, একটা বাঁশি, একটা ধনুক। তাই নিয়েই ও জঙ্গলে-জঙ্গলে সুরজ সিংয়ের গাই ছাগল চরাত, নেকড়ে বা চিতাবাঘ তাড়াত তীর ছুঁড়ে, নইলে টিন বাজিয়ে।

আর গান গাইত। বিরসা তখন আনন্দ পাঁড়ের ঘরে থাকে, ভগবানের গান গায়। সুনারা ওকে দূর থেকে দেখত। ওর গান শুনত।

বিরসা গান গেয়ে, শুধু গান গেয়ে, তখনো মানুষের রক্তে মাদল বাজিয়ে দিতে পারত। সুনারার রক্তে বাজনা বেজে উঠেছিল তখনি। তাই 'উলগুলান'-এর ডাকে ও সূরজ সিংয়ের গাই-ছাগল মাঠে ছেড়ে দিয়ে, সূরজের ঘরে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বেলে

দিয়ে, চিনা ঘাসের দানা—যে-দানা সেদ্ধ করে ও ঘাটো রেঁধে নিত—সেই চিনা ঘাসের দানার বোরা আর এক ডেলা নুন লুটে নিয়ে চলে এসেছিল বিরসার কাছে। আর ফিরে যায়নি।

সেই সুনারা শুয়ে শুয়ে মরছিল। অন্য মুণ্ডারা বসেছিল। ওরা ভাবছিল দাহ শেষ হয়ে গেল, শিবন ফিরছে না কেন?

এমন সময়ে পাগলাঘণ্টি বাজল — ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং।

কেন ঘণ্টি বাজছে? কে গারদ ভেঙে পালাল? কি হল সহসা? কেন করিডোরে বুটের শব্দ? কেন সান্ত্রীরা ছুটে যাচ্ছে? কে চেঁচাচ্ছে? কে বলছে, 'সাহেবকে খবর দাও গো।' কে চেঁচাচ্ছে এমন করে?

উলগুলানের শেষ নাই! ভগবানের মরণ নাই।

মুণ্ডারা বিদ্যুতের চাবুকে চমকে মুখ তুলল। সবাই দরজার দিকে এগোতে চায়, মুখ বাড়িয়ে শুনতে চায়। শুধু ধানী, বৃদ্ধ ধানী সুনারাকে ধরে বসে রইল স্থির হয়ে। বহু, বহুদিন ধরে ও লড়ছে। সাঁওতালদের 'হুল'-এ তীর ছুঁড়েছে, সর্দারদের 'মুলকি' লড়াই-এ শামিল হয়েছে, বিরসার 'উলগুলান'-এ যোগ দিয়েছে।'

একা ও জানে 'উলগুলান' শেষ হয় না, ভগবান মরে না। ভগবান আবার মুণ্ডা হয়ে মুণ্ডা মায়ের কোলে ফিরে আসে। ও কেন শুনতে যাবে? যারা অজ্ঞ, তারা শুনুক।

'উলগুলানের শেষ নাই! ভগবানের মরণ নাই।'

শিবনের গলা। শিবন চেঁচাচ্ছে!

ছুটতে ছুটতে গলাটা এদিকে আসছে। কে যেন বলল, 'শিবন মেথর পাগল হয়ে গেছে গো!'

—'ধর, ওকে ধর।'

—'উলগুলানের শেষ নাই! ভগবানের মরণ নাই রে মুণ্ডারা, আমি জেনে এলাম! উলগুলানের, তোদের উলগুলানের শে—।'

শিবনের গলা হঠাৎ থেমে গেল।

সব কোলাহল নিশ্চুপ। চাবুকের ঘা, লাঠির ঘা, মানুষের শরীরে পড়ছে তার শব্দ। ঝটাপটি চলছে, গোঙানির শব্দ। হেঁচড়ে মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বুটপরা পা'তার শব্দ।

সুনারা বলল, 'ধানী আমার মুখ মুছা।'

ধানী ওর মুখ মোছাল।

—'ভগবান বলেছিল, সিংভূমের সকল জঙ্গল আর মাটি আমরা ফিরে পাব।'

—'চুপ যা।'

—'সকল জঙ্গল পাব! সেই যেদিন ধরতিটা ছোট মেয়ের মতো কাঁচাটা ছিল! তেমনি ধরতি আবার হবে। ধরতিতে মহাজন নাই, দিকু নাই, সাহেব নাই। শুধু সব জঙ্গল আর পাহাড় রে ধানী।

—'চুপ যা।'

—'তেমন ধরতি তোরা দেখবি, আমি দেখব না। মোর মুখ মুছা ধানী। ঠাকুর নাম শুনা, সে-গান গা ধানী তোরা। সে-'বোলোপে' গান শুনা, আমি তোদের শুনাতাম।'

একটু ঘড়ঘড়-ঘড়ঘড় শব্দ হল। সুনারার গলা থেমে গেল।

—'সুনারা মরে গেল ধানী?'

ধানী জবাব দিল না। সুনারার মাথা কোলে নিয়ে দুলতে লাগল ও। তারপর গেয়ে উঠল—

'বোলোপে বোলোপে হেগা মিসি হোন্ কো।
হোইও ডুডুগার হিজ্ তানা।
বোলোপে।
ওতে রে ডুড্ড্যার সিরমা রে কোআন্সি।
দিসুম তাবু বুআল তানা
বোলোপে...
তাইওম্ তে দো হোরা কাপে নামিয়া।
দিসুম তাবু নুবা জানা।
বোলোপে ...'
('ও ভাই, ও বোন, ও ছেলেরা, ছুটে যা, প্রাণ বাঁচা
আঁধি উঠেছে।
ও ভাই ...
ঝড় মাটির বুকে, আকাশ ঢাকা কুয়াশায়।
আমাদের দেশ দেখ্ ওই ছিনে নিয়ে গেল।
ও ভাই ...
পরে আর পথ পাবি নে রে।
সব যে আঁধারে আঁধারে!
ও ভাই ...।')

ধানী থেমে গেল। সকল মুণ্ডাদের গলা থেকে, রক্ত থেকে, মন্ত্রের মতো, যন্ত্রণার মতো, গম্ভীর আর্ত গান উঠে এল একসঙ্গে—

'বোলোপে—'

জেলে বসে ধানী মুণ্ডা, ভরমি মুণ্ডা, বিরসার কথা বলত।

অনেক, অনেক চাঁদ আগে বিরসার পরদাদার পরদাদা, বুঝি তাদেরও পরদাদা এসেছিল ঘর বাঁধবার ঠাঁই খুঁজে-খুঁজে। তখন জঙ্গল, পাহাড়, জমি পড়েই থাকত। জায়গা খুঁজে-খুঁজে এসে আচোটা জমিতে শাবল মেরে যে খুট গাড়ত, সেই খুটখাট্টি গ্রাম পত্তন করত।

ওরা এসেছিল দু-ভাই—চটিয়া হরম আর নাবু। তখন শ্রাবণ মাস। ডোমডাগরা নদীতে বান ডেকেছিল দু-কূল ছাপিয়ে। সেখানে সেই নদীর ধারেই ওরা চুটিয়া গ্রাম

পত্তন করে। ওদের দু-ভাইয়ের নাম থেকে ক্রমে অঞ্চলটির নাম হল ছোটনাগপুর।

ওরা ছিল পুতি মুণ্ডা। যেখানে গ্রাম পত্তন করত, সেখানেই বসত করতে আসত মানুষ। আবার একদিন ওদের কেউ-কেউ চলেও যেত নতুন জায়গায়। কালো-কালো মেয়ে পুরুষ, গাই-ছাগল মোষ, সংসারের জিনিসপাতি, ঝুড়ি-কোদাল-শাবল-খন্তা-তীরধনুক। ওদের পায়ে-পায়ে গড়ে উঠল তিলমা, তামার, উলিহাতু, চালকাড়—গ্রামের পর গ্রাম।

তখনো সহজ ছিল সব। জঙ্গলে শিকার খেলত ওরা। জঙ্গলে গাই চরাত। জঙ্গলের পাতা-কাঠ আনত, জঙ্গল কেটে জমি আবাদ করে নিত। ওরা জানত সিংবোঙা সব দেবতার ওপরে। সকল বোঙার ওপরে তার রাজত্ব। পহান ছিল সেই সিংবোঙার পুরোহিত।

কিন্তু বিরসা কেন। বিরসা জন্মাবার অনেক আগে, বুঝি বিরসার ঠাকুরদাদা লকরা জন্মাবার আগে বদলে গিয়েছিল সব। কেমন করে বদলে গিয়েছিল সে কথা শুধু ধানী মুণ্ডা জানে। আর কেউ না। ধানী সে-কথা বন্দী মুণ্ডাদের বলত। ওর কথা শোনবার অনেক সময় ছিল মুণ্ডাদের, কেন না, ওদের জেলে রাখা হয়েছিল বটে, বিচারাধীন অবস্থায় একের পর এক বন্দী মারাও যাচ্ছিল, কিন্তু সরকার তখনো তদন্ত শেষ করতে পারেনি। আর তদন্ত শেষ না হলে কেস দাঁড় করানো যায় না। মাঝে মাঝে কয়েকশো নিঃসম্বল মুণ্ডার অরণ্যের অধিকারের লড়াই এমন ভীষণ অপরাধ হতে পারে, যে ব্রিটিশ গভরর্নমেন্টের সমস্ত শাসনযন্ত্র কাজে লাগলেও কেস তৈরি করতে অনন্ত সময় লেগে যায়। মুণ্ডারা বিচারাধীন থাকে। কেস তৈরি হয় না।

—'ধানী, তুই জানলি কি করে?'

—'নয়তো কি তোরা জানবি? আমি কি আজকের মানুষ রে? সাঁওতালরা যখন হুল করে, আমি তখনো পাঁচশো চাঁদা পার করে দিয়েছি। আমি দেখি নাই কাকে? সিধুকে দেখে এসেছি, কানুকে। ভাগনাদিহি যেয়ে তাদের হুলে শামিল হই নাই আমি। কুঁচফল হতে বিষ করতাম কুচিলা, সাপের বিষ বের করে নিতাম, আমার মতো বিষ বানাতে কে জানত বল?'

—'হ্যাঁ তুই হুল দেখেছিস?'

—'দেখি নাই? তখন আমার বেটাগুলো জোয়ান। দুটার ঘরে আমার নাতি হয়ে যেয়েছিল।'

—'তারা কোথা?'

—'তাদেরকে আমি ছেড়ে এলাম।'

—'কেন?'

—'বলে দিলাম সাহেবের সামনে, ওরা কেউ নয় আমার, আমি কেউ নই ওদের, নইলে ওদেরও ঝুলাত ফাঁসে।'

—'ঝুলাত?'

—'হ্যাঁ রে। তখন দেখে নিলাম দিকুরা কেমন হয়, কেমন হয় সাহেব।'

—'তখন হতে জানলি?'

—'জানলাম। হ্যাঁ দেখ্, বিরসার বংশের আদিপুরুষ ছোটনাগপুর পত্তন করে। কিন্তু রাজা হল অন্যে! সে হতে আমাদের মাটিতে জঙ্গলে বাইরে হতে লোক এসে সব কেড়ে নিল। অন্য জাতের, অন্য দেশের মানুষ।'

চারিদিক থেকে মানুষ এসেছিল। যারা এসেছিল, তারাই দিকু। ধানী জানত যারা এলে মুণ্ডাদের প্রাচীন খুটখাট্টি গ্রামব্যবস্থা ভেঙে গেল, যারা মুণ্ডাদের উচ্ছেদ করে জমি-জেরাত দখল করে নিল, তারাই দিকু। তারা 'বেঠবেগারীর' নিয়ম করল। বিনা মজুরিতে বেগার খাটতে হত। ধানী জানে, জীবনের সবচেয়ে যন্ত্রণার্ত মুহূর্তগুলো মুণ্ডারা গানে-গানে ধরে রাখে। সে-গান কে বাঁধে, কে সুর দেয়, কেউ জানে না।

সে-কথা মতে হতে ধানী বলল, 'হ্যাঁ দেখ্, দিকু ঘোড়া চায়, মুণ্ডা পয়সা দিবে। দিকু পালকি চায়, মুণ্ডা দাম দিবে, কাঁধে বইবে। দিকু যা চায় সব দিবে মুণ্ডা। দিকুর ঠিকাদারকে সাহেবের আদালতে জরিমানা করলে টাকা যোগাবে মুণ্ডারা। তা বাদে জোর করে টাকা ধার লিয়া করাবে মুণ্ডাকে। তা বাদে উচ্ছেদ করে দিবে। তখন আছে আড়কাঠি। তারা বোকা মুণ্ডাগুলাকে কুলি করে নিয়ে চলে যাবে সেই কোথা। আমার বোন-বোনাইটাকে নিয়ে গেল সেই কোথা। দেশ ছাড়লে মুণ্ডারা ফিরে না রে। তারা পথ চিনে না, বিদেশে মরে ভোখছানি লেগে। কোন মুণ্ডাটা বিদেশে যেযে ভাল খায় নাই, থাকে নাই।'

এইরকমই ছিল ধানীদের জীবন। সে-জীবনে ঢুকে পড়েছিল মহাজন, জমিদার, মিশনারি, জেলকাছারি, বাঁধানো রাস্তা, রেলগাড়ি, বেয়নেট, বন্দুক, খরা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, আড়কাঠি, বেঠবেগারী ...

যৌবনে ধানীরা গান গাইত,

> 'বেঠবেগারী দিতে মোর কাঁধে ঝরে লৌ গো।
> জমিদারের পেয়াদা ওই রাতে দিনে।
> তাড়ায় মোরে, কাঁদি আমি রাতে দিনে।
> বেঠবেগারী দিয়ে মোর এই হাল গো—
> ঘর নাই সুখ মোরে কি দিবে গো।
> কাঁদি আমি রাতে দিনে।
> চোখের জলের মতই লুনপারা মোর লৌ গো।'

ধানীর যৌবনের জমি, জঙ্গল, পাহাড়, জন্মসূত্রে পাওয়া মুণ্ডারী দুনিয়া থেকে মুণ্ডারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল।

তখন ধানীরা বুড়োদের কাছে শুনত একদিন কালো-কালো মানুষদের ঘরেই জন্মাবে ওদের ত্রাতা। একদিন সে আসবে। আর সিংভূম-রাঁচির পলাশফোটা জঙ্গলে যেমন করে আগুন জ্বলে, তেমনি করে সে খবর জ্বলে উঠবে সারা মুণ্ডারী দুনিয়ার আসমান লাল করে। কালো মানুষের কোলে আসবে অনার্য কৃষ্ণ। তাই মুণ্ডাদের জীবনটা কংসের কারাগার হয়ে গেছে।

বুঝি সে এসেছে বলে বড় আশায় ১৮৫৫ সালে ছেচল্লিশ বছরের ধানী মুণ্ডা চলে গিয়েছিল বারাহাইত হয়ে ভাগনাদিহির মাঠে সিধু আর কানু সাঁওতালদের দলে যোগ দিতে। মুণ্ডাদের খুটখাট্টি ব্যবস্থায় সব ছেলেই চাঁদা নিয়ে জমিতে দখল বজায় রাখতে পারত। সাঁওতালরা জঙ্গল কেটে যে জমি হাসিল করত তার নাম 'দামিন-ই-কো।' সাঁওতালদের জীবনেও, ওদের দামিন ই-কোর জীবনেও দিকু ঢুকে পড়েছিল।

—'তাই ওরা হুল করেছিল।'

—'তুই কি করেছিলি?'

—'ওদের বন্দুক, আমাদের তীর-ধনুক। তবুও দু-বছর চলল হুল।'

—'তুই কি করলি?'

—কুচিলা তৈরি করতাম। তীরের ফলায় মাখাতাম। বিষ-কণ্টিকারির ফল জলে সিজিয়ে ক্বাথ করতাম। সে ক্বাথে তীর ডুবাতাম। শুকাতাম। এই করতাম।

—'কেন গিয়েছিলি?'

—'শুনেছিলাম ভগবান এসে গেছে। এ-ভগবান কোলে নিয়ে মানুষ দুলায় না ভুলায় না। এর হাতে তীরধনুক আর বলোয়া।'

—'ভগবান এল না?'

—'ভগবান এল না।'

—'তুই কি করলি?'

—'বিশ বছর বোকাটা হয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম। মহাজনের খেত চষলাম, গাই-চরালাম, পেটে ঘাটো খেলাম, গায়ে কাপড় পরলাম। তা বাদে গঞ্জে ঘুরতাম। হাটে ঘুরতাম। কেউ বলে না হুল হবে। কিন্তু কান পেতে থাকতাম আমি, শুনে নিতাম সব। একদিন ওই ভরমিটা, এখন বসে বসে ভালমানুষটা সেজে আছে, ও বলল, 'চল ধানী, ভাগনাদিহি যাই।'

—'তা বাদে?'

—'আমি বলি কেনে? তা ও বলে, সেথা সিধু কানুর গাঁয়ে সব সাঁওতালরা যাচ্ছে, পুজো দিচ্ছে। তা আমি বলি তবে বুঝি ভগবান এল, দাঁড়া, কুচিলা বের করে নিই পো খানি। তা ও আমাকে চড় মারল। বলল, বোকাটা। আগে যেয়ে দেখি, তবে তো কুচিলা নিক্‌শাবি। কুঁচফল নাই কোথা? তা চলে গেলাম। এবার ভিন পথে।'

—'রেলে চেপে?'

—'না। হেঁটে গেলাম। তখন আমি আটশো চাঁদ পার করে প্রায় সত্তর বছরের বুড়োটা। ও জোয়ান। দুজনে জঙ্গলে হেঁটে গেলাম। গিয়ে দেখি সাঁওতালরা নিজেদের পুরোনো না নিয়েছে খেরোয়ার। ঝগড়া খুব। খেরোয়ারদের তিনটা দল হয়েছে। হুলের পর সাঁওতাল পরগনা হয়েছিল। সে-পরগনা হতে লড়াই হাজারিবাগে চলে এল।'

—'তুই কি করলি?'

—'কুচিলা তৈরি করলাম। তীরের ফলায় মাখালাম। বিষ-কণ্টিকারির ফল জলে সিজিয়ে ক্বাথ করলাম, সে ক্বাথে তীর ডুবালাম, শুকালাম। এই করলাম।'

ভরমি মুণ্ডা বলল, 'তোর এই কাজ।'

—'এই কাজ! খেরোয়াররা বলল, সেই অযুত-নিযুত চাঁদ আগে চম্প দেশে থাকতাম আমরা, তখন আমরা খেরোয়ার। তখন আমরা কারও খাজনা দিই নাই, এখনো দেব না। যুদ্ধ হল খুব। কিন্তু বন্দুকের মুখে ধনুকের লড়াই টিকল না।'

—'টিকলো না?'

—'তখনো আমি সা-জোয়ান। সবে আড়াইশো ছাঁদ পার করছি। তোরা বছরের হিসাব বুঝিস। এক বছরে বারো চাঁদ হয়, তা দিয়ে বুঝ্। তখনো একবার পাঁচ পরগনা হতে উচ্ছেদ হয়ে যায় মুণ্ডারা। সে-বার ছোটনাগপুরের রাজার ভাইটা, সেই হরনাথ শাহী, আমাদের খুটখাট্টি গ্রামগুলো নিয়ে দিয়ে দিয়েছিল ভিনদেশী মহাজন-ঠিকাদারদের। আমার সেই কুচিলা তৈরিতে হাতেখড়ি পড়ল।'

—'কি হল!'

—'কতবার তো তোদের বলেছি। মুণ্ডাদের হঠাৎ শয়ে শয়ে গ্রাম ছেড়ে দিতে হল দিকুদের হাতে। মুণ্ডারা চলে গেল খুনটিতে, তামারে। শুরু হয়ে গেল লড়াই। তখনি আমি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতাম, কুচিলা তোরা সবাই তৈরি করিস, আমার মতো কুচিলা বানাতে কেউ পারবি না, সেবারই আমার হাতে খড়ি দিল ওই ভরমির বাপের কাকা, পহান ছিল সে। বলে দিল, সবাই লাল কুঁচ খুঁজে। তুই কালো কুঁচ থেকে বিষ তৈরি কর। লাল কুঁচের বিচি শরীরে বিঁধলে মরণ ধিমা-ধিমা। কুচিলাতে কালো কুঁচের বিচির কাথ থাকলে মরণ হয় সরাসরা, নিমেষে। সেই শিখলাম আমি।'

—'তা বাদে?'

—'সেবারও ভগবান দেখি না! সিধু-কানুও দেখাল না। খেরোয়াররাও ভগবান দেখাল না। বুকে বড় দুঃখ হল। এদিকে মোর বয়স বেড়ে যায়। দিকুতে দিকুতে দেশ ছেয়ে গেল। খুঁজলে একটা মুণ্ডা মিলে না, যার ঘরে দশটা টাকা আছে। সব ভিখিরি হয়ে গেলাম। কতজনে যেয়ে মিশনে নাম লিখাল। আকালে-আকালে দেশ উজাড়। মহাজন কত সেবকপাট্টা লিখাল। মুণ্ডারা বুড়ো আঙুলে সই দিল। আমিও দিলাম।'

—'কার কাছে?'

—জগদীশ সাউ, খুন্টির বাজারে কখনো দেখিস নাই?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, গরুর গাড়িতে সেদিন লাশটা আনা করেছিল বটে।'

—'ধুর? জগদীশ কবে মরাছে, দেখেছিস তার বেটাকে।'

—'জগদীশ মরাছে?'

—'মরবে না। ঘাটো দিত কম-কম, খাটাত দিনভোর। শেষে তীর খেয়ে মরল।'

—'তা বাদে?'

—'মেরে পালালাম। ফেলে দিয়েছিলাম জঙ্গলে। তা মরার দশ বছর বাদেও তারে সবে খুঁজত।'

—'তা বাদে?'

—'আমি যেয়ে চালকাড়ে উঠলাম।'

—'তা বাদে?'

—'ততদিনে সর্দাররা, মিশনের মুণ্ডারা বলছে মুল্‌কুই লড়াইয়ের কথা। দশ বছর ধরে ওরা মুল্‌কুই লড়াই চালাল। জেকব সাহেব ওদের হয়ে মিশনের সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে কত লড়াই করল, জিতল না। মুল্‌কি লড়াই ধিমা ধিমা চলতে থাকল। আমি তাদের কাছে থাকতাম।'

—'কাদের কাছে?'

—'সর্দারদের কাছে।'

—'কি করেছিস্ সেথা?'

—'কুচিলা তৈরি করেছি। কুচিলা তীরের মাথায় মাখিয়েছি, আর হেসেছি।'

—'কেন?'

—'বাঃ হাসব না? ততদিনে তো সুগানা মুণ্ডার ঘরে এসে গেছে ভগবান। বিরসা তখন ছোট। আমি ওকে দেখতাম। দেখতাম আর বলতাম সর্দারদের, দুঃখ কিসের? বিশ বছর যেতে দাও, ভগবান পাবে। এ-ভগবান মানুষকে ভুলায় না, কোলে দুলায় না, এর হাতে বলোয়া থাকবে, তীরধনুক থাকবে।

—'সর্দাররা কি বলত?'

—'ওরা কি সে-কথা আমাকে বলেছে? তবে মুল্‌কি লড়াই ওদের চলতে থাকল। চলতে থাকল ধিমায়-ধিমায়। বিরসা উলগুলানের ডাক দিল, তখন সবাই চলে গেল।'

—'বিরসা নাই, এখন কি হবে?'

—'উলগুলানের শেষ নাই, ভগবানের মরণ নাই, শিবনের মুখে শুনিস নাই? নে, ঘুম যা। আকাশ দেখ দুধবরণ হয়ে গেল। গির্জার ঘণ্টা বাজে।'

—'চালকাড়ে তুই তখন ছিলি ধানী? বাম্‌বায় যখন ভগবান জন্মায়?'

—'ছিলাম।'

বিরসার বাপ সুগানা মুণ্ডার খুটকাট্টি গ্রাম উলিহাতু। কিন্তু উলিহাতুতে সেই খেরোয়ার লড়াইয়ের আগেই, আর থাকা যাচ্ছিল না। গয়া, ছাপরা, আরা, ভাগলপুর, তিরহুত, জায়গা-জায়গার মহাজনরা আইনের ভয় দেখিয়ে মুণ্ডাদের হাত থেকে খুটকাট্টি গ্রাম নিয়ে নিয়েছিল। যাদের গ্রাম, তাদের খেতমজুরের কাজেও রাখেনি। তাই অন্য অনেক মুণ্ডার মতো সুগানাও আজ খেত-মজুরির খোঁজে কুরুম্‌বদা, কাল গাইচরী, কাজের খোঁজে বাম্‌বা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সম্বল একটা পোঁটলা, মাটির কড়াই, মাটির হাঁড়ি, ঘাসে-বোনা চাট্টি, এক খুঁচি চিনাঘাসের বীজ, এক ডেলা নুন।

নিজ বাসভূমেই সুগানাদের ঘর মিলছিল না। ঘর বাঁধবে জঙ্গলের কাঠে ও বাতায়, সে-জমি মিলছিল না। ওরা আইন জানে না। নিজের ভিটা নিজের, একথা আদালতে হাকিমকে বোঝাতে পারে না। আদালতে গেলেই সবই বেচান মুণ্ডা হয়ে যায়। বেচানের ঘরদোর সব যখন জগদীশ সাউ নিয়ে নেয় তখন বেচান এক উকিল খাড়া করেছিল।

হাকিম সাহেব। দোভাষী আর উকিল তাঁকে যা বোঝাল, তিনি তাই বুঝলেন। বেচানের কথা, কোনো মুণ্ডার কথাই তিনি বোঝেন না। ইংরেজি ছাড়া কিছুই বোঝেন না। অথচ বিচার করেন মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাওঁ, হো, কোলদের। উকিল যা বলে দোভাষী যা বলে, তাই শুনে যান ও লেখেন।

মোকদ্দমায় বেচানের সব গেল—ছাগল-মেষ-লাঙলবেচা টাকা দিয়ে উকিল দিয়েছিল। হার হল।

জমি ফেরত পাননি বেচান। জগদীশের জমিতে গাই চরাবার দোষে ওর জরিমানাও হয়েছিল।

তাই সুগানা মুণ্ডা ছোটনাগপুরের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর হয়েও ভিখিরিটার মতো ঘুরছিল, ঘুরে-ঘুরে মরছিল। আকালের দিনে মুণ্ডাদের মোষগুলো এমনি করেই বুঝি হাড়পাঁজরা বয়ে বয়ে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে সবুজ ঘাস খোঁজে।

ঘুরতে ঘুরতে ওর একটা ছেলে কোম্‌তা, দুটো মেয়ে দাস্‌কির, চম্পা জন্মাল। শেষে বাম্‌বা এসে ওর বউ কর্‌মি বলল, 'নতুন ঘর তোল একটা। ছেলেটা হোক। ততদিনে দিকু এসে তুলে দেয়, চলে যাব।'

সুগানা ঘর বাঁধল একখানা। সে ঘরে হল ছেলে। বিষ্যুৎবারে জন্ম। নাম হল বিরসা।

২

বড় জঙ্গলঘেষা ঘর, পাহাড়ের কোলে। পাশ্‌নার ছেলেটাকে বাঘে নিয়ে গেল। তারপর একদিন দিকু এসে পড়ল। ভোজপুরী মহাজন। আবার মুণ্ডারা উচ্ছেদ হল।

সুগানা বলল, 'আমার মায়ের গাঁ চালকাড়ে যাই চল্‌। সেথা বীরসিং মুণ্ডা আছে।'

—' সে কি করবে? গ্রাম-মান্‌কি করে দিবে তোমাকে?'

কর্‌মি কথাটা নিরুত্তাপেই বলল। নিরুত্তাপেই জীবনান্তিক-মরণান্তিক কথাগুলো বলে ওরা। ভাগ্যের প্রহারে-প্রহারে ওদের মধ্যে এই ঔদাসীন্য।

সুগানা শান্ত, বেদনার্ত চোখ দুটি তাকাল, 'না, করে কখনো? থাকতে দিবে।'

—'বলেছিলে মিশনে যেয়ে কিরিশ্চান হবে?'

—'চল্‌ হইগা। বড় খরা। মিশনের সাহেবরা দেখে, চাল দেয়। ছেলেদের পড়ায়।'

—'পড়ে কি হবে?'

—'দুটো ছেলে আমার বড়, আরও হবে। লেখাপড়া জানলে ওরা কাছারির হাকিমের কথা বুঝবে।'

—'তুমি কি কাছারি-মামলা করবে?'

—'দরকার হলে করব। কত গ্রামে ঘর তুলব বল্‌, কত গ্রাম হতে দিকু তুলে দিবে? একটা তো জায়গা চাই আপন বলে। নইলে ছেলেরা যে-যার মতো আড়কাঠির পিছনে চলে যাবে। আর তাদের মুখ দেখতে পাবি না।'

ওরা চালকাড়ে চলে এল। আসার আগে সুগানা, পাশ্‌না, কোম্‌তা, বিরসা, সবাই

কিরিশ্চান হয়ে এল জার্মান মিশন থেকে। সুগানা হল কিরিশ্চান সুগানা মাশিদাস। বিরসা হল দাউদ মুণ্ডা, বা দাউদ বিরসা।

বিরসা জানত ওকে একদিন লেখাপড়া শিখতে হবে। মানুষ হতে হবে। দিকুদের ভাষা শিখলে তবে ও দিকুদের হাত-থেকে জমি-বাড়ি বাঁচাতে পারবে। জানত সব। কিন্তু চালকাড়ের মুণ্ডা সুগানার ছেলে আর লেখাপড়া-জানা জীবন, দুটোর মধ্যে যে অনেক পাঁচিল—মহাজন, গ্রামপ্রধান, পুলিশ, দারোগা, হাকিম, পাকা রাস্তা— অনেক অনেক পাঁচিল। সবগুলো পেরোয় ও কেমন করে? ও যে এখনো ছোট।

ছোট, কিন্তু কোনো মুণ্ডা ছেলেই আট বছরে পড়লে বসে থাকে না। বিরসাও থাকেনি। ছাগল চরিয়ে, বন থেকে কাঠ-পাতা-ফল-কন্দ-মধু এনে সংসারে সুসার করত। কর্‌মি, ওর মা বলত, 'সংসারটা হয়ে গেল ছেঁড়া কানির মতো। এদিকে সিঁয়াই, ওদিকে ছেঁড়ে। সব ছেঁড়া কোনোদিন জুড়তে পারব না।'

বিরসা জানত মুণ্ডাদের সংসার অমনি ছেঁড়া কানির মতোই হয়। তাতে ওর দুঃখ ছিল না। শুধু দিনান্তে ঘাটোর সঙ্গে নুন না পেলে ওর নিজেকে দুঃখী মনে হত।

দাদা কোম্‌তা বলত বড় হলে ও নাকি হাট থেকে একেবারে এক বস্তা নুন নিয়ে আসবে। যার যত ইচ্ছে, হাত ডুবিয়ে তুলে নিয়ে ঘাটোয় মিশিয়ে খাবে।

বিরসা দাদার অসম্ভব কথা শুনে হাসত, বাঁশি নিয়ে বেরিয়ে যেত। লাউয়ের খোলে তৈরি 'টুইলা' আর বাঁশি, দুটোই ওর বাধ্য ছিল।

টুইলার ঝঙ্কার, বাঁশির সুর, ওর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত।

জঙ্গলে বসে ও আপনমনে বাঁশি বাজাত।

যখনি ও জঙ্গলে যেত, ধানী মুণ্ডা ওর সঙ্গে-সঙ্গে যেত।

—'হা তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে ফির কেন?'

—'কেন ফিরব না? জঙ্গল তোর কিনা?'

—'কিনাই তো।'

ঘরে গিয়ে দেখে মা মহুয়াবিচি উদ্‌খলে কুটছে আর কুটছে। মা বিচি কুটবে, দিদিরা তা পিষবে। তবে তেল বেরুবে। ঘরে বাতি জ্বলবে। ওর বড় হয়ে যেতে ইচ্ছা করত। কোম্‌তার সঙ্গে গিয়ে হাট থেকে সবগুলো নুনের বোরা, তেলের জালা এনে কর্‌মিকে রানী করে দিতে সাধ যেত।

জঙ্গলে এলে সে-সব কথা ভুলে যেতে পারে ও। দিগন্তলীন নীল পাহাড়ের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখতে পারে। স্বপ্নে ও শুধু ওর সেই আদিপুরুষদের দেখতে পায়। দুই ভাই বন্যাপাগল নদী পেরিয়ে চলে আসছে। বিদ্যুৎচমকিত আলোয় উদ্ভাসিত এক কুমারী অরণ্যকার দিকে দিকে কালো-কালো হাত ছড়িয়ে দিয়ে চলছে, 'এসব আমাদের!' তাদের মুখ বেয়ে বৃষ্টি গড়াচ্ছে। নদীর জল তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ছে। কুমারী অরণ্যকার প্রহরী এক সুবিশাল হাতি আকাশপানে শুঁড় তুলে চেঁচিয়ে তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছে।

নিজের সঙ্গে একা-একা থাকতে পায় বলেও নিজেকে ভুলে থাকতে পারে।

তাই রেগে ও ধানীকে বলেছিল, 'এ আমার বন।'

ধানী ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছিল। তারপর হঠাৎ রুক্ষ গলায় বলেছিল, 'মনে রাখিস্, বলেছিস্ এ-সব তোর।'

চলে গিয়েছিল ধানী।

ঘরে ফিরে এসে বিরসা কেঁদগাছের নিচে বসে পাতার ঠোঙায় বিস্বাদ ঘাটো খেতে-খেতে দাদাকে বলে, 'ধানী মুণ্ডা কি? পাগল? না খেপা?'

—'লড়াই খেপা।'

—'কেমন?'

—'লড়াই যেথা ও সেথা। ওর বয়স আটশো অষ্টাশি চাঁদ হল। এর মধ্যে ও সেই প্রথম মুণ্ডা লড়াই, হুল, খেরোয়ার লড়াই, সর্দারদের মুল্‌কি লড়াই, সব জায়গায় লড়ে এসেছে।

—'ওই বুড়া?'

—'বুড়া হলে কি? তীর-ধনুকে ওর নিশানা পাকা। ওর মতো দেশ-বিদেশ দেখেছে কে?'

—'আমাকে জ্বালাচ্ছিল।'

কর্‌মি উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে বলেছিল, 'ওর কথা শুনিস্ না বাপ। জীবনকালে দশটি ছেলেকে ও লড়াইয়ে নামায়েছে।'

—'আমাকে ও মারতে পারবে না।'

—'যা বিরসা! সাঁঝবেলা মরার কথা বলিস্ না।'

—'ওকে আমি মেরে দেব একদিন।'

—'তোর থেকে বড় না ধানী? বুড়াটা?'

—'আমাদের খেপায় কেন?'

—'কি বলে?'

কর্‌মি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কোম্‌তা নয়, মেয়ে দুটো নয়, এই ছেলের জন্য কর্‌মির বুকের নিচে ভারী ভয়।

বিরসা লাউয়ের খোলে তার বেঁধে টুইলা বানাচ্ছিল। চোখ না তুলেই ও বলল, 'কত কথা!'

—'কি বলে?'

—'বলে এই যত বন আছে, যত পাহাড়, সব নাকি আমার।'

—'এই কথা বলে?'

—'মা, তুই কাঁদিস্?'

বিরসা ওর আশ্চর্য নিষ্পাপ, স্বচ্ছ দুটি সুন্দর চোখ তুলে বলেছিল অবাক হয়ে।

—'বিরসা, তুই মোর বুক ছেঁড়া ধন, একটা কথা শুন্।'

—'বল।'

—'ধানীর কথা কানে নিস্ না।'

—'কেন?'

—'ও পাগল।'

—'কেন?'

—'ও ভগবান খুঁজে রে বিরসা।'

—'ভগবান খুঁজে?'

—'হ্যাঁ রে।'

—' সে কি কথা?'

—'ওই কথা।'

—'ভগবান কি হাটে গ্রামে মিলে?'

—'ও জানি কোন্ ভগবান খুঁজে। সে ভগবান না কি মুণ্ডা হয়ে জন্ম নিবে। সে সকল মুণ্ডাদের তরে খুটকাট্টি গ্রাম দিবে। সে এলে দিকু থাকবে না। সে এলে সকল মুণ্ডাদের গায়ে কাপড়, হাঁড়িতে ঘাটো, খুঁচিতে লবণ থাকবে। ভাঁড়ে থাকবে মৌয়ার কড়ুয়া তেল। তখন মুণ্ডারা রাজা হবে।'

—'ধুর! এ ত পাগলের কথা।'

—'হ্যাঁ বাবা। ওর কথা তুমি শুন না'

—'শুনব কেন?'

—'ও পাগল, মুণ্ডা ছেলেদের খেপা করে।'

—'মা, ওর কথা রাখ্। একটা মজা দেখ্‌বি?'

—'কি মজা বাপ?'

—'ও—ই—পাখিটারে নামায়ে আনব গাছ হতে দেখ্‌বি?'

—'ওরে মেরো না বাপ, ও কারও ক্ষতি করে না। ওরে তীরে মেরো না বাপ আমার।'

—'ধু—র তীর মারব কেন?'

—'তবে?'

—'দেখ্ তবে।'

কোম্‌তা বলল, তোমার ছেলের গুণ জান না। ও বাঁশি বাজায়ে হরিণ বুলায়, শশাঙ্ বুলায়। বনের পশুপাখি ওর বশ।'

কর্‌মি বলল, 'যাঃ।'

বিরসা বলল, 'দেখ্ তবে।'

বিরসা টুইলা বাজাতে থাকল টুং টাং টুং টাং। খুব ছোট ছোট আলতো টোকা মেরে বাজাতে থাকল ও। সন্ধ্যার বাতাসে সে টুং টাং টুং টাং মিশে গেল, যেন সন্ধ্যার সঙ্গে এক হয়ে গেল। তারপর সোনালী সুরের মতো ভেসে নেমে এল হলুদরঙা বেনেবউ পাখি। বিরসার মাথার ওপর দিয়ে পাখা সাপটে উড়ে আবার চলে গেল কোথায়।

কর্‌মি বলল, হ্যাঁ বিরসা, তোর হাতে কি আছে?'

বিরসা বলল, 'জাদু আছে।'

—'কে শিখাল?'

—'জঙ্গলে যাস্, জঙ্গলে বাজনা বাজে শুনিস্ না মা? পাতায় পাতায় বাজনা বাজে শুনে শিখেছি।'

—'জঙ্গলে একা যেয়ো না, অ বাপ আমার।'

—'একদিন টুইলা বাজায়ে তোরে সেই নীল পাখি ধরে দিব। তুই যে বলিস্ সে-পাখি ঘরে থাকলে স—ব ভাল হয়?

কোম্‌তা বলল, যাঃ, কত বললাম তিতির কাছে বুলা, মাংস খাই, তা শুনলি না।'

—'শুনব কেন? তিতির মারবি, জাল ফেল্‌গা, তীর মার গা। আমি ধরে দিব কেন?'

কর্‌মি বলল, 'যা, ঘুমাগে তোরা। আঁধার হল, ঘরে যা।'

কর্‌মি রাতে সুগানাকে বলল, 'বিরসারে কোথা কাজে ভিড়াও।'

—'কেন।'

—'আমার ভয় করে।'

—'কিসের ভয়?'

—'জানি না। পেটের ছেলা। তবু ওরে মনে হয় অচিনা।'

—'কেন?'

—'ও কোম্‌তার মতো নয়, কোন্ মুণ্ডারী ছেলের মতো নয়, ও কেমন ছেলা?'

—'নে এ-সকল কথা ভাবিস্ না।'

কিন্তু সুগানা মুণ্ডাও বুঝত ওর ছেলে বিরসা মুণ্ডারী ছেলে, তবুও যেন অন্য জাতের ছেলে। সকলের মতো দেখতে নয় ও, মুখ চোখ অন্যরকম। সব মুণ্ডারী ছেলেই বাঁশি বাজায়, টুইলা বাজায়, বিরসাও বাজায়।

কিন্তু বিরসা বাঁশি বাজায় কি সুরে? কেমন সুরে? সুগানা যখন ছোট ছিল, তখন মুণ্ডারীদের আদি দেবতা হরম্ আসুলের পুজোয় জোয়ার উৎসবে খুব ধুমধাম হত। গ্রামপহান্ বলত, হরম্ আসুল নাকি বাঁশি শুনতে ভালবাসেন। তাই কোন্ কোন্ ছেলের আঙুলে আর ঠোঁটে তাঁর আশীর্বাদ দেন জন্মকালে।

বিরসাকে সে-আশীর্বাদ দিয়েছিলেন কি? নইলে হাতে টুইলা আর কোমরে কসিতে গোঁজা বাঁশি নিয়ে বিরসা যখন মুণ্ডারী ছেলে-মেয়েদের বারোয়ারী নাচের মণ্ডপ আখারায় যায়, তখন কেন সুগানার বয়সী, ওর মা-বাপের বয়সী চালকাডের সকল মুণ্ডা গিয়ে দু-দণ্ড দাঁড়ায়? বিরসার বাঁশি শোনে কেন?

সুগানার দাদা বড়া কানু পলুস, সে ত সেই কবে থেকেই ক্রিশ্চান! সুগানার সঙ্গে তার দেখাই হয় না বলতে গেলে। সেও কেন সেবার বলে গেল, তোর এ ছেলেটা খুব শাহানদার রে সুগানা। ওর বাঁশি শুনে গেলাম, এমন জিনিস শুনি নাই।'

আখারায় বিরসা গেছে জানলে, বিরসার বয়সী সবাই গিয়ে জোটে। করমিকে মুণ্ডারী মায়েরা বলে 'হা রে করমি, ওই দিকু নন্দ গোলদার যে ঠাকুর পূজে, সেই কিষ্ণর মত তোর ছেলা বাঁশি বাজায় যে? ছেলা বাঁশি বাজায় সকল মুণ্ডার ঘরে। সে বাঁশি শুনে ছুটান্ত খরা, দুরান্ত বরা, বনের হরিণ, স—ব শান্ত হয়ে দু'দণ্ড দাঁড়ায়, এ কে কোথা দেখেছে কবে?

সুগানার ছেলে কেন এমন হল, তার কথা সকলের মুখে মুখে ফেরে? বিরসা রে, তুই সকলের মত হ!

আমি সুগানা মুণ্ডাটা, আমার মনে থাকে না কবে আমার পূর্বপুরুষ চুটু আর নাগু এসে আচোটা জমিতে চোট মেরে, কুমারী অরণ্যকার কৌমার্য ঘুচিয়ে মুণ্ডারীদের পত্তন আবাদ করেছিল সেই কবে! কবে তাদের নামে এই বাঘ-বরা-ভালুক অধ্যুষিত শাল গজার পলাশ-কুসুম-পিয়াল পিয়াসাল-সিধা-শিবম্‌ গাছের জঙ্গল আর কিশোরী ধরিত্রীর উদ্বেল কুসুমিত বুকের মতো নাতিউষ্ণ পাহাড় দিয়ে ঢাকা যে অপরূপ , অপরূপ দেশ, তার নাম দিয়েছিল ছোটনাগপুর।

ছোটনাগপুর যাদের নামে, তাদের বংশের মানুষ হয়ে আমি —সুগানা মুণ্ডাটা, ভিখারির অধম, পেটে ঘাটো থাকে না, পরনে কাপড় কষে বাঁধলে ছিঁড়ে। কতবার ভেবেছি এ হতে পাখপাখালী হলে খেতের দানা কুড়িয়ে খেয়ে প্রাণে বাঁচতাম।

কিন্তু সে-কথা আমার মনে থাকে না। সকল মুণ্ডা আমারই মতো বাঁচে, মরে মরে বাঁচে। হা রে, আমার কপালে সেই সেংগলে-দার আগুন জ্বলে। সেই আদি যুগে সেংগেল-দার আগুনে পৃথিবী জ্বলে ছাই হয়েছিল। সিং-বোঙা আকাশ থেকে আগুন ফেলেছিল। তাতে সকল মানুষ জ্বলে মরে যায়। এক কাঁকড়ার গর্তে ছিল ঠাণ্ডা জল। মাটির বুকে ঠাণ্ডা জল। একটি ছেলে একটি মেয়ে— মুণ্ডারী তারা, শালবনের ছায়ায় ছেলেটি টুইলা বাজাচ্ছিল, মেয়েটি নাচছিল, তারা আগুন দেখে থমকে দাঁড়াল।

সিং-বোঙা আকাশ থেকে মুখ নামিয়ে বললেন, —'আরে তোরা পালা। তোদের হাতে জনম-মরণের ভার। তোরা হতে আবার জগৎ সির্জাব যে।'

তারা বলল, 'কোথা পালাব?'

—'ও—ই দেখ্‌!'

আগুনরঙা সাপ, তিনি নাগদেবতা নাগীরা, তিনি ফণায় ঢেকে ছেলেটিকে আর মেয়েটিকে নিয়ে গেলেন সেই কাঁকড়ার গর্তে। শীতল জলে তারা ডুবে থাকল। কতদিন নিদ্রায় গেল তারা জানে না। তারপর তারা সিং-বোঙার ডাকে উঠে পড়ল।

বাইরে এসে দেখে কবে থেকে বৃষ্টি নেমেছে কে জানে। সিং-বোঙা যেমন আগুন ঢেলেছিলেন, তেমনি বৃষ্টি নামিয়ে বিশ্বভুবন ঠাণ্ডা করেছেন। কতদিন ধরে কে জানে, অরণ্য, নদী, পাহাড়, পশু, পাখি, ফুল, ফল, কীট-পতঙ্গ সব—সৃষ্টি করেছেন।

সিং-বোঙা মেঘ থেকে মাথা নামিয়ে হেঁকে বললেন, 'যা! জগতে সব আছে, মানুষ নাই। তোরা সির্জা। শুন্‌, মানুষে মানুষে—মুণ্ডারী মানুষে ভুবন ভরে দে।'

সেই ছেলে, সেই মেয়ে থেকে সকল মুণ্ডারীর, মুণ্ডারী জগতের শুরু।

কিন্তু সুগানার কপালে ত সেংগেল-দার আগুন। কপালে আগুন, পেটে আগুন, মনে আগুন।

সকল আগুন সে মেনে নিয়েছে। তার মধ্যে কোনো প্রতিবাদ নেই। এত আগুন কি একেবারে নেভে? মুণ্ডা জাতির জীবনে আগুন জ্বলে আর জ্বলে।

তাতেও তো সুগানার মনে কোনো দুঃখ নেই। ভরপেট খেলে, আস্ত কাপড় পরলে,

অটুট ঘরে ঘুমোলে কেমন লাগে তা ও জানে না। তাই কম খেয়ে — না খেয়ে, ছেঁড়া কাপড় পরে ভাঙা ঘরে ঘুমিয়ে ওর দুঃখ নেই।

বরঞ্চ সুগানা আর কর্‌মি কপালকে ধন্যবাদ দেয়। অনেকের চেয়ে ওরা ভাল আছে। সেবকপাট্টা লিখে দিয়ে জন্মদাস হয়নি, কোনো দিকুর কাছে বেঠবেগারী দেবার শাসন নেই, অনেক ভাল আছে ওরা।

কোম্‌তা, বিরসা, কোলের ছেলে কনু, তিনটে কাছে আছে। মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়েছে।

আড়কাঠি ত বছর বছর এসে চা-বাগানে কুলি কাজ করলে অনেক টাকা বলে লোভ দেখিয়ে মুণ্ডাদের নিয়ে যায়।

ওরা তো যায়নি। ভালই আছে।

এই ধার-কর্জ-অভাব-অনাহার এই সুগানার ধারণায় ওর পাওনা এ জগতে। এ-জগৎ ছেড়ে ও অন্যরকম হতে চায় না।

বিরসা কেন অন্যরকম? বোহোন্দার জঙ্গলে তো সকল মুণ্ডা ছেলে গাইছাগল চরাই করতে যায়। একা বিরসা কেমন করে জঙ্গলের সকল রহস্য জেনে আসে।

কোথায় কন্দ, কোথায় কুণ্ডীতে মাছ, কোথায় সুমিষ্ট কুল আর অম্ল-কষায় আমলকী, বনকচু আর মাংসল খরা, শজারু—সব কথা ও একা জানে কি করে? যেন অরণ্য সব রহস্য ওকে জানায় একা। একা বিরসার হাতে তুলে দেয় সব লুকানো ঐশ্বর্যের সঞ্চয়। কেন এমন হয়?

বিরসা তুই সবার মতো হ। সে সবার মতো হয়, যে ছেলেটা বাপের মায়ের কোল জুড়ে থাকে। রোগাভোগা, এ বছর আকাল হলে ক্রিশ্চান হয় মিশনে গিয়ে। আবার ফসল হলে পরে স্বধর্মে ফিরে আসে।

তুই তাদের মতো হ বিরসা।

সুগানা ঠিক করল প্রথম সুযোগেই বিরসাকে কোথাও গাইচরী কাজে ভিড়িয়ে দেবে।

৩

সুযোগ এসেও গেল। সুগানা মুণ্ডাদের জীবনে ছোটছেলেকে গাইচরী কাজে ভিড়িয়ে দেবার সুযোগ খুব ছোট্ট কারণে, সংসারের নিত্যবৃত্তের কোনো ঘটনায় চলে আসতে পারে।

দুটো মেয়ের বিয়ে হতে সুগানার ধারকর্য হয়ে গেল অনেক। সে প্রায় চোদ্দ পনেরো টাকা। বিরসার পরের ভাই কনুইটাও হামা টেনে ঘাটো খাবার মতো বড় হয়ে গেল।

হঠাৎ যেন টান পড়ে গেল সংসারে। হঠাৎ কর্‌মির জ্যাঠার ছেলে, ওর দাদা চলে এল একদিন চালকাড়ে। বলল, 'বউটা ভাল নয়, বুঝলি, কর্‌মি। দুটো টাকা পেলাম কাওন বেচে। বলি মদ আনি, ফুর্তি করি, মুরগি কাটি দুটা, তা কেড়ে নিল। বলে চাল কিনব। থুঃ!'

মাটিতে থুথু ফেলল নিবাই মুণ্ডা। বলল, 'চাল কিনব। তা কিনল চাল। আমিও অমন

এক খুঁচি চাল বোরা হতে নিয়ে চলে এলাম। যা, ভাত রাঁধগা। আজ খুব খাব।'

করমি জাল পেতে খরগোশ ধরেছিল। মাংস আর ভাত খাওয়া হল সবাই মিলে। তারপর নিবাই বলল, 'চল্, ছেলে দুটাকে দে। নিয়ে যাই। তোদের আনবার মুখ নাই, খাবার মুখ বড় বড়।'

'ছেলেদের কোথা দিয়ে দিবে?'

'তোর বাপের ঘর নাই? দিবাই মুণ্ডা, তোর বাপ, আমার কাকা। তার ঘর নাই? সেথা আমরা নাই?'

সেথা গেলেও ত তোদের ঘরে খাবার মুখ বেড়ে যাবে, না কি বল?'

'কোম্‌তাটা দেখি কাজের হয়াছে। ওরে নিয়ে যাই কুণ্ডী বরতোলি। সেথা ভুরা মুণ্ডা আছে।'

'কোন্ ভুরা? সেই চিক্‌নি ভুরা?'

'হ্যাঁ রে। সেই চিক্‌নি ভুরা!'

'তার কাছে কেন?'

আ রে! সে যে তিন কুড়া ভুঁই আবাদ করে এখন উঠানে গোলা দিয়াছে। ছেলা নাই চারটে মেয়া। হোথা কোম্‌তা গাইচরাই করলে জীবন কেটে যাবে। ভাত খায় ওরা। আর লবণ কত। দেখে এলাম ডোল ভরা লবণ।'

'কোম্‌তাটা দশ বছর পার করাছে। বিরসা যে আরও ছোট।'

'আবা রে আবা। ছোট কি? ওর বয়সে তোর বাপ আমার পিঠে লাঠি পিটাছে। গাইচরী করেছি না আমি?'

'তোর মতো কি সবাই?'

'তোর বোনটা, জোনীটা ওরে ভালবাসে খুব। এখন হোথা থাকুক গা।'

'তাতে কি ওর জীবন যাবে?'

'সাল্‌গাতে জয়পাল নাগ আছে না? তার কাছে গাইচরী কাজে দিব পরে। হ্যাঁ দেখ্, জয়পাল নাগ পাঠশালা খুলাছে। সেথা পড়বেও বটে।'

'পড়ে কি হবে?'

'আবা রে আবা! থাকিস্ চালকাড়ে, বাতাস বুঝিস্ না। এখন শুধা ক্রিশ্চান হয়ে লাভ নাই। লেখাপড়া শিখলে মিশনে যাবে, প্রচারক হবে, মাথায় পগ বেঁধে হাটে হাটে ঘুরে যিশুর কথা বলবে।'

'সে মোর কপালে নাই দাদা। নিয়ে যাবি, নিয়ে যা। আমি ভাবতে পারি না আর। তিনটা ছেলা আর ছেলার বাপকে কি খাওয়াই, কি করে বাঁচিয়ে রাখি ভেবে ভেবে পাগল লাগে।'

—'কি রে বিরসা, যাবি মামার সাথে?'

—'যাব।'

—'বড় হয়াছ বাপ। খেতে দিতে পারি না, বড় কষ্ট বুকে—তাই যেতে বলি। নয়তো তোরে আমি কাছছাড়া করি না।'

—' তোমার এক কথা। আট বছর হয়া গেল, এখন কি বসে খায় এত বড় ছেলা?'

—'কত বড়, বাপ?'

—'অনে—ক বড়।'

—'অনে—ক বড়?'

—'অনে—ক।'

কর্‌মির মায়ের মন বলল, আট বছরের ছেলেকে আঁচলচাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু ও তো শুধু 'মা' নয়, মুণ্ডারী মা! মুণ্ডারী মা জানে, আট বছরের ছেলে গাইচরী করে হোক, বা কোনো দিকুর খামারে ঝাটপাট দেবার কাজ করে হোক, পেটের ঘাটো যোগাড় করে নেয়।

কর্‌মির বাপ দিবাই মুণ্ডা ছিল জ্ঞানীগুণী মানুষ। তাঁর কাছে কর্‌মি শুনেছে এক সময়ে সকল জঙ্গল আর পাহাড় ছিল মুণ্ডা, ওরাওঁ, হো, কোল, সাঁওতালদের। তখন মুণ্ডারী ছেলেকে দিকুদের ঘরের ছেলেদের মতো অনেক দিন ছায়ায় ছায়ায় কাছে রাখত, রাখতে পারত।

যে অযুত নিযুত চাঁদ আগেকার কথা। তখন পৃথিবী এত কঠিন হয়নি। সব কিছু ছিল হরম্ আসুলের সরাসরি শাসনে। যখন সেই ছেলেটা আর মেয়েটা কাঁকড়ার গর্তে ঘুমোচ্ছে, তখনি হরম্ আসুল জল ঢেলে পৃথিবীর আগুন নেভালেন।

আগে সৃষ্টি করলেন জলের জীব। মাছদের ডেকে বললেন, 'সাগরের নিচ থেকে মাটি আন্। ডাঙার জীব সির্জাব।'

সাগর মাটি দেবে কেন? মাছেরা মুখে করে মাটি নিয়ে ভেসে ওঠে, সাগরের ঢেউ মাটি ভাসিয়ে নেয়। এদিকে হরম্ আসুল সিংভূমের চেয়েও বড় আর চ্যাটাল হাতখানা বাড়িয়েই আছে। মাটি পেলে তবে মাটির জীব গড়বেন।

শেষে কেঁচো উঠে এল। পেটের মাটি মলের সঙ্গে বের করে দিল। সেই মাটিটুকুই পেলেন বলে হরম্ আসুল স—ব গড়লেন।

সে ছিল সুখ শান্তির সরল, সরল দিন।

সেই যে ছেলে আর মেয়ে হল, তাদের হল এক ছেলে। ছেলে তো অসুখে মর মর। সেই আদি মুণ্ডা নরনারী ভেবে কূল পায় না, সন্তান মরে গেলে তারা হরম্ আসুলের মুণ্ডারী পৃথিবী, সিং-বোঙার মুণ্ডারী ধরিত্রী কাল কাল মানুষে ছেয়ে দেবে কি করে?

'হেই আবা হরম্ আসুল!' বলে সেই আদি জননী কেঁদেছিল খুব। কাল গ্র্যানাইটে গড়া মুখ বেয়ে হীরের মতো উজ্জ্বল অশ্রু পড়েছিল কত।

হরম্ আসুল বললেন, 'বাবা! ভুবন সিজে একটু ঘুম লেগেছে চোখে, অমুনি ডাকলে?'

সেই জনক জননী বলল, 'ছেলা যে মরে যায় ঠাকুর! তুমি ছাড়া কারে ডাকব?'

'কেন দরজা ঘিরে, চৌকাঠ জুড়ে কয়লা দিয়ে ছবি আঁক্। দেখে অসুখ পালাবে। মোর পূজা দে। সাদা মুরগি বলি দিয়ে পূজা দে।'

সেই পুজো দিতে তবে ছেলের অসুখ সারল।

কেমন ছিল সেসব দিন। কত সহজে দেবতা খুশি হত। এখনো কর্‌মিরা ক্রীশ্চান হয়, আবার বোঙাবুঙিও পুজো করে। কিন্তু রক্ষয়িতা দেবতা আর মুণ্ডাদের মাঝামাঝি এখন মৃত মুণ্ডার সমাধিপাথর শ্মশান-ডিরির মতো বড় বড় বাধা। বৈষ্ণব ধর্ম, সন্ন্যাসী ধর্ম, গোঁসাই ধর্ম, ক্রিশ্চান সদান্ ধর্ম, ধর্ম, দিকু-কোর্ট-কাছারী-আদালত-মহাজন-সুদ-বেঠবেগারী-সেবকপাট্টা-দাস-খত—শত শত বাধা। এত বাধা, যে দেবতারা আর মুণ্ডাদের ভাল করতে পারে না।

কর্‌মি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তাই হক। আমি আর ভাবতে পারি না! উপাসে উপাসে মাথা ঘুরে, চোখের সামনে হলুদের গুঁড়া ওড়ে, মাথা ঝিম-ঝিমায়।'

৪

তাই হল।

নিবাইয়ের সঙ্গে গেল কোম্‌তা আর বিরসা। কোম্‌তা চলে গেল কুণ্ডী বরতোলি। সেখানে ও ভুরা মুণ্ডার খামারে কাজ করবে, গাইচরী কাজ করবে।

কর্‌মির বোন জোনী বলল, 'তুই এখানে থাক্ বিরসা। আন দেশ যাবি কেন?

বিরসা মাথা ঝেঁকে বলল, 'মাকে বলা এসেছি বড় হয়া গেছি আমি। আমি বড় হব।'

জোনী হেসে মুখে আঁচল চাপা দিল। বলল, পাগল তুই! খেপাটা! বড় হবি, কি করবি বড় হয়ে?'

'মারে বোরা ভরা লবণ এনে দিব, খুঁচি ভরা চাল আর দানা।'

'তুই কি ডাকাত হবি?'

'প্রচারক হব।'

'কেমন করে?'

'পাঠশালে পড়ে।'

'আর কি করবি?'

'তোর গাই চরায়ে দিব, বেড়া বেঁধে দিব, কাঠ এনে দিব।'

'পাঠশাল কত দূর, তা জানিস্?'

'জানি।'

'জয়পাল নাগের রাগ খুব।'

'কি করে? মারে?'

'না না, মারে না। তবে খিঁচায় খুব।'

'আমারে খিঁচাবে না।'

'তবে এই ডুংরিটা পর। তোর কাপড় আজিমাটিতে কেচে দিই।'

জোনী বিরসার কাপড় কেচে দিল। ফর্সা কাপড় পরে, কাঠের ফলক, কাঠকয়লা আর ন্যাতাজুব্‌ড়ি নিয়ে বিরসা জয়পাল নাগের পাঠশালায় গেল। বলল, মোরে নাও তোমার পাঠশালে।'

'আরে, কে রে তুই?'

'দিবাই পহানের নাতি গো, কর্‌মি আমার মা। আমারে পাঠশালে নাও।'

'তোদের ঘর চালকাড়ে, তাই নয়?'

'চালকাড় হতে সাল্‌গা কেউ আসতে পারে? আমি এসেছি আয়ুভাতু। সেথা হতে আসব।'

'ভোর ভোর পাঠশাল। সাবধানে এস বাপ! পথে বন, বাঘের ভয়।'

'বাঘ আমি অনেক দেখি।'

'ডরাস না?'

'ডরাই না।'

কিছুতেই ভয় পেল না ছোট বিরসা। বড় হবেই, অনেক বড়। খুট খুট করে বনের পথে হেঁটে হেঁটে এল আর গেল সাল্‌গা থেকে আয়ুভাতু।

একদিন বিরসা চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ি ফিরল। জোনী কুলোয় যব ঝাড়ছিল।

জোনী বলল, 'কি হল?'

বিরসা বীরদর্পে উঠোন ঘিরে নেচে বেড়াল, 'কি দেখিস্?'

'কি এটা!'

'এটা 'ক', এটা 'খ' এটা 'গ', --- সব শিখে নিয়াছি আমি।'

জোনী হেসে কেঁদে সারা হল। বিরসাকে বলল, তুই এত সব শিখে ফেললি?'

'শিখে ফেললাম।'

'আয় খেতে দিই।'

'জইভাজা, তিতিরের মাংস আর বনধুঁধুলের তরকারি। মাসির কাছে খেয়ে মেখে বড় সুখ। শুধু ঘাটো ধরে দেয় না মাসি। বনের কচু আর কন্দ, পাখি, খরা, শজারুর মাংস, খেয়ে খেয়ে বিরসার মনে হয় এ পৃথিবীতে এত খাদ্য আছে। তবে তার মা কর্‌মি কেন ঘাটোর সঙ্গে নুন পায় না?'

বড় সুখ মাসির বাড়ি। ওর ওম্ মাসির ঘরে। বড় উজ্জ্বল মাসির খরখানি কড়ুয়া তেলের ধোঁয়া ওঠা দেল্‌কোয়।

কিন্তু পাখির বাসা হাওয়ায় নড়ে। জোনীর একদিন বিয়ে হল।

'মাসি গো।' বলে বিরসা কেঁদে আকুল হল। জোনী হলুদ ছোপানো হাতে বিরসাকে টেনে নিয়ে বলল, 'তুই ত মোর সাথে খাটাংগা যাবি। কাঁদিস কেনে?'

'তারা থাকতে দিবে না।'

'চুপ রে চুপ! সেথা গাইচরী করাবি বেনাদের ঘরে। মোর কাছে থাকবি?'

'তাই থাকব।'

জোনী বিরসার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'বড় হয়াছি, বড় হতে হবে। অত বড় হসনাই রে তুই।'

'কেন?'

'আমারে ছেড়ে থাকতে পারিস না?'

'তুই চলে গেলে মোরে খেতে দিবে কে?'

'তাও ত বটে।'

কিন্তু বিরসার মামী, নিবাই মুণ্ডার বউ বলল, 'যাইস না বিরসা, তোর বাঁশি শুনতে পাব না, টুইলা বাজায়ে নাচবি না তুই, আয়ুভাতু কানা হয়া যাবে।'

জয়পাল নাগ বলল, 'যাইস না বিরসা। তোর মতো ছেলা পাঠশালে আসে নাই আর। আমি যা জানি, যত জানি, তোরে সব শিখাব।'

গ্রামের ছেলেরা বলল, 'যাইস না বিরসা। তুই চলে গেলে আখারা কানা।'

বিরসা বলল, 'অনেক বড় হতে হবে না আমাকে? হেথা থাকলে আমি বড় হব?'

বিরসা জানেনি, জোনী জানেনি, জয়পাল নাগ জানেনি, গ্রামের ছেলেরা জানেনি, বিরসাকে মুণ্ডারী জগৎ আর জীবন থেকে কে টানছিল বাইরের টানে।

ভীষণ, দুর্বার, প্রবল আকর্ষণে।

মুণ্ডারী জীবন মানে হাজার হাজার অনুশাসন আর রক্তে রক্তে বিশ্বাস। আজ তুমি মুণ্ডারী, কাল তুমি ক্রিশ্চান, আবার তুমি মুণ্ডারী আবার তুমি ক্রিশ্চান। কিন্তু তোমার নাম আজ সুগানা-কোম্‌তা-ডোন্‌কা-ভরমি-ধানী—কাল পলুস-দাউস-মথি য়োহান-আব্রাহাম—যাই হোক না কেন, রক্তে থাকে সিং-বোঙার শাসন, হরমি আসুলের ভ্রূকুটি।

তাই ত যে জঙ্গল-পাহাড়-ঝর্ণা তোমার মা—তাকেও তুমি ভয় পাও কত। সব সময়ে মনে হয় আবা রে আবা! সিং-বোঙা যখন অসুরদের পুড়িয়ে মারল, অসুরদের বউরা সিং- বোঙার কাছে গিয়ে দরবার করেছিল।

আর সিং-বোঙা অসুরদের বউদের চুলের মুঠি ধরে শূন্য থেকে নিচে ফেলে দিলেন পাহাড়ে জঙ্গলে। সেই থেকে ওরা পাহাড়ে জঙ্গলে বনে দুষ্ট আত্মা হয়ে বাস করছে।

যত রাগ ওদের স—ব মানুষের ওপর। কখনো অপরূপা মুণ্ডারী যুবতী, কখনো চকিতনয়না হরিণী, কখনো মুখে আগুন-বের-করা শেয়াল সেজে ওরা মুণ্ডা পুরুষদের ভুলিয়ে জঙ্গলের গহীনে নিয়ে যায়।

নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে।

বিরসা সেই বিশ্বাসেই বড় হয়েছে। ও জানে মুণ্ডা হয়ে কয়েক লক্ষ মুণ্ডা যেমন জীবন-কাটায়, তার বাইরে অন্য জীবনের কথা ভাবাও মহাপাপ।

কিন্তু বিরসা সেই মহাপাপ করছিল। ওর রক্তে, ওর অজান্‌তে কোথায় জমছিল প্রতিবাদ?

খাটাংগাতে জোনীর বর বলল, 'ছেলেটাকে তুই ভালবাসিস। তা ওরে আর কার কাছে দিব? ও আমাদের গাইচরী করুক গা।'

জোনীরও তাই ইচ্ছে ছিল। বরের তিনটে গরু আর সাতটা ছাগল আছে সে ত জেনেই এসেছে ও। তা ছাড়া জমিজমাও হাসিল করেছে বর।

জোনী বিরসাকে বলল। ' এ কেমন ভাল হল, তাই বল্? মোর কাছে থাকবি ছেলার মতন?'

মেসো বলল, 'একটা কথা! লিখিপড়ি মুণ্ডা দেখতে পারি না আমি। গাইচরাই কর,

পেটভরে খা, আখারা যেয়ে নাচ-গান কর্। মুণ্ডা যখন লিখাপড়ি করে দিকু হতে যায় তখন মরে। মুণ্ডা হয়া জন্মাব, আবার লিখিপড়ি করব, উ সব চালকাড়ের চাল।'

কয়েকদিনেই বিরসা বুঝল, মেসো মানুষ খারাপ নয়, তবে বেদম খিটখিটে। খাটাংগা গ্রামে এমন লোক নেই, যার সঙ্গে ওর বিবাদ হয়নি। লোকটার খিচকা স্বভাবের কথা রটে গেছে খুব। সেইজন্যেই এগারো মাইল দূরে আয়ুভাতু থেকে বউ আনতে হল। কাছে পিঠে কোনো মুণ্ডা ওর হাতে মেয়ে দেয়নি।

সবচেয়ে বেশি ঝগড়া ওর ঘাসি মুণ্ডার সঙ্গে। ঘাসি মুণ্ডা আর ওর জমি পাশাপাশি। সুজনের জমির মধ্যে শেয়ালকাঁটার বেড়া। কিন্তু মেসোর বিশ্বাস বেড়া সরিয়ে ঘাসি ওর জমি বেশ খানিকটা বেদখল করেছে।

শেয়ালকাঁটার বেড়া যে সরানো যায় না তা ওকে কেউ বোঝাতে পারেনি। এমনকি গ্রাম পহান্ও নয়। বললেই ও বলে, 'কি বললে? চোখে দেখেছে কেউ?'

মানুষ ওকে বেশি ঘাঁটাতে ভয় পায়। লোকটা রাগী হোক, যা হোক, ওষুধবিষুধ জানে খুব।

সবাই জানে বিরসার মেসোর সঙ্গে দুষ্ট আত্মা, নাসান্‌বোঙাদের কথা-চালাচালি আছে। ওরা আরও জানে, ঝর্ণা-নালা দহ-বিলের বোঙা নাগ্-ইরা থাকে, সে জলে স্নান করলে বেরেল-সুদ, বোর-সুদ, পুঁড়ি-সুদ—কোনো না কোনো জাতের কুষ্ঠ হবেই।

কোন্ জলে নাগ্-ইরা এখন আছে এখন নেই, তা বলতে পারে একা বিরসার মেসো।

পহান্ও ওকে খাতির করে সেজন্যে।

দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি-দাবানল-গো-মড়ক-বসন্ত কলেরা —

কোন্‌টা কোন্ নাসান্‌বোঙার অভিশাপে হচ্ছে তাও বিরসার মেসো বলতে পারে।

ডাইন্ ধরতেও পারে ও। ডাইন্‌রা কখনো কালো বেড়াল, কখনো বুড়ো আঙুলে মানুষ হয়ে মুণ্ডাদের ঘরে ঢুকে পড়ে ঘুমন্ত মানুষের থুথু চেটে দেয়। তেমন মানুষ মরবেই মরবে।

কে যে ডাইন, কে যে এমনি করে, অন্যের আয়ু চুরি করে নিজের আয়ু বাড়াচ্ছে তা বিরসার মেসো বলতে পারে।

অমন মানুষকে ঘাসি মুণ্ডাও চটায় না। বিরসা মেসোর কোনো কথারই প্রতিবাদ করল না। ওর মনে হল মামা কিরকম মানুষ? জোনীর মতো মেয়ের জন্যে একটা জোয়ান বর জোটাল না? বেশ একটা দলমলে মুণ্ডা? যে টুইলা বাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে নেচে গেয়ে গ্রামটা মাতিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু ক'দিনে বিরসাও বুঝল রোজ ভরপেট খেতে পাওয়া, গায়ে মাথায় তেল মাখতে পাওয়া, কাপড় গামছা আস্ত আস্ত পরতে পাওয়া এর একটা অন্য সুখ আছে। সে-সুখ মানুষকে ভিতু আর কমজোরী করে দেয়। এ ভারী মজা। খেতে না পেলে, পরতে না পেলে মানুষ বিরসার বাপের মতো কমজোরী আর ভিতু হয়ে যায়। তখন সব সময়ে মনে হয় আই আবা! জোরে কথা বলব না, যদি কেউ রেগে যায়?

আবার খেতে-পরতে মাখতে পেলে মানুষ জোনী মাসির মতো কমজোরী আর ভীতু

হয়ে যায়। তখন মনে হয়, আই আবা! চড়া কথা বলব না, যদি এ-সুখটুকু ঘুচে যায়?

জোনী খুব বদলে গেল। করম পরবের নাচ থেকে ও মাথার ফুল ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল, কে ওর পা মাড়িয়ে দিয়েছিল বলে।

সেই জোনী মেসোর হাতে মারধোর খেয়েও মেনে নিল সব।

বিরসার মনে করুণা হল।

একদিন জোনী বিরসাকে বলল, 'রাগী মানুষ, কিন্তু ক্ষমতা খুব রে! কত জানে, দেখিস্ না? ওরে ধরে থাক্। তোরে সব শিখিয়ে দিবে। তখন তুই একটা গুণী বলে মান পাবি। তোরও গরু-মোষ-ছাগল থাকবে গোহালে, উঠোনে গোলা।'

বিরসা কিছুই বলল না। ও বলতে পারত, 'মাসি, আমার বাবা মিশনে যেয়ে নাম লিখাছে। সে ক্রিশ্চান, আমিও এখন বিরসা দাউদ। আমাদের জ্ঞাতগুষ্টির ছানাপছানা কতজন মিশনে যায় আসে, আসে যায়। মিশনে নাম লিখানো কত মুণ্ডা প্রচারকদের দেখি আমরা। মিশনে বলে, নাসান্‌বোঙা, নাগ্‌-ইরা সব মিছা। সিং-বোঙা হরম্‌ আসুল মিছা। কুষ্ঠ হয় ছোঁয়া হতে, রক্ত-মিশাল হতে। কলেরা হয় পচা-গলা খাবার জল হতে, বসন্তের বীজ বায়ে-বাতাসে উড়ে। সে-সকল কথার সকল সত্যি কি না জানি না। তবে তোমাদের মতো গুনিন্‌-ওঝা জাদুমন্ত্র— এ-সবেও যেন ডর কমে যায়।

জোনী বলল, 'কিছু বলিস্ না?'

'ভাবি।'

'কি ভাবিস্?'

'আমি বললে হবে? মা নাই, বাপ নাই?'

'আমি বললেও হবে না?'

জোনী যেন আঘাত পেল খুব। বলল, 'তুই আগে, আমার পেটে যেটা আছে, সেটা তোর পরে। আমি বললেও হবে না?'

বিরসা হঠাৎ বড় হয়ে গেল যেন। জোনীর বাবা নিবাই মুণ্ডা বেঁচে থাকলে যে-গলায় সান্ত্বনা দিত, সেই গলায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তাঁর কথা আর মোর কথা নয় রে! মেসো খুশি থাকে, তবেই ত।'

'খুশিই ত থাকে।'

'বড় খিচায়।'

'অমনি মানুষ।'

জোনী নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 'তুই না থাকলে আমি মরে যেতাম। এখন নিচু হয়া উঠান ঝাঁটাতে, নিকাতে, ঝর্ণা হতে জল আনতে শরীর আলায়।'

বিরসা উঠোন ঝাঁট দিল, মুরগি ধরে তুলল, গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে গোশালা বন্ধ করল। তারপর কলসি নিয়ে ঝর্ণায় গেল।

কলকল-ছলছল —ঝর্ণার জল বয়ে যায়। বিরসা কলসি ভরল, ভরা কলসি পাথরে রেখে দাঁড়াল।

সন্ধ্যা নামছে, বিষণ্ণ, আতুর, ও মা করমির মতো শীর্ণ ও ক্লিষ্ট সন্ধ্যা। সন্ধ্যাতারার

চাহনি ওর মায়ের চোখদুটির চাহনির মতো।

লুকাস এসেছিল, লুকাস প্রচারক। মিশনের কাজে এসেছিল। বিরসার মেসো তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

লুকাস বিরসাকে বলেছে, 'গাইচরী করে জীবন কাটাবি? চলে আয়, লেখাপড়া শেখ্, কত কাজ করতে পারবি।'

বিরসা লেখাপড়া শিখতে চায়। সে কেন এত গরিব বাপের ছেলে হল? বাপ খেতে দিতে পারে না, মাসির কাছে। মাসির বিয়ে হল, মাসির সঙ্গে এইখানে। এখানে জীবন মানে গাইচরাও, পেট ভরে ঘাটো খাও, খুশি থাক।

কিন্তু বিরসা জানে বিরসা খুশিতে নেই।

নিঃশ্বাস ফেলল ও, কলসি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চারদিকে উন্মুক্ত বনাঞ্চল আর পাহাড়। চোখ বাধে না কিছুতেই। কিন্তু তবু যেন মনে হয় জীবন বড় আবদ্ধ হয়ে গেল। খাটাংগা এত বিচ্ছিন্ন, এত একটেরে গ্রাম! চালকাড়ে সবই ছিল—দুঃখ, দারিদ্র্য, অনাহার! কিন্তু তবু যেন বহতা জীবনের স্রোত চালকাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত।

হাট থেকে আসতে-যেতে মানুষ চালকাড় দিয়ে যেত। মিশন থেকে লোক আসত। ধানীর মতো বেদে মানুষ আসত, রাঁচি, খুন্টি, তামার, বন্দ্গাঁও, সব জায়গার খবরাখবর আসত।

খাটাংগা সব কিছু থেকে এত দূর। এমন আবদ্ধ আর বন্দী বন্দী লাগে নিজেকে।

গ্রীষ্মে বনের সব জলের ঝর্ণা, কুণ্ডী, নদী শুকিয়ে যায়। কোথায় কোথায় তবু জল থাকে তা জীবজন্তুরা জানে আর জানে বিরসা।

সেবার সেই গোপন, মানুষের অজানা কুণ্ডী আর দহও শুকিয়ে গিয়েছিল। ঝর্ণা আর নদীর বালিম্ন বুক ধরে গর্তের গা ছুঁয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল জমত সেই উনুইতে। ভোর হতে না হতে মেয়েরা সে জল নিয়ে আসত। কেননা সূর্য উঠত সেই সেংগেল-দার আগুন ঢালতে ঢালতে। আর রোদ লাগলেই জলটুকু উবে যেত।

সেই সময়ে বিরসা গিয়েছিল জঙ্গলের পেটের ভেতর, গভীর গহনে। সেখানে একটা কুণ্ডীর জল শুকিয়ে মাঝখানে একটুকু জল আর আশেপাশে বেজায় কাদা।

ও দেখেছিল একটা মস্ত সম্বর হরিণ সেই কাদায় আটকে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের অনেকখানি কাদায় ডুবে গেছে। বোধহয় কাদা থেকে পা টেনে তুলতে চেষ্টা করেছে আর সেই নড়াচড়ার ফলে পা আরও গভীরে গেঁথেই গেছে ক্রমশ।

তারপর হরিণটা বুঝেছে সামনের ওই জলটার নাগাল ও পাবে না, কাদা থেকে পাও তুলতে পারবে না, সামনে জল রেখে পিপাসায় ও মরবে। চারপাশে বনভূমি থাকতেও ও মুক্ত জীবনে যেতে পারবে না। ভীষণ ও নির্মম মৃত্যু সামনে ওর। ভীষণ ও নির্মম মৃত্যু সামনে এ-কথা জানার ফলে ওর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা নিঃশেষিত, পরাজিত আত্মসমর্পণ ছিল।

বিরসা কি সেই সম্বরটা এখন? চারপাশে মুক্ত ও বৃহত্তম জীবন তবু সে এখানে আবদ্ধ থাকবে? ভাবলেও ভয় করে।

সম্বরটার গলাপচা শব বহুদিন, বর্ষা না আসা অব্দি সেখানেই দাঁড়িয়েছিল।

বিরসা জলের কলসি নিয়ে বাড়ির দিকে চলল। আজকাল এইসব কথা ভাবে দিনরাত। যখনি ভাবে তখনি কোথায় আছে, চারপাশে কি ঘটছে সব ভুলে যায় ও। মনে থাকে না কিছুই।

মানুষ পশু নয়, তাই ভয়ংকর আবদ্ধতা থেকে অতর্কিতে মুক্তি পেতে পারে।

বিরসা পেল।

মেসোর গাই-ছাগল নিয়ে ও চরাতে গিয়েছিল। এখন ফাল্গুনের শেষ। খেতে রবিশস্যের ফলন্ত গাছ।

একটা সিধাগাছের নিচে বসে বিরসা আপনমনে কি ভাবছিল আর ভাবছিল। তারপর ঠাণ্ডা ছায়ায়, বাতাসের আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। মেসোর লাঠি গায়ে না পড়া অব্দি ওর ঘুম ভাঙেনি।

ওর মেসোর অভিধানে যেসব অপরাধের ক্ষমা হয় না, তার প্রত্যেকটি করেছিল বিরসা।

গাইচরী করতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

গরু-ছাগল ঘাসি মুণ্ডার ক্ষেতে ঢুকে রবিশস্য খেয়ে দিয়েছে। ঘাসি লাঠি ছুঁড়ে মেরেছে। ফলে একটা পাঁঠার ঠ্যাং ভেঙেছে। সে পাঁঠাটা এখন কেটে খেতে হবে।

ঘাসি চিরকাল ছিল অপরাধী মেসো ছিল নিরপরাধ। এখন ওকে কথা শোনাবার মতো ভাল ছুতো পেয়ে গেল। ওর ক্ষেত একেবারে তছনছ হয়ে গেছে।

মেসো বিরসাকে বেধড়ক ঠ্যাঙাল। একটা কথা বলল না বিরসা। মুখটি বুজে মার খেল।

জোনীর মন থেকেও যেন ভয়ের আড়াল সরে গেল। ও তেল গরম করে বিরসার গায়ে মালিশ করল। তারপর স্বামীকে গালি দিতে বসল।

'হতভাগা! বুড়ো ভাম যেন! জানে ছেলাটা মোর ছেলার মতো। গায়ে হাত তুলল। পেটের ছেলা আমি ওকে দিব না। নিয়ে দাদার কাছে চলে যাব।'

'উনি আবার গুনিন্! কত না কি জানে শোনে! এত জানে যদি তবে ঘরের বউ মিলে না কেন? ওই রাগের কারণ! থাকুক নিজের রাগ নিয়া। উয়ার ভাত খাব না আমি। দাদার কাছে চলে যাব।

গায়ে পায়ে খুবই ব্যথা! তবু বিরসার হাসি পেল। ও বুঝল অসম্ভব আঘাত পেয়েছে জোনী স্বামীর আচরণে। রাগে আর দুঃখে সব ভয়ভীতি ভুলে এত কথা বলার সাহস পেয়েছে। আরও অবাক কাণ্ড কি, মেসো সব চুপ করে শুনল বসে বসে। জোনী আগে গাল দিল, তারপর কাঁদতে বসল পা ছড়িয়ে।

তখন মোসো, 'আরে আয়ুভাতুর মেয়াকে দাদা কিছু শিখায়নি?'

'কি শিখায়নি?' জোনী ফোঁস করে উঠল।

'পোয়াতি মেয়ে সাঁঝের বেলা কানলে পরে ডাইন্ বায়েবাতাসে পেটের ভিতর ঢুকে যেয়ে ছেলার ক্ষতি করে। নে, উঠ, মুখে চোখে জল দে। মোরে খেতে দে, বিরসাকে দে, নিজে খা। গাল ত অনেক দিচ্ছিস, আরে! যা করাছি রাগের বশে। নইলে মুখে খিচাই,

হাতে মেরাছি কোনদিন? রাগ আমার বিস্তর। কি করব বল্?'

এ একরকম হারমানা বলতেই হবে। শত্রু পরাজয় স্বীকার করলে তার, সঙ্গে আর লড়াই চলে না। জোনী উঠল। মুখ চোখ ধুয়ে আঁচল গুছিয়ে স্বামীকে খেতে দিল, বিরসাকে, নিজেও নিল।

পরদিন সকালে বিরসা হাড়ভাঙা লতা নিয়ে এল। পাঁঠাটার পা ভেঙে গিয়ে চামড়া ফুঁড়ে হাড় বেরিয়ে গেছে; সেটার পা টান করে হাড়ের জোড়ে হাড় বসাল। কত জায়গায় হাড়ভাঙা লতা বেটে প্রলেপ দিল। সে প্রলেপের ওপর রেড়িপাতা জড়িয়ে একটা পাতলা কাঠ দিয়ে ঠ্যাংটা কাঠের সঙ্গে বাঁধল। তারপর একটু জায়গা আগড় দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে পাঁঠাটাকে রাখল।

মেসো সব দেখছিল। বলল, 'হ্যাঁ রে কাজ হবে, পা ঠিক হবে আবার?'

'দিকুদের টাট্টু ঘোড়ার পা ভাঙলে এইভাবেই জুড়ে। এ লতা খুব ভাল।'

মেসো বোধহয় খুবই খুশি হল। কেননা সেদিনই কিছুক্ষণ বাদে ও একখানা পেতলের আরশি বের করে বিরসাকে দিল। বলল, 'আমি মুখ দেখি না, বয়স গিয়াছে। তুই মুখ দেখিস, কাছে রাখ।'

জোনীকে বলল, ' না রে, রাগের বশে মেরাছি। তবে যেমন নড়ছিল চড়ছিল, তাকায়ে দেখলাম তেমন চোট লাগে নাই কোনো।'

বিরসা বিকেল না হতে সংসারের হাজার কাজ করল। ঝর্ণার জল এনে এনে ডোল ভরে ফেলল। উঠোন ঝাঁট দিল। শুকনো কাঠ জড়ো করে লতা নিয়ে বেঁধে বোঝার পর বোঝা টেনে এনে এনে জ্বালানির স্তূপ করল উঠোনের কোণে। গোয়ালটা নিকিয়ে তকতকে করল।

জোনী হেসে বলল, 'পাগল খেপে কেন? কুটুম আসবে না কি ঘরে?'

বিরসা বলল, বাইরে বাইরে ঘুরি, এ কাজ করতে তোর যত কষ্ট।'

রাতে রোজকার মতোই ঘুমোতে গেল বিরসা। কিন্তু ভোর হবার আগেই ও উঠে পড়ল। চুপিসারে বেরিয়ে এল, বাড়ি থেকে খেরোল, তারপর ভুল্‌কো তারা দেখে পথ ঠিক করে চলতে থাকল। ও যাবে কুণ্ডী বরতোলি। সেখানে ভুরা মুণ্ডার বাড়িতে কোম্‌তা কাজ করছে। কোম্‌তা গাইচরী কাজ করছে বটে কিন্তু সবাই জানে ও-বাড়িতে ওর জায়গা বেশ উঁচুতে। কেননা অচিরে ও ভুয়ার জামাই হবে। কোম্‌তার কাছে গিয়ে বিরসা খুলে বলবে সব।

জোনীর কষ্ট হবে খুব। কি করবে বিরসা? কষ্ট তো তারও হবে। এতদিন সুখে দুঃখে জড়িয়ে জড়িয়ে থাকা। কিন্তু সেদিন ওকে মেরে খুব ভাল কাজ করেছে। এ ঘটনাটা না ঘটলে বিরসা খাটাংগা থেকে বেরোতে পারত না।

আর বিরসা ভাল করেই বোঝে, জোনী ওর ওপর ভরসা করে এ-কথা যেমন ঠিক, আবার ওই কারণে জোনীর অনেক অসুবিধে, তাও সত্যি। ও না থাকলে ওকে নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হবে না আর। মেসো মনে ভাববে মেসো মেরেছে বলে বিরসা রাগ করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বিরসা-দারিদ্র্যের মুক্তিবাদিতা দিয়ে বোঝে ও রাগ

করতে পারে না, কেননা মেসো কোনো অন্যায় করেনি। জ্ঞাতি-শত্রুর ক্ষেত খাইয়ে দিতে ঝগড়াবিবাদের পথ খুলে গেল। একটা পশু জখম হল, ঠ্যাং সারলেও সারতে পারে অবশ্য। বিরসার ওপর মেসো খুশি হতে যাবে কেন?

৫

বিকেল নাগাদ কুণ্ডী বরতোলি পৌঁছে গেল বিরসা। কোম্‌তা ওকে দেখতে পায়নি। কোম্‌তা আখারায় গিয়েছিল। ভুরা মুণ্ডার বউ ওকে যথেষ্ট খাতির করল। গমের আধভাঙা দানা সেদ্ধ করা জাউ খেতে দিল সঙ্গে সঙ্গে। শিশের বাটিতে তেল দিয়ে গেল পায়ে ডলতে। কোম্‌তা বাড়ি ফিরতে ভুরা বলল, 'ভাইটা এসেছে তোর! বলিস্ না কিছু। ছেলেটা জিদা আর গোঁয়ার বটে। নয়ত অত পথ হেঁটে চলে আসে?'

রাতে দাদার পাশে শুয়ে বিরসা বলল, 'তুই হেথা আরান্দি করবি?'

'হ্যাঁ রে।'

'মেয়েগুলা দেখতে কেমন?'

'ভাল না; গিমা গিমা কথা বলে, ধিমা ধিমা কাজ করে, নিমা নিমা হাঁটে।'

'তবে কেন আরান্দি করবি?'

'ভুরার শ্বশুরের খুটকাটি জমি আছে, তিনটা মোষ। তার ছেলা নাই। ভুরার বউ এক সন্তান। বলে, বড় নাতনীর আরান্দি হয়াছে জানালে সব নাতজামাইরে দিবে।'

'ভুরা কি বলে?'

'বলে সব লয়ে হেথা বাস কর্। তোর বাবা-মারে লয়ে আয়।'

'বাবা আসবে?'

'এলে ত ভাল রে বিরসা। মোদের সংসারটায় বান্ধ আসে।' কোম্‌তা উঠে বসল। বিরসা আর ওর দাদার মধ্যে আশৈশব রক্তে রক্তে জানাজানি আছে। বিরসা যদি দেখে ওর তেরো বছরের দাদা ভুরা মুণ্ডার রুগ্ন ও কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করছে—কোম্‌তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না কিছুই। বিরসা জানবে কোম্‌তা এ কাজ করেছে, সংসারটাকে বাঁধবার জন্যে।

গরিব বাপের মায়ালী ছেলে কোম্‌তা। ওর মাথায় এক চিন্তা, কেমন করে তিন ভাই বাপ-মা এক ছাউনির নিচে দুটো খেয়ে পরে থাকা যায়। বাপ অক্ষম, তাই কোম্‌তাও ভাবে নিজের ভাল মন্দ লাগা-না-বিসর্জন দিয়ে সংসারে বাঁধ আনি।

কোম্‌তার স্বভাবে আরেকটা দিক আছে। ও জানে বিরসা ওর চেয়ে অন্যরকম। ভাইয়ের স্বাতন্ত্র্যকে ও শ্রদ্ধা করে। তাই ও বিরসাকে বলল, 'তুই কি করবি?'

'তুই কি বলিস্?'

'আমার কথা ছাড়্।'

'আমার ত ইচ্ছা লিখাইপড়াই করি।'

'কোম্‌তা বয়স্ক হয়ে গেছে দারিদ্র্যের জাঁতাকলে। একটু ভেবে বলল, 'খারাপ নয় রে বিরসা।'

'কি?'

'এই লিখাইপড়াই।'

কোম্‌তা একটু অসহায় ও করুণ হাসি হাসল। বলল, 'আমাকে দিয়া ত হল না।'

'তোরে দিয়া চেষ্টা করল কে? চেষ্টা করলে পারতিস্ নাই, তবে বলতিস্ 'হল না'—এখন বলিস্ কেন?'

'কে চেষ্টা করে বিরসা? আবা আর মা কষ্ট করাছে খুব। খরা আকালেও মোদের বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রাণে বাঁচায়ে রাখতে দুজনে মরাছে। পড়াত কেমন করে?'

'জানি।'

'তোর হবে। কেন জানিস্? তোর দিমাক বেশি। তা বাদে, সংসারের ভার আমি নিতেছি। তোর উপর ভার নাই, তুই পড়তে পারিস্।'

'তুই বলিস্, আমি পড়ব?'

'হ্যাঁ রে। পড়লে প্রচারক হবি। একটা ছেলা মিশনে থাকলে আবার, আমার বল-ভরসা বেড়ে যায়।'

'তাহলে কোথা যাব?'

'কেন? লুকাস প্রচারক খাটাংগা গিয়েছিল না? সে হেথা আছে। তোরে নিয়া যাবে বুরজুতে, জার্মান মিশনে।'

বিরসা বুঝল, ভাগ্য ওকে বাইরে টানছে। মুণ্ডারী ধারার সংকীর্ণ জগতের বাইরে।

লুকাস প্রচারক ওকে নিয়ে গেল বুরজুর জার্মান মিশনে। রেভারেণ্ড পুট্‌স্‌কিং বললে, 'ভর্তি করে নেব। তবে এক কথা। লোয়ার প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়ে বেরোতে হবে। মুণ্ডা ছেলেদের বুদ্ধিও থাকে, পড়ার ইচ্ছেও থাকে। তবে বাড়ির চাপে তাদের লেখাপড়া হয় না। তারা পড়া ছেড়ে চলে যায়।'

'বিরসা বলল, 'আমি যাব না।'

বুরজুর জার্মান মিশন নিরালা, জনবসতি থেকে অনেক দূরে। সেখানে বিরসার নতুন জীবন শুরু হল। মিশনের পরিচ্ছন্ন, নিয়মবাঁধা সুন্দর জীবন বিরসার জানা ও চেনা জীবন থেকে একেবারে অন্যরকম। সে-জীবনে ডুবে গেল বিরসা।

লেখাপড়ার জগৎ একটা অন্যজগৎ। একেকটি অক্ষর, একেকটি শব্দ পড়তে পারা, আশ্চর্য জয়ের বোধ— উল্লাস রক্তে রক্তে—তীরে লক্ষ্য বিঁধবার উল্লাস। বোকা শেয়াল আর টক আঙুর ফলের গল্প যেদিন পড়তে পারল ও, বুঝতে পারল ইংরাজী পড়ে, সেদিন বিরসা কেঁদে ফেলল। পেরেছে ও, পেরেছে পড়তে, বুঝতে পেরেছে। এ এক বিরাট জয়; বিরসার ভাগ্য ওকে অন্য জীবনে বেঁধে দিয়েছিল। সে অনুশাসন তুচ্ছ করে বিরসা অন্য জীবনে জন্ম নিয়েছে। প্রমাণ করেছে ও পুরুষ, নিয়তির নির্দেশকে অমোঘ এবং শেষ বলে মনে করে না।

'ওয়ান ডে এ ফক্‌স্'... বিরসা আবার পড়ল। ক্লাসে রেভারেণ্ড বললেন, 'তুমি পারবে।'

লোয়ার প্রাইমারী পরীক্ষা বিরসা দু-বছরে পাস করে ফেলল। রেভারেণ্ড বললেন,

'আমাদের এখানে আর পড়ার ব্যবস্থা নেই তুমি চাইবাসা যাও। পড়া ছেড় না তুমি। তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।' এগারো বছরে বিরসা একদিন চালকাড়ে ফিরে এল। সুগানাকে বলল, 'আবা! আমি চাইবাসা যাব। আরও পড়ব।'

—'চাইবাসা যাবি!'

সুগানা ওর মমতামাখা, শান্ত চোখ দুটি মেলে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মিশনের সাহেবরা ক্রিশ্চান ছেলেদের পড়াতে বলে। পড়তে গেলে, সে জয়পাল নাগের পাঠশালা, বরজর মিশন ইস্কুল, যেখানে হোক, সেখানে পড়তে গেলে তবে জানা যায় পৃথিবীটা অনেক বড়। সে-পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম। করমির সঙ্গে সুগানার যখন আরান্দি হয়, সে-বিয়ের উৎসবে সুগানার মা রঙ গুলে আলপনা এঁকেছিল।

সুগানাদের আরান্দিতে পৃথিবীর ছবি তেকোনা। কিন্তু এখন ছেলের চোখের দিকে চেয়ে সুগানা বুঝল আরেক রকম পৃথিবী আছে, যে-পৃথিবীর সীমানা নেই, সেই বিশাল, অজানা পৃথিবীর ডাক ছেলে শুনেছে।

ভীরু হাসল সুগানা। ওর পৃথিবী চালকাড় থেকে বাম্‌বা, বাম্‌বা থেকে কুরুমবদা। বেনেদের হাতে বেহাত হয়ে যাওয়া খুটকাটি গ্রাম থেকে খুটকাটি গ্রাম।

ওর পৃথিবী সীমায়-সীমায় বাঁধা। সে পৃথিবীতে দুবেলা দু-থালা ঘাটো, বছরে চারখানা গড়া-কাপড়, শীতে তুষের বস্তার ওম, মহাজনের হাতে রেহাই, আলো জ্বালাতে মহুয়া তেল, ঘাটো খেতে কালো নুন, বনের শেকড় ও মধু, বনের হরিণ-খরগোশ-পাখির মাংস, এইসব পেলেই রাজা হওয়া যায়।

সুগানা বলল, 'অনেক পড়লি বাপ আমার। এত পড়া চালকাড়ের কোনো ছেলে পড়ে নাই। এখন হাত-পা ধরলে মিশনের সাহেবরা তোকে বাগানের কাজ দিবে। সাহেবের মালী হলে দুবেলা ভাত খেতে পাবি। আরান্দিতে পূজায় যেমন ভাত খাস, তেমনি ভাত।'

—'আবা, আমি চাইবাসা যাব, পড়ব।'

—'আর পড়ে কি করবি বাপ? পড়লে পরে এ সংসারে তোর মন উঠবে না। মুণ্ডা ছেলেদের মনে হবে লেংটাপারা, অসভ্যটা। যত পড়বি বাপ, তত দুঃখ। আমার দুঃখ নাই, আমি উপাসে-উপাসে ভিখমাঙাটা হয়ে গিয়েছি। তুই শুধামুধা দুঃখ পাবি। অনেক পড়লেও কেউ বাবু বলবে না তোকে, কোনো গ্রামে মানকি করে দিবে না। শেষে খেতনের ছেলেদের মতো কয়লাখাদের কুলি হবি, আড়কাঠির সঙ্গে চা-বাগানে চলে যাবি। ঘরে থাক তুই। এবার ধারকর্জ করে আরেকটা গাই কিনব, চরাবি।'

বিরসা শান্ত চোখে বাবার দিকে চাইল, 'আবা! পড়লে পরে আমি সাহেবদের সমান হব, সাহেব বলাছে।'

সুগানা নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 'তবে হাট হতে সাজিমাটি আনি। কাপড় কেচে নে। সুঁই মেঙে আন খেতনের ঘর হতে। মা কাপড় সিঁয়ায়ে দিক।'

—'আরও তিনটা ছেলে যাবে। লান্দিরুলির অভিরাম, কুন্‌দারির ইশাক আর বাম্‌বা।'

দূরত্ব ব্যাপারটা নির্ভর করে মনের ওপর। কোনো কোনো সময়ে স্বল্প দূরত্ব আসলে

ভীষণ দূর হতে পারে। দীর্ঘ দূরত্ব কম দূর হতে পারে।

চালকাড় থেকে চাইবাসা নিশ্চয় দূর। ১৮৮৬ সালে চারটি ছেলে চাইবাসা গিয়েছিল সুগানা মুণ্ডার সঙ্গে। লান্দিকুলির য়োহানার ছেলে অভিরাম, মাশিদাসের ছেলে বাম্‌বা, কুন্দারির প্রচারক দাউদের ছেলে ইশাক, এরা শুধু পথের দূরত্বটুকু হেঁটেছিল।

বিরসা জানত না, ও হেঁটেছিল এক জন্ম, এক জীবন থেকে আরেক জীবনের দিকে।

ওর মুখের আড়ে আড়ে তাকাচ্ছিল সুগানা। খুব অপরিচিত লাগছিল ছেলেকে। তার ছেলে লোয়ার প্রাইমারী পাস করল বুরজু মিশন থেকে। এই তো অনেক পড়া হয়ে গেল। আর কেন পড়তে চায় ও, কেন চেনাজানা জগৎ ছেড়ে বাইরে বেরোতে চায়?

সুগানা বোঝে জমিজমা, চাষবাস, থিতু হয়ে থাকা। সুগানার ছোট ভাই পাসানা ত বাম্‌বাতেই থেকে গেল। বিরসা তখন ছোট, কনুটা হয়নি। পাসানার ছেলেটাকে চিতাবাঘে নিয়ে গেল। বিরসা তখন ছোট। এখন মনে হয় বিরসা যেন কোনোদিন ছোট ছিল না। চিরকাল ওইরকম বিজ্ঞ বিজ্ঞ, প্রবীণ প্রবীণ। যেন কোনোদিন ন্যাংটা শিশু, উঠানে হামা টানেনি। এক বছরেরটি, 'আবা!' বলে সুগানার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েনি।

কোম্‌তা সুগানার মতো, ঘরসংসার বোঝে। বিরসা সংসারের কাজ যত পারে, কোমতা তা পারে না। কিন্তু বিরসার মধ্যে কোনো আসক্তি নেই।

সুগানার মতো বলল, 'অ বিরসা, আবা মোর! চাইবাসা যাইস না বাপ! ঘরে ফিরে যাই চল! করম পরবে এবার নতুন ধুতি কিনে দিব, কুসুম দিয়ে রাঙায়ে দিব। চুলে গুঞ্জাফলের মালা পরে নাচবি তুই, আবা মোর! চালকাড়ে ফিরা চল্‌।'

বিরসা বলল, 'ওই, ওই যে! মিশনের বাড়ি দেখা যায়, দেখ আবা।'

সুগানা আস্তে বলল, 'দেখেছি জাদু!' ওর গলা অবোধ্য আবেগে বন্ধ হয়ে আসছিল।

বিরসা বলল, 'কত বড় বাড়িটা! ব্বাবা রে! কত ইট পুড়ায়েছে বল দেখি? তবে না অমন খিলান উঠায়েছে।'

সুগানা বলল, 'অনে—ক ইট।'

—'এই হেথা পড়ব।'

—'হ্যাঁ জাদু!'

—'দাদাটা—!'

—'কি বলিস?'

—'চিরকাল সংসার লয়ে থাকল। না শিখল লেখাপড়া, না জানল কিছু!'

—'সকলের কি সব হয় রে!'

—'দাদা———!'

—'নে বিরসা, এসে গেলাম।'

৬

চালকাড় থেকে চাইবাসা হেঁটে-হেঁটে ওরা যখন পৌঁছল, তখন সন্ধে। কাপড়ের খোঁট গায়ে দিয়ে, পায়ের ব্যথায় বিরসা বসে পড়ল মাটিতে। রেভারেণ্ড সাহেব বলল,

'ভর্তি হবার টাইম চলে গেছে। তোমরা ফিরে যাও।'

—'দক্ষিণ তামার, সব জায়গা হতে ছেলেরা তো এখানেই আসে, আমরাও এসেছি।'

—'জায়গা নেই।'

—'জায়গা নেই?' অভিরাম, ইশাক, বিরসার বাবা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। জায়গা নেই কি! এত বড় পাকা দালান, এত ঘর, জায়গা নেই?'

বিরসা বলল, 'আমি ফিরে যাব না। আমার পায়ে পাথর বেজে ঘা হয়েছে। আমি হাঁটতে পারব না।'

—'ঘা সারবে, ওষুধ দিচ্ছি।'

—'না আমাকে বুরুজু হতে সাহেব চিঠি করে দিয়াছে।'

—'সেখানে পড়ো গিয়ে।'

—'সেখানে পড়া শেষ করে দিয়াছি। পাস করে নিয়াছি।'

—'আচ্ছা, কাল এসো, ভর্তি করে নেব।'

ওরা মিশনের সামনে পাকুড়গাছের ছায়ায় শুয়ে রইল রাতে। সকালে সাহেব বিরসাকে ভর্তি করে নিল। বাম্‌বা, অভিরাম আর ইশাককে ফিরিয়ে দিল।

মিশনে বিরসাকে ওরা সাবান দিল দু-খানা, জামা দুটো, প্যান্ট দুটো, একটা গামছা। একটা ছেলেকে বলল, 'ওকে দেখিয়ে দাও কেমন করে সাবান মেখে স্নান করতে হয়।'

ছেলেটার নাম অমূল্য। একহারা, শান্ত চেহারা। বিরসার চেয়ে ও বড় হবে।

ইদারার পাড়ে গিয়ে ও বিরসাকে স্নান করতে শেখাল সাবান মেখে। একটা দড়ি দিয়ে বলল, প্যান্টের কোমরে বেঁধে নাও। শার্টটা গুঁজে নাও এমনি করে।'

—'তোর নাম কি?'

—'অমূল্য।'

—'তুই কি বাবু?'

—'হ্যাঁ। আমি বাঙালী।'

—'তবে মুণ্ডারী বলছিস্?'

—'আমি অরফানেজের ছেলে। মুণ্ডারী জানি।'

—'তুই আমার সঙ্গে থাকবি?'

—'থাকব। শোনো, কাউকে 'তুই' বোলো না। তুমি বলবে। তাহলে দেখবে সাহেবরা খুব অবাক হবে। ওরা প্রথমেই মুণ্ডা ছেলেদের বলে 'তুই' বলতে হয় না।'

বিরসা একটু ভেবে বলল, 'তুমি কি বড় হলে দিকু হয়ে যাবে? বাবুরা তো দিকু হয়ে যায়।'

—'অন্য বাবুরা হয়তো দিকু হয়। আমি হব না।'

—'কি হবে?'

—'ডাক্তার হব। চাকরি করব।'

—'হোঃ!'

—'কেন?'

—'চাকরি করলে দিকু হয়।'

—'তুমি কি হবে?'

—'লেখাপড়া শিখব। অনে—ক লেখাপড়া। তা বাদে কাছারি করে বাবার খুটকাট্টি গ্রামের জমি ফিরাব।'

—'তারপর?'

—'প্রচারক হব। সবকে, যিশুর কথা বলব।'

—'তারপর?'

—'তখন দেখা যাবে।'

খুব ভাল হয়ে রইল বিরসা। যত গান ও মিশনে শিখল, সব গানের সুরে বাঁশি বাজাতে পারে ও। অমূল্য ওকে শেখায় ম্যাপ আঁকতে, অঙ্ক কষতে, বই পড়তে। ইস্কুলের পড়া হয়ে গেলে অমূল্য ওকে শেখায়।

বিরসা ওকে দেশের, গ্রামের, বনের গল্প বলে।

একদিন ওরা সাহেবকে বলে কয়ে শহরে বেড়াতে গেল। অমূল্য বৃত্তি পায়, চার আনা ওর কাছে ছিল। ওরা আখ কিনল, তিলুয়া কিনল গরম-গরম।

বিরসা বলল, 'দোকানে কত নুন দেখেছ?'

—'নুন তো দোকানেই থাকে।'

—'মাটির তেলই বা কত।'

—'দোকানে তেল থাকবে না?'

—'বড় হলে আমি মাকে বোরা-বোরা নুন কিনে দেব। ওই তেল নিয়ে যাব গ্রামে। মা বাতি জ্বালাবে।'

—'বোরা-বোরা নুন?'— অমূল্য অবাক হয়ে গেল।

—'হ্যাঁ। নুন দিলে ঘাটোর স্বাদ হয় কত? মা সবটুকু নুন আমাদের দেয়। নিজে আলুনী ঘাটো খায়! তাতেই তো মার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে।'

'বিরসা, ওই বুড়োটা তোমায় ডাকছে।'

পেছনে ফিরে বিরসা থেমে গেল। ধানী মুণ্ডাটা! সঙ্গে একটা বুড়ী।

—'তুই এখানেও এসেছিস্?'

—'আসব না?' চাইবাসা কি তোর কিনা?'

পুরোনো কথা মনে পড়তেই বিরসা হাসল। হেসেই বলল, 'হ্যাঁ। আমার কিনাই তো?'

—'দেখা যাবে।'

—'কি দেখবি?'

—'তোকে দেখব রে! ধানীর সঙ্গের বুড়ীটা এগিয়ে এসেছিল। বলেছিল, 'তোর কপালটা যেন কেমন, হাত-পা কেমন, তুই কে রে?'

—'আমি বিরসা।'

—'তবে যা না, চলে যা।'

—'কোথা যাব?'

—'তোকে খুঁজছে যে।'

—'কে খুঁজছে?'

—'আমার ভাই এই ধানীটা, সর্দাররা।'

—'সর্দাররা?'

—'মুল্‌কুই লড়াই জানিস্ না? সর্দারদের কথা জানিস্ না, তুই কেমন মুণ্ডা রে!'

বিরসা ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তাতে সুগানা মুণ্ডার ষোলো বছরের ছেলেকে খুঁজছে? কারা? কেন?

আশ্চর্য, মিশনেই সব কথা ক্রমে শোনা যেতে লাগল।

মিশনে আছেন ডাক্তার এ. নট্রট। একদিন তাঁর কাছেই চলে এল জার্মান লুথেরান চার্চে যারা ক্রিশ্চান হয়েছিল, সেই মুণ্ডারা।

—'আর্জি আছে।'

—'কি আর্জি?'

—'ছোটনাগপুরের টেনিওর আইনে বলছে যার জমি সে রাখতে পারবে। তুমি সাহেব। আমাদের খুটকাটি গ্রামগুলা ফিরিয়ে দাও।'

—'খুটকাটি গ্রাম বলে আছে নাকি কিছু?'

—'নাই।'

—'তবে? যা নাই তা কি ফেরত হয়?'

—'নাই কেন? দিকুরা নিয়েছে বলে।'

—'আমি কি করব?'

—'তুমি সাহেব। দেশের সরকারও সায়েব। সায়েব-সরকারকে বলে দাও। ব্যবস্থা করো।'

—'মিশনের সাহেব আমি, সরকার আমার কথা শুনবে না।'

—'তবে মরগা। তোমার মিশনে রইব না হে আমরা। যাব তোরপা মিশনে। ক্যাথলিক মিশন অনেক ভাল। মুণ্ডাদের দুঃখ তোরপা মিশনের লীয়েভেন্‌স্ সায়েব বুঝে।'

দলে-দলে ওরা জার্মান মিশন ছেড়ে চলে গেল তোরপায়। লীয়েভেন্‌স্ সাহেবের কাছে ক্যাথলিক হল। বিরসা শুনল লীয়েভেন্‌স্ সাহেব বলে দিয়েছেন, 'যারা অত্যাচারী, তাদের সঙ্গে লড় গিয়ে। লড়লে পরে ওরা ঠাণ্ডা হবে।'

শুনল, সরকার সৈন্য পাঠিয়ে সর্দারদের ধরেছে। বদলি করে দিয়েছে লীয়েভেন্‌স্‌কে। সর্দাররা ধরা পড়তে লাগল। কেস উঠল চল্লিশজনের নামে। কিন্তু আদালতে কাঠগড়ায় পৌঁছবার আগে রাঁচি জেলেই মরে গেল আটজন।

শুনল, সর্দাররা যে উকিলদের ঠিক করেছিল, তারা কিছুই করেনি। মুণ্ডাদের হয়ে লড়ছে শুধু ব্যারিস্টার জেকব। কলকাতা থেকে এসে কেস লড়েছে।

বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি গেল বিরসা। রোকোম্‌বা থেকে ধানী মুণ্ডা ওর সঙ্গ নিল।

ধানীর বয়স এখন অনেক।

ধানী সক্ষোভে বলল, 'নশো-ষাটটা চাঁদ পার করে দিলাম, একটা ভগবান এল না রে!'

—'ভগবান তো একটাই। সাহেবরা বলে।'

—'ওদের কথা রেখে দে।'

—'কোন্ ভগবান?'

—'যে ভগবানটা মুণ্ডা হয়ে আসবে, মুল্‌কি লড়াইয়ের ধিমাধিমা আগুনে জ্বালিয়ে দিবে সব।'

—'তারপর?'

'সাহেব-দিকু সবাইকে তাড়াবে। খুটকাটি গ্রামকে গ্রাম বসত করায়ে দিবে মুণ্ডাদের?'

—'আমাকে বলিস্ কেন?'

—'তুই পারতিস্ বিরসা। ছোটনাগপুর তোর আদিপুরুষের তৈরি। তুই পারতিস্ ভগবান্ হতে।'

—'ঘরে যা ধানী।'

—'কেন?'

—'নয়, বনে যা, তামারে চলে যা। শুনে এলাম ঘোড়া চেপে পুলিশ আসবে এ তল্লাটে তোদের খোঁজে।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ। আঁধারে আঁধারে চলে আসবে।'

—'এখন হতে সর্দাররা সায়েবদের সঙ্গে লড়বে, জমিদার, মহাজনের সঙ্গেও লড়বে।'

—'ধিমাধিমা লড়বে?'

—'দেখবি তখন। পুরোনো সর্দারদের দিয়ে কাজ হবে না।'

—'তবে?'

—'মাইষ চাই।'

বিরসা ধীরে বলল, 'বনে চলে যা। তোদের ধরালে এখন পাঁচ পাঁচ টাকা বকশিশ।'

—'ও মিশন ছেড়ে দে তুই। সাহেব বলে কি মুণ্ডারা জংলী, লেংটা থাকে। সকল মুণ্ডাই চোর আর ডাকাত। ও মিশন ছেড়ে দে।'

—'চলে যা, ধানী!'

ছুটির পর মিশনে ফিরে এল বিরসা। মনে বড় অস্থিরতা ওর। মুণ্ডাদের মধ্যে যারা ক্রিশ্চান হয়েছিল, সেই জার্মান লুথেরান চার্চের ক্রিশ্চানরা, রোমান ক্যাথলিক চার্চের ক্রিশ্চানরা আবার সর্দারদের মুল্‌কি লড়াইয়ে শামিল হয়েছে। বিরসা শুনে এসেছে, তারা বলছে, মিশনের সাহেব আর সাহেব সরকার সব এক। সাহেবরা হতে মুণ্ডাদের কোনো মঙ্গল নাই।' তাদের কথা মুণ্ডাদের মুখে মুখে ফিরছে।

মিশনে বিরসার জন্যে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করছিল অন্য মুণ্ডা ছেলেরা। এলিয়াজের, গিডিয়ুন, য়োহানা, মাইকা, টেংগা, ভুটকা, সবাই ঘিরে ধরল ওকে।

—'বল্ বিরসা, কি শুনে এলি?'

—'সর্দারদের লড়াই শুরু হয়াছে।'

—'আমরা কি করব?'

—'সাহেব কি বলে? ফাদার নট্রট?'

—'ফাদার বলে, তোমাদের সঙ্গে কথা নাই। বিরসা আসলে পরে তারে বলব।'

—'তাই বলুক।'

—'তোমার আবা কি বলে?'

—'আবা দুই বায়ে-বাতাসে হিলে দুলে। একবার বলে, সর্দাররা যা বলে শুন্। মিশন ছেড়ে আয়। একবার বলে অমন কাজ করে না বাপ মোর। মিশন ধরে থাক্।'

—'ফাদার তোরে কি বলে শুন্।'

—'তুই যা বলবি, মোরা শুনব।'

—'তুই মোদের পহান্।'

বিরসা বলল, 'চুপ্ চুপ, পহান্ কি? মিশনে ওসব কথা বলতে নাই। খেদায়ে দিবে।'

মুণ্ডা ছেলেরা বলল, অমূল্যটার সঙ্গে মিশিস্ কেন তুই? ও বাবু, ও দিক্ হবে, ও মুণ্ডাদের দুশমন।

—'কে বলছে?'

—'এ আমাদের কথা। কোনো বাবু ছেলা কোনোদিন মুণ্ডা ছেলার বন্ধু হয় নাই, হতে পারে না।'

বিরসার চোখ লাল্‌চে হয়ে উঠল। ও বলল, 'পড়া শিখ, লিখা শিখ, মুণ্ডা মুণ্ডাই রয়ে যায়। অমূল্য আমার বন্ধু। আমি ওরে ফেলাব না। তাতে তোরা মোরে ছাড়লেও ছাড়তে পারিস্।'

মুণ্ডা ছেলেরা এ-ওর দিকে চাইল তারপর টেংগা বলল, 'শুধা-মুধা চোখ লাল করিস্ কেন? তুই মোদের সেরা। তুই যদি চাস্, ওরে বন্ধু রাখবি।'

ফাদার নট্রট বুঝতে পারছিলেন, মুণ্ডারী ছেলেদের মনে বাইরের বাতাস লেগেছে। বিরসাকে ডাকলেন উনি। বললেন, 'তুমি আমাদের বিশ্বাসী। বিশ্বাস কর, সর্দাররা যে কথা বলছে, তা শুনলে মুণ্ডা ছেলেদের ভাল হবে না। মিশন ছেড়ে গেলে লাভ আছে কিছু?'

—'জানি না, বুঝতে পারি না।'

—'দেখ, মিশনে থাকলে সবদিক ভাল হবে। আমার কথা শুনে চললে তোমাদের ওপর সরকার খুশি থাকবে। ভাল হবে খুব।'

—'জমি ফিরে পাব?'

—'নিশ্চয়।'

'সকল মুণ্ডা জমি পাবে?'

—'মিশনের মুণ্ডারা পাবে।'

—'ছেলেদের একথা বললে ভাল হয়।'

—'দেখ সর্দাররা কেস করতে গেল। কেস দাঁড়াল কি? আইনের কাছে তাদের কথা খাটল?'

বিরসা চুপ করে রইল। সাহেবকে সব কথা বলা চলে না। সাহেব বোঝে না।

অমূল্য বোঝে, অমূল্য বলল, ' এ জানা কথা বিরসা। মুণ্ডারা উকিল খাড়া করে। উকিল মুণ্ডাদের টাকা খায়। হাকিমকে বোঝায় উলটাপালটা।'

—'মুণ্ডাদের দেখলে সবাই দিকু হয়।'

—'তাই মনে হয়।'

—'সেইজন্যে বিশ্বাস আসে না। বুঝেছ?'

—'বুঝি, বিরসা।'

—'তুমি আজ ভাল আছ। যখন মিশন হতে বারাবে? যখন ডাক্তার হবে? তখন কি ভাল থাকবে? আমার সঙ্গে কথা বলতে লাজ লাগবে—'

—'কখনো না।'

—'কখনো না?'

—'কখনো নয়।'

—'দেখা যাবে।'

—'দেখো।'

—'দেখব ত।' বিরসার চোখ হেসে উঠল।

—'ফাদার বলল কিছু?'

—'বলছে ত অনেক কথা।'

—'কথা থেকে কাজ হবে কিছু?'

অমূল্য জানত না, বিরসাও সম্পূর্ণ জানত না, অনেক কিছু কাজ হবার নয়।

১৮৭৮ সালে মুণ্ডারা সরকারকে আর্জি লিখে জানিয়েছিল ছোটনাগপুর তাদের মালিকানা দেশ। সে-দেশে তাদের অধিকার কায়েম করা হোক।

মুণ্ডারা দেখতে পাচ্ছিল না। সব যেন ধুলোর আঁধিতে আচ্ছন্ন, সব যেন কুয়াশায় আবিল। তারা আছে, ছোটনাগপুরের মাটিতেই আছে, কিন্তু নেই, ছোটনাগপুরে নেই, কেননা সে-জমিতে তাদের দখল নেই। তাদের সঙ্গে তাদের মাতৃভূমির মাঝখানে শত শত প্রাচীর। মিশন আর মিশনের সাহেবরা একটা মস্ত প্রাচীর। তারা আছে বলে সিং-বোঙার সর্বশক্তিমানতার কাছে আত্মসমর্পণ করা যায় না। তাই সিং-বোঙাও মুণ্ডাদের তেমন করে আগলে রাখেন না। বুঝি সেই প্রাচীন দিনই ভাল ছিল। সিং-বোঙা ছাড়া মুণ্ডারা জানত না কিছু। তাই সেংগেলদার আগুন বৃষ্টির সময়ে সিং-বোঙা মুণ্ডাদের ভবিষ্যৎ বাপ-মাকে কাঁকড়ার গর্তে লুকিয়ে রেখে বাঁচিয়েছিলেন।

১৮৭৯ সালের আর্জিতে লাভ হয়নি কোনো। ১৮৮১-তে একদল সর্দার মুণ্ডার মিশন ভেঙে বেরিয়েছিল। তারা বলেছিল 'মোরা মিশনের চিল্‌রেন বটে। আমাদের

নেতা এক মুণ্ডা, জন দি ব্যাপটিস্ট ! ছোটনাগপুরের রাজাদের আদিম ঠাঁই দোয়েসা যেয়ে ভাগ বসাব।'

কিন্তু তাদের আস্ফালন টেকেনি। তারা ধরা পড়ে জেলে যায়। আবার তারা নট্রটের কাছে এসে জেদ ধরেছিল, ছোটনাগপুর ভমিস্বত্ব আইনের মতে সব জমি ওদের ফিরে দিতে হবে। তারপর ওরা চলে যাবে ফাদার লীয়েভেন্সের কাছে।

এই সব কিছুই ঘটে গেছে। মুণ্ডারা আর মিশনে বিশ্বাস রাখতে পারছে না। সর্দারদের আন্দোলনে শামিল হচ্ছে সবাই। সবাই মিশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। প্রবীণ সর্দাররা বলছে; 'সিং-বোঙা মন্দ ছিল কি, তখন মুণ্ডাদের জীবনে বাতি জ্বলত। যেদিন হতে দিকু এল, সেদিন হতে জীবনে অন্ধকার। আর মিশনে এসে বা কি লাভ হল? জীবনে আন্ধার বেড়ে গেল বই ত নয়?'

চাইবাসা মিশনের সুন্দর শান্ত পরিবেশে সর্দারদের হাজারটা কথাবার্তার আগুন থেকে আঁচ আসছিল। মিশনের পরে মুণ্ডাদের বিশ্বাসের অঙ্কুরগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল সে-আঁচে।

ফাদার নট্রট ভয় পাচ্ছিলেন। ওদিকে তো চাকা গড়াতে শুরু করেছে, আইনের চাকা। লীয়েভেন্সের কাছে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে চল্লিশজন ধরা পড়ে। বিচারাধীন অবস্থায় মারা যায় আট নয় জন।

মুণ্ডারা এখন আর মিশনের ওপর ভরসা রাখে না। ওদের সব ভরসা কলকাতার ব্যারিস্টার জেকবের পরে। জেকব ইংরেজদের কলঙ্ক। সরকার আর মিশনারীরা মুণ্ডাদের থামিয়ে রাখতে চান। জেকব তাদের শেখান অধিকারের জন্যে আইনের সাহায্যে লড়াই করতে।

ফাদার নট্রট ভয় পাচ্ছিলেন।

তিনি সব ছেলেদের ডেকে ভরসা দিলেন, 'তোমরা কিংডাম অব হেভ্নে বিশ্বাস হারিও না। মিশনের ওপর ভরসা রাখো। সব জমি তোমরা ফিরে পাবে।'

অমূল্য বিরসাকে বলল, 'ফাদার নিশ্চয় বেজায় ঘাবড়ে গেছে। নইলে এমন সব কথা ডেকে হেঁকে বলে?'

কিন্তু সময় বিরসাকে অন্য জীবনে টানছিল। ১৮৮৭-৮৮ সালের মধ্যে সর্দারদের সঙ্গে মিশনের কাটাকাটি হয়ে গেল।

তারপর একদিন ফাদার নট্রট বললেন, 'সর্দাররা জোচ্চোর, তারা ঠগ্।'

বিরসা মনে প্রচণ্ড ঘা খেল। সে তো বিশ্বাস করতে চেয়েছে কিংডাম অফ্ হেভ্নে? সে তো বিশ্বাস করতে চেয়েছে যে ফাদার নট্রটের জামা যেমন শুভ্র, অন্তর তেমনি শুভ্র? সে তো বিশ্বাস করতে চেয়েছে প্রকৃত ক্রিশ্চান কারোর মধ্যে মন্দ দেখে না? সে তো ভালবেসেছে এই সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর প্রার্থনা সভা, গির্জার গান? সে তো কৃতজ্ঞ হয়েছে ফাদারদের কাছে? তাঁরা ওকে পড়াতে শিখিয়েছেন, আলোকিত জ্যোতির্ময় জগতের দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু সর্দাররা মুণ্ডা। তারা মুণ্ডাদের ভাল চেয়েছে। নইলে কয়েদ হয় কেউ? জেলে

গিয়ে অমন করে মরে? সর্দারদের জোচ্চোর আর ঠগ বললে বিরসার ভেতরের মুণ্ডারী রক্তে আগুন লেগে যায়। মুণ্ডার শরীরের এক ফোঁটা রক্ত মানে সমগ্র কৃষ্ণভারত। সে-ভারতে সেংগেল্‌দার আগুন অতি সহজে জ্বলতে পারে, অতি সহজে। কেননা সে-ভারতে দাহ্যভূমি শুকনো, দাবানলের প্রত্যাশী।

বিরসা মুণ্ডা ছেলেদের বলল, 'ফাদাররা বদ্‌মাশ। তারা সর্দারদের এখন জোচ্চোর বলছে। সর্দাররা মিশন ছেড়ে গেছে বলে সাহেবদের রাগ হয়েছে।'

ফাদার নট্রট বিরসাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'বিরসা দাউদ! তুমি মিশনের নামে নিন্দা করছ কেন?'

'আপনারা সর্দারদের জোচ্চোর বলছেন কেন? কেন তাদের নামে গাল দিচ্ছেন?'

—তারা জোচ্চোর।'

—'না!'

বিরসা হঠাৎ ভীষণ ক্রোধে বলল। নট্রট অবাক হয়ে গেলেন, বিরসা এত রাগতে পারে তা তিনি জানতেন না।

—'বিরসা! তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ। গলা নামিয়ে কথা বলো।'

—'না!'

বিরসা চেঁচিয়ে উঠল। বলল, 'কি জোচ্চোরি করেছে সর্দাররা? তারা মুণ্ডাদের হকের জন্যে লড়ছে, কয়েদ হয়াছে, জান দিয়াছে। জোচ্চোর তারা? না—না—না!'

ফাদার নট্রট রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'মুণ্ডা-মুণ্ডা একসমান। মিশনের কাছে আসে ভিখারীর মতো। ভিতর ভিতর সর্দারদের কথা মানে। সকল মুণ্ডা বেইমান।'

—'না! তোমার কথা ফিরিয়ে নাও! বেইমানী জানে না হে মুণ্ডা। জানলে পরে তারা মিশনকে মিশন উড়ায়ে দিত।'

—'তুমি চলে যাও! এ মিশনে তোমার আর জায়গা হবে না।'

—'যাব।'

বিরসার চোখ জ্বলতে লাগল। রাগে পাথর হয়ে বিরসা বলল, 'সাহেব-সাহেব এক টোপি। সরকার যা, মিশন তা, সব একসমান।

বিরসা চলে যাবে মিশন থেকে, অমূল্য ছুটে এল। বলল, 'যেও না বিরসা, একবার মাপ চাও সাহেবের কাছে। মাপ চেয়ে নাও।'

—'না।'

—'তোমার লেখাপড়া? তোমার ভবিষ্যৎ?'

—'মুণ্ডার লেখাপড়া? মুণ্ডার ভবিষ্যৎ? মুণ্ডা কি বাবু? মুণ্ডা কি দিকু? ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পড়ে পড়ে লাথ খাবে?'

—'বিরসা আমার কথা শোন।'

—'না।'

—অমূল্য ওর হাত ধরল, হেসে বলল, 'হাত ধরলে হাত ছাড়াতে পার তুমি? আমি তোমার বন্ধু। তুমি মাপ চেয়ে নাও বিরসা। মিশনে থেকে লেখাপড়ায় অনেক বড় হও।

মুণ্ডাদের অনেক বেশি উপকার তাতে করতে পারবে।'

—'হাত ছাড়ো।'

—'যদি না ছাড়ি?'

বিরসা জোর ঝাপটা মারল। অমূল্য হাত ছাড়ল না। বিরসা আরও জোরে ঝাপটা মারল। অমূল্য ছেড়ে দিল হাত। বিরসার হাতটা বাজল দরজার কড়ায়। হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগল।

বিরসা চাইবাসা মিশন ছেড়ে চলে গেল চালকাড়। সুগানা ওর কাছে সব শুনে অবাক হয়ে গেল।

সুগানা বলল, 'গাল দিলি কেন?'

—'সর্দারদের চোটা বলল কেন?'

—'তুই তো সর্দার নোস্।'

—'সর্দাররা মুণ্ডা, আমিও মুণ্ডা।'

—'তা বাদে?'

—'আবা। সায়েব-সায়েব এক টোপি হ্যায়, এ-কথা বলে চলে এসেছি। সব সায়েব এক কাট্টা, তা জানতাম না।'

—'এখন?'

—'মিশন ছেড়ে দি আমরা। সর্দাররা দুটা মিশন ছেড়ে সব যে-যার মতো নিজের ধর্মে ফিরে গেছে।'

—'নয় ছেড়ে দিলাম। তবে কি ফের সিং-বোঙাকে পূজব? না কি সদান (হিন্দু) মতো হয়ে যাব? না কি মহাপ্রভুর পথ নিব, না সন্ন্যাসীর পথ নিব?'

—'সে দেখা যাবে। চল, মিশন তো ছাড়ি।'

—'হ্যাঁ তোর হাত কাটল কিসে?'

—'একটা বাবু ছেলে হাত ধরেছিল। নাম তার অ-মূ-ল্য। ওর হাত ছাড়াতে গিয়ে কেটে গেল। ছেলেটা কাঁদছিল আমার লগে। বলে এলাম, যদি দেখি দিকু হোস্ নাই, তবে কথা বলব। নয়তো বলব না।'

—'চল, কালই নামকাটা করে আসি।'

৭

কিন্তু ধানী ওর সঙ্গ ছাড়ল না। একদিন চলে এল। বলল —'সর্দারদের মুল্‌কি লড়াই থেমে যায় যে বিরসা। মিশন ছাড়লি, তুই হোথা যা। নাকি তুই মুণ্ডাটা নোস্?'

—'ধানী তুই স্বপ্ন দেখ্‌গা।'

—'কেন?'

—'তুই 'যা' বললে আমি যাব?'

—'তবে?'

—'আমি বুঝি না রে! মন বড় অস্থির অস্থির করে।'

—'বনে ঘুরিস কেন পাগলটার মতো?'

—'কে বলে?'

—'আমি জানি।'

—'জানি না। কত কথা মনে উঠে। কোথা হতে এলাম আমি? কি জন্যে এলাম? কি করে এলাম?'

—'তুই সেংগেল-দা-র গল্প শুনিস্ নাই?'

—'শুনেছি।'

—'তবে তো জানিস্ সব। সিং-বোঙা একবার দেখল ধরতি ভরা শুধু মুণ্ডা আর মুণ্ডা। এত মুণ্ডা যে গায়ে গায়ে ঠেলা লেগে সব সাগরে পড়ে কি নদীতে। খেতে যত ধান উঠে, পেটে খেতে কুলায় না। বনে যত জানোয়ার থাকে, মাংস খেতে কুলায় না। সব অকুলান হয়ে গেল। রেগে সিং-বোঙা সেংগেল-দা নামাল। সে কি আগুনের বৃষ্টি রে বিরসা। এক মুণ্ডা পুরুষ এক মুণ্ডা মেয়ে যেয়ে কাঁকড়ার গর্তে সাঁজাল। পরে তারা বেরিয়ে এল। তারা হতে আমরা হলাম।

—'এ গল্পে আমার মন উঠে না।'

—'তবে কি করবি?'

—'জানতে যাব। দেখি কেউ জানে নাকি।'

—'কোথা?'

—'বন্দ্‌গাঁও-এর জমিদার জগমোহন সিং। তার মুন্‌শি আনন্দ পাঁড়ে নাকি সব জানে। সে শিখাবে বল্‌ছে।'

—'কি শিখাবে?'

—'ঠাকুর ভগবানের কথা।'

—'বললাম, তুই আয়, ভগবান হ। মুণ্ডাদের ঘরে জন্মেছিস্, মুণ্ডাদের দেখ্। তবে যা, দিকুদের মত জেনে নিয়ে পূজা করগা।'

—'করলে করব। তুই যা ধানী, আমাকে জ্বালাস্ না।'

—'যাব না তো কি?'

রেগে ধানী চলে গেল। বিরসা চলে গেল বন্দ্‌গাঁও আনন্দ পাঁড়ের কাছে। পইতে নিল, চন্দন মাখল, তুলসী পূজা করল। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ সব শুনল। পড়ল কিছু কিছু।

কিন্তু মন যেন ভরে না। বড় অস্থির বড় অশান্ত বিরসা। চেহারা হয়ে উঠল খুব সুন্দর। মুণ্ডাদের ঘরে অত লম্বা, সুগঠিত শরীর, অমন নাক, অমন চোখের চাহনি দেখা যায় না।

আনন্দ, ওর ভাই সুখনাথ পাঁড়ে বলল, 'কোথা-কোথা চলে যাস্ তুই বিরসা?'

—'ঘুরে বেড়াই।'

—'কেন?'

—'বড় অস্থির-অস্থির করে রক্তটা।'

—'করবে, বয়সের ছেলা।'

—'ছোঃ!'

—'কেন?'

—'বুঝ নাই কিছু।'

—'কি বুঝি নাই রে? তোর বাঁশি শুনে সবাই বুঝে।'

—'কিছু বুঝে না।'

—'শান্ত হ। জপ-পূজা কর। তুলসীমালা আঙ্গুলে ফিরা।'

—'তাতে তোমাদের শান্তি হয়, মুন্ডাদের হবে?'

—'সবার হবে।'

—'আমাদের আলাদা ভগবান যে। আমরা সিং-বোঙার প্রজা। হরম্‌বোরা আমাদের আদি-পুরুষ।'

—'ভগবান এক রে, কৃষ্ণ ভগবান।'

বড় অস্থির-অস্থির করে মন। তাইতো বিরসা সন্ধে হলে পুকুরের ধারে বসে বাঁশি বাজাত। তাই সেখানে ছুটে এসেছিল গুঞ্জা আর রাতা দুই মুণ্ডা মেয়ে। বলেছিল, 'তুই আমাদের নিয়ে চল্ বিরসা। গ্রামে নিয়ে চল্।'

—'কেন?'

—'তোরে আরান্দি করব।' গুঞ্জা বলত।

রাতা কিছুই বলত না। শুধু বলত, 'তোর বাঁশিতে কি আছে বিরসা? কেন আমার শরীর এমন করে?'

বিরসা বাঁশি থামাত। আস্তে বলত, তোরা ঘর যা। সাঁঝ হয়া গেছে। শীতের সাঁঝ। বুঝি হুড়ার বেরায় পথে।'

রাতা একদিন ওকে বলেছিল, 'আমার বাবা মান্‌কি বটে গ্রামে। বাবা বলেছে যে মোরে আরান্দি করবে, তারে গাই-গরু জমিজেরাত দিয়ে বসত করিয়ে দিবে।'

বিরসা বলেছিল, 'ঘর যা রাতা।'

—'তুই কি গান বাজাস্?'

—'গান জানি না, সুর জানি।'

গানটা দূরে-দূরে পাহাড়ে ও বনে সর্দারেরা গাইত। গানটার সুর বড় সুন্দর, কথা বিরসা জানত না।

সুনারা মুণ্ডা, কিশোর একটি ক্রীতদাস, ওকে গানটা শোনায়। সবাই ভয় করত বিরসাকে। কে এমন মুণ্ডা ছেলে? মিশনে সাহেবের মুখে মুখে ঝগড়া করে মিশন ছেড়ে দেয়? ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়ে গলায় সুতো নেয়? সবসময় অস্থির অশান্ত, চঞ্চল? কোনো কিছুতে সুখ নেই ওর?

কেউ কাছে যেত না। কিন্তু সুনারা একদিন ওকে শুনিয়ে ওর বাঁশির সুরের গানটা গেয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল।

"বোলোপে বোলোপে হেগা

মিসি হোন্ কো
হোইও ডুড়ুগর হিজু তানা
বোলোপে......."

ছুটে চলে গিয়ে পাথরের আড়াল থেকে সুনারা বলেছিল, 'গানটা আমি সবটা জানি।'

—'তবে সবটা গা।'

সুনারা সব গেয়েছিল। বিরসা ওকে কাছে ডেকেছিল। কাছে বসিয়ে গান শিখে নিয়েছিল।

—'এ-গান কিসের গান রে সুনারা?'

—'জানি না।'

—'তবে গাস্ কেন?'

—'এ গান যে গায়, যারা শুনে, সবাই ভাই হয়।'

বিরসা ওকে চলে যেতে বলেছিল।

কিন্তু সুগানা যেদিন ওর কাছে ভরমি, দাসো আর মাতারিকে পাঠাল, সেদিন আর বিরসা তাদের চলে যেতে বলতে পারেনি।

ভরমিরা এসেছিল সিগড়িরা গ্রাম থেকে। বলেছিল, 'বাইরে আয় বিরসা। মুণ্ডাদের জীবন চলে যায়, সব জেহেল করে দিল সরকার। তুলসী পূজে কি হবে, বল্?'

—'কি হয়েছে?'

—'জঙ্গল হতে উৎখাত করে দিল মোদের।'

—'কে?'

—'সরকার! তোর সাহেব-সরকার!'

—'আমার সাহেব-সরকার!'

হঠাৎ হাতের উলটো চেটো দিয়ে ভরমিকে মুখে মেরেছিল বিরসা। বলেছিল, 'আমার সাহেব-সরকার? আমার? আবার বল্।'

ভরমি মুখ ফেলেছিল। বলেছিল 'কি করিস্? হাত দিয়ে লোহা ডলিস্?'

—'বল্ কি বলবি।'

—'জংলা কানুন এখন চালু করেছে।'

—'কোথা?'

—'পালামৌ, মানভূম, সিংভূমে।'

—সিংভূমে কি করল? কানুন তো ১৮৭৮ সালের।'

—'কানুন ছিল, চালু করে নাই। এখন ঢোল দিয়া দিয়াছে সকল গ্রামে সকল খাস জমি জঙ্গলের আপিস নিয়ে নিল। জঙ্গলে আমরা লাখো লাখো চাঁদ ধরে গাইছাগল চরায়েছি, জঙ্গল হতে কাঠ আনাছি। হাঁ বিরসা! জঙ্গল তো নিয়াই নিয়াছে। এখন হতে কেউ গাইছাগল চরাতে পারবে না জঙ্গলে। জঙ্গল হতে কাঠ-পাতা মধু আনতে পারবে না। শিকার খেলতে পারবে না। জঙ্গলের ভিতর যত গ্রাম আছে সব উচ্ছেদ করে দিল।'

—'না!'

বিরসা চেঁচিয়ে উঠেছিল। ওর রক্তে বসে চুটুয়া আর নাগু চেঁচিয়ে উঠেছিল। অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ-ভারতের আদি অধিকার। যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে ঘুমোচ্ছিল, তখন থেকেই কৃষ্ণ-ভারতের কালো মানুষরা জঙ্গলকে মা বলে জানে।

বিরসা বলেছিল 'না'। ও বলে নি, ওর রক্ত ওকে দিয়ে কথাটা বলিয়েছিল। ও বলেনি, সমস্ত কৃষ্ণ-ভারত আর সকল কালো মানুষ ওকে দিয়ে কথাটা বলিয়েছিল।

আর ঘরে ফেরেনি বিরসা। সেখান থেকেই ওদের নিয়ে চলে গিয়েছিল চাইবাসা। আর্জি লিখে জঙ্গল আপিসে দিয়ে এসেছিল।

জঙ্গল আপিসের সামনে মুণ্ডাদের হাট বসে গিয়েছিল। সবাই এসেছিল আর্জি নিয়ে।

আর্জি দেখে আপিসের বাবুরা হোহো করে হেসেছিল। বলেছিল 'কি করবি?'

—'জঙ্গলে অধিকার দিতে হবে।'

—'কে দিবে?'

—'সরকার।'

—'বিলাত চলে যা সাগর সাঁতরে। সেথা মহারাণী বসে আছে। সে মুণ্ডাদের ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে।'

—'আর্জি ফাইল করো।'

—'ফাইল বললি যে! লেখাপড়া শিখেছিস্ বুঝি?'

—'তুই' 'তুই' বলছ কেন? মুণ্ডারা মানুষ নয়? সাহেব দেখলে আপনি বল, বেনে দেখলে, 'তুমি' বল, মুণ্ডা দেখলে 'তুই' বল?'

—'চুপ কর্।'

—'এই দিকু। আমার নাম বিরসা। আমি সাহেব ডরাই না। ঠিকভাবে কথা বল্।'

—'এই!'

—'নইলে কুচিলা বাণ ফুঁড়ে দিব।'

ফুঁসতে-ফুঁসতে বেরিয়ে এসেছিল বিরসা। ভরমিদের বলেছিল, 'আর্জি। আর্জিতে সরকার শুনে? দেখে এলাম রোগোতা, গুডরি, দুরকারপির, সবজায়গায় আপিসের বাবুরা আর্জি ফেলে রেখেছে।'

—'তবে কি হবে বিরসা?'

—'সরকার শহরে থাকে। সেথা বসে কানুন বানায়। যারা কানুন বানায় তারা মুণ্ডা-কোল-ওরাওঁদের কথা ভাবে না।'

—'তবে?'

—'তবে কি হবে নিজেরা ভাবগা। কেউ ভাববি না। সব সময়ে আরেক জন ভেবে দিবে। তোরা যেয়ে তার কাছে শামিল হবি, সে সরে গেলে জেহেলে পড়বি? এই যে নিজেদের কথা নিজেরা ভাবিস না, তাতেই তোরা মরিস আর মরিস মৌয়া আর হাঁড়িয়াতে। কি মদ খাওয়া শেখেছিস্! নিজেদের জীবনে আগুন লেগে যায়। জঙ্গলে যাবার হক চলে যায়। তোরা চেতে উঠিস্, জ্বলে উঠিস্, আবার একটু বাদে মদ খেয়ে

সব ভুলে যাস্!'

—'তুই কি করবি?'

—'দেখি কি করি।'

—'তোর বাপ-মা ভূখে মরে কিন্তু।'

—'মরবে তো! জঙ্গল হতেই তো বেঁচে ছিল।'

—'জঙ্গলে গাছের ছায়ে যে চিনাঘাস হত, তার দানা কত মোটা রে বিরসা, ঘাটো হত কত।'

—'জানি।'

ক্ষোভে, অস্থিরতায় বিরসা বন্দ্গাঁওয়ে ফিরে এল। কিন্তু আনন্দ পাঁড়ে বলল, 'তোর ঠাঁই নাই।'

—'কেন?'

—'সরকারের নামে আর্জি করিস্, সর্দারদের কথায় খেপিস্, তোরে রাখলে জমিদার রেগে যাবে।'

বিরসা চোখ কুঁচকে চেয়ে ছিল। যে কুঁচ থেকে কুচিলা হয়, তারই মতো লাল হয়ে উঠেছিল ওর চোখ। ও বলেছিল, 'যাব হে আমি! কিন্তু একটি কথা বল তুমি।'

—'কি?'

—'মুণ্ডা না হলে তাড়ায়ে দিতে পারতে?'

—'তার মানে?'

—'মানে হল, মুণ্ডাটা বোকাটা, জানোয়ারটা ছিল, তাই গাই চরিয়ে নিয়াছি। কাঠ ফাড়িয়ে নিয়াছি অনেক। আজ মুণ্ডাটা গোল করছে তাই দে তারে তাড়ায়ে, এইতো?'

—'যাঃ, তুই পাগল।'

—'তোমার ভগবান তোমায় এই শিখায়? এমন ভগবানে কাজ নাই আমার।'

—'সিং-বোঙা পূজ্গা যা!'

—'সিং-বোঙা পূজব না, তোমার ঠাকুরও পূজব না। তোমার নুন খেয়েছি তাই বেঁচে গেলে।'

—'নইলে?'

—'তোমারে আমি পাথর মেরে গুঁড়া করে দিতাম।'

৮

বিরসা চলে গিয়েছিল চালকাড়। ভীষণ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ওর মন, ওর বুদ্ধি। কিছু দেখতে পাচ্ছিল না ও। এ যেন সেই সিং-বোঙার অগ্নিবৃষ্টির পরেকার অন্ধকার অবস্থা।

চালকাড়ে তখন সুগানা আর কর্মি উপোসে মরছে। কর্মি কেঁদে বলেছিল, 'হা বিরসা! কোথা তুই বোরা ভরে নুন, টিন ভরে মাটির তেল আনবি। গাইবলদ-জমিজেরাত করবি! বাপরে দেখবি, মারে দেখবি! হা রে, তুই হতে ভিনগাঁয়ের মানুষ

মোর ঘরের আকাশে তিনটে তারা জ্বলতে নিবতে দেখেছিল। জঙ্গলের বুক থেকে কে ডেকে বলেছিল, এতদিনে 'ধরতি-আবা' জন্ম নিল। উ তোর কি চেহারা রে! ভিখমাঙাটারও অধম। তোর কথায় মিশন ছেড়ে এ কি হল বল্? সাহেবরাও তো ভিখ দেবে না?'

বিরসা কোনো কথা বলেনি। ভেতরটা জ্বলছিল-নিবছিল ওর। কেবলি মনে হচ্ছিল এবার ও হয় মরবে, নয় বাঁচবে।

কিন্তু বড় খিদে। জঙ্গলে ঢোকা যায় না। মান্‌কিরা এখন জঙ্গল আপিসে রিপোর্ট করে দেয়। রিপোর্ট দিলেই হাতে হাতে টাকা। রিপোর্ট দিলেই মুণ্ডাদের জরিমানা। আপিস থেকে ইলাকাদার হুকুম পাবে। ইলাকাদারের কাছ থেকে চৌকিদার হুকুম পাবে।

তারপর জরিমানা হাজত। তারপর পর পর তিনবার জংলা আইন অমান্য করলে ঘরের কোল ঘেঁষে জমিটুকুও হঠাৎ জঙ্গল মহল বলে নিয়ে নেবে জঙ্গল আপিস।

বিরসা বাপকে বলল, 'নদীতে মাছ মিলে না?'

—'কোথা মাছ। জঙ্গলে এখন পাহারাদার তাঁবু ফেলেছে। ওরা পাথর ফেলে জল আটকে মাছ তুলে নেয়।'

—'রাতে গেলে জঙ্গলে বনকচু মিলে না? মেটে আলু?'

'নাই রে।'

—'তেঁতুলপাতা সিজিয়ে খেয়ে দেখেছ?'

—'বমি হয়ে যায়।'

বিরসার মনে হল অদ্ভুত, অদেখা সব শক্তি ওকে হারিয়ে দিচ্ছে। প্রাচীন বিশ্বাসে ও ফিরে আসতে পারছে না মন থেকে। তাই বোঙারা অন্ধকারের শক্তির মতো ওকে হারিয়ে দিচ্ছে।

তাই হবে। এ নিশ্চয় বোঙাদের প্রতিশোধ। কেন বিরসার মন আশ্রয় পায় না আদি দেবতায়? কেন বিরসা একবার হবে ক্রিশ্চান একবার যাবে আনন্দ পাঁড়ের কাছে? কেন বিরসার মনে হবে ওর প্রাচীন ধর্ম আর ওকে ধারণ করতে পারছে না? তাই ক্রুদ্ধ বোঙারা এখন শোধ নিচ্ছে।

ও গ্রামের বাইরে চলে গিয়েছিল। যেখানে শ্মশান যেখানে চাল্‌কি মুণ্ডানীকে ওরা পুঁতে গেছে, সেখানে বসেছিল পাথরে। সন্তান হতে গিয়ে মরেছিল চাল্‌কি। চাল্‌কি আর ওর সন্তানের আত্মা 'রোয়া' পরলোকে কি বেচে খাবে ভেবে মুণ্ডারা চাল্‌কির গা থেকে রুপোর আংটি খুলে নেয়নি। চাল্‌কির বর আট আনা পয়সাও সঙ্গে গোর দিয়েছিল।

শ্মশানরক্ষক বোঙাকে তুচ্ছ করে বিরসা কবর খুঁড়ে চাল্‌কিকে টেনে বের করেছিল। টেনে বের করার সময়ে ও মনে মনে বলছিল, ভয় করি না। ভয় সত্যিই করেনি। চাল্‌কির মড়াটা অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে বিরসা আরেকটা কথা বুঝল? খিদে, পেটের খিদের শক্তি সবচেয়ে দুরারোগ্য। খিদে বোঙাদের শাসন তুচ্ছ করার সাহস যোগায় মনে। আংটি আর পয়সা নিয়ে রাতভিতে পালিয়ে গিয়েছিল বড়াবাঁকির বাজারের দিকে।

সেখানে শনিবারের হাটে ও রুপোর আংটি বেচে, সেই আট আনা পয়সার চাল কিনেছিল। চাল রেঁধে ভাত সুগানা বা কর্‌মি কখনো নিয়মিত খায় না।

সেখানেই ওকে দেখেছিল ওর দাদা কোম্‌তার জ্ঞাতি শালা। তখনি ও সে-কথা চালকাড়ে রাষ্ট্র করে দেয়।

কর্‌মি রাগে ও দুঃখে কেঁদে ফেটে পড়েছিল। চাল ফেলে দিয়েছিল পা দিয়ে। ছুটে গিয়ে বলেছিল, 'তোকে একঘরা করায়ে দেব রে বিরসা। তুই পিশাচ হয়ে গিয়াছিস্। আর মানুষ নাই।'

তখন ভীষণ গরম, জ্যৈষ্ঠ মাস। বিরসার মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল। মাকে শাপ দিয়েছিল ও। চেঁচিয়ে বলেছিল, 'চাল্‌কির রোয়া বলে কিছু নাই। রোয়া মানুষ নয়! রোয়ার খিদে নাই। মানুষের খিদে থাকে। রোয়া হতে তোর পেটে ভাত পড়লে সে অনেক ভাল। চাল ফেলে দিলি লাথ মেরে? চাল ফেলে দিলি লাথ মেরে মা? এ তুই কি করলি?' চেঁচিয়ে বুক চাপড়ে চলে গিয়েছিল বনে।

বনে গেলেই ও চিরকাল শান্তি পায়, এখন পাচ্ছিল না। 'সব আমার হে, আমাকে কোনো কানুন আটকাতে পারে না।' বলে-বলে ও জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল। কর্‌মির আর্তচিৎকারে 'তোরে জেহেল খাটাবে রে বিরসা।' ওর কানে পৌঁছয়নি।

ও শুধু বলছিল, 'ধানী বলাছে রে সব আমার। কারেও দিব না আমি। হা জঙ্গল! তুমি বল না কেনে, তোমার দয়া কেড়ে নিবার হক্ কারো নাই?' জঙ্গলের পেট ফুটো করে ও গহন হতে গহনে ঢুকছিল। জঙ্গল তো সকল মুণ্ডার মা! কিন্তু বিরসা বুঝতে পারছিল ওর অরণ্যজননী কাঁদছে। অরণ্য ধর্ষিতা, দিকুদের হাতে আইনের হাতে বন্দিনী। জননী অরণ্য বলেছিল, 'মোরে বাঁচা বিরসা। আমি শুদ্ধ শুচি নিষ্কলঙ্ক হব।'

মাটিতে মুখ ঘষছিল বিরসা, গাছের গায়ে গা ঘষছিল। শিশুর মতো দুঃসাহসে অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল অরণ্যকে, 'দিব, দিব তোমারে শুদ্ধ করে, হা তুমি মোর মা বট, সকল মুণ্ডার মা বট তুমি, তোমা হতে ঘরের চাল, ঘরের দেওয়াল, ক্ষুধায় কন্দ-ফল-মূল-খরাবরা শজারু-হরিণ পাখির মাংস মা গো!'

কথাগুলি বলেই ও সতর্ক ও ক্ষিপ্র পাখির মতো নিজের কাঁধে মাথা কাত করে রাখছিল, কেননা ওর রক্তে অরণ্য কথা বলছিল। অভিমানে অবুঝ, দরিদ্র, নিঃস্ব, শুষ্কস্তনা মুণ্ডা জননীর মত কাঁদছিল অরণ্য, বিরসা শুনছিল।

—'হা আমি অশুচ রে?'

—'শুচ করে দিব মা গো।'

—'হা দেখ্ দিকুতে সাহেবে মিলে মোরে বার বার অশুচ করে।'

—'শুচ করে দিব তোকে।'

—'আমার ছেলাদের ঘরছাড়া করে দিয়াছে।'

—'তাদেরকে ফিরায়ে আনব।'

—'মুন্ডা-কোল-ওরাওঁ-হো-সাঁওতাল সকলে আড়িয়াকাঠির ডাকে চলে যায়।'

—'যেতে দিব না।'

—'মোর কান্না কেও শুনে না।'

—'আমি শুনাছি।'

—'মোরে চেয়ে দেখে না কেও।'

—'কোথা তুমি মা গো?'

—'তোর বুকে, তোর রক্তে।'

—'মোর বুকে, মোর রক্তে?'

—'আর কোথা রব আবা মোর, বাপ মোর?'

—'কোথা?'

—'চেয়ে দেখ্।'

বিরসা রক্তের দিকে চেয়েছিল। আহা, তার শরীরটা ছোটনাগপুরের পৃথিবী—তার রক্ত নদীর ধারা—সেই নদীর তীরে মা, তার মা, তার অরণ্যকা মা—নগ্নদেহ যুবতী মুণ্ডারী মেয়ে যেন—কিন্তু এ-নগ্নতা দেখে লোভ জাগে না—লালসা জাগে না—বুকের নিচে দুঃখে আগুন ধরে যায়।

—'কে তোমারে লেংটা করেছে মা?

—'যারা অশুচ করাছে।'

—'আমি তোমারে রক্ত দিব।'

—'দে বাপ মোর।'

—'তোমার লাজ ঢেকে দিব।'

—'দে বাপ মোর। ওরাও মোরে লেংটা বেবস্ত করে আকাশের নিচে ছেড়ে দিয়াছে। তুই মোর লাজ ঢেকে দে।'

—'দিব গো দিব।'

—'বড় কষ্ট পাবি।'

—'কেনে?'

—'তোরে বড় কষ্ট দিবে।'

—'কেনে?'

—'তাহলে তোমারে যে ভগবান হতে হবে বাপ মোর।'

—'ভা—গ—বা—ন?'

—'হ্যাঁ বাপ, ধরতি-আবা হতে হবে। ধরতির বাপ না হলে ধরণীর লাজ ঢেকে দিতে পারে কেও?'

—'তোর আবা হব তবে।'

—'তোরে বাঁচতে দিবে না।'

—'ভগবান হলে তারে মারে গো মা! যিশুরে মেরেছিল মিশনে জেনাছি। কিষ্ণরে মেরেছিল পায়ে বাণ মেরে।'

—'কষ্ট পাবি, সুখ দিবি।'

—'সুখ দিব?'

—'তো হতে সকল মুন্ডা সুখ পাবে।'

বিরসা চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'দিব সকলের সুখ, হ্যাঁ আমি ভগবান হব, বিরসা ভগবান! ধরতি-আবা হয়া যাব তবে! হাঁ আমি সেই চুটু আর নাগুর রক্তের রক্ত বটি! আমা হতে মুণ্ডারা বাঁচবে, মোর বুকে চোট মেরে, হাঁ আমি রক্তে জানছি গো!'

ভীষণ শব্দে বাজ পড়েছিল, বিদ্যুৎ ঝলসে দিয়েছিল আকাশ। হাতি বৃংহন করেছিল কোথায়, বাঘ গর্জন করেছিল। বিরসা আকাশ পানে মুখ তুলে বৃষ্টির জলে মুখ প্লাবিত করতে করতে বলেছিল, 'সব আমার! এই সকল জঙ্গল আমার! আমি ধরতির আবা বটি।'

ওদিকে চালকাড়ে কারো চোখে ঘুম ছিল না।

সবাই জেনেছিল সুগানা মুণ্ডার ছেলে বিরসা মুণ্ডা পাগল হয়ে গেছে, বুঝি পাগল হয়ে গেছে। করমি বলছিল, না—না—না!'

সবাই বলছিল, 'কেন মিশনে যেয়ে সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করল?'

—'জেদীটা চিরকাল।'

—'কেনে জনেও নিল, আনন্দ পাঁড়ের কাছে যেয়ে রইল?'

—'বড় ছটফটা চিরকাল।'

—'কেনে চালকির মড়া খুঁড়ে উঠাল?'

—'মোরে চাল এনে দিবে বলে।'

—'কেনে জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরে?'

—'মোর উপর রাগ করা চলে গেল।'

—'হ্যাঁ তোর ছেলা পাগল।'

করমি মাথায় ঘা মেরে উঠোনে বসে রইল। সুগানা বলল, 'যা কপালে আছে তাই ত হবে? যা কপালে লিখা নাই তা কখনো হয়?'

—'এই ঝড় চলেছে চারদিন, আকাশটা খেপা হাতি হয়া জল ঢালছে মেঘের শুঁড়ে, নদীতে বান, বাজ হাঁকছে, জঙ্গলে ও একা একা ফিরে কেন? কি করে?'

—'কেমন করে বলব?'

—'তুমি ওর বাপ!'

—'তাতে কি?'

—'হাত-পা কোলে নিয়ে বসে থাকবে?'

সুগানা ধীরে বলল, 'মোর কথা ও শুনবে? কোনোদিন শুনেছে? কোনোদিন চড়া কথা বলে নাই, চেতে উঠে নাই, যা বলেছি সব শুনে গেছে। কিন্তু যখন কাজ করার কথা, ওর যা মন নেয়, তাই করেছে। ও আমার ছেলে, কিন্তুক ওরে আমি চিনি না। তুইও চিনিস্ না। মুণ্ডার ঘরে এমন ছেলে হয় নাই।'

—'হা, তুমিও এমন কথা বল?'

—'বলি।'

—'বল না। এ-কথা শুনলে আমার ভয় করে, আমি ডর খাই। এমন ছেলে, এমন

ছেলে, কেমন ছেলে? ও সকল ছেলের সমান হলে আমি ডর খেতাম না। ও যেন কেমন! কি হবে ওর? মায়ের মন বলে ওর জানি কি সর্বনাশ হবে!'

—'হলেও সে সর্বনাশ তুমি আমি রুখতে পারব? সকল সর্দাররা ওর দিকে চেয়ে আছে।'

—'জানি।'

কর্‌মি অঝোরে কেঁদেছিল।

বলেছিল, 'এত ছেলা থাকতে আমার ছেলার দিকে তারা চায় কেন? কেন বিরসা জন্মাতে আকাশে তিন তারা দেখা গেল? সকলে বলল, তোর ঘরে ধরতি-আবা জন্ম নিল? হা রে! আমি ধরতি-আবা চাই না রে! আমি আমার ছেলারে বুকের ভিতর চাই। আমি আমার ছেলা চাই!' কর্‌মি কপাল চাপড়ে হা হা করে কেঁদেছিল। বলছিল 'মায়ের ব্যথা কেও বুঝে না রে!'

তারপর বজ্র-বিদ্যুৎ-শিলাবৃষ্টির ভেতরে বাতাসের চাবুকে শাল-মহুয়া-পলাশ-সেগুন-কেঁদ গাছের হাহাকারের মধ্যে, ওর দরজার সামনে হঠাৎ নাগর বেজে উঠেছিল।

এ-নাগর পহানের ঘরে থাকে। ভীষণ বিপদে, দাবানলে, বানে, পুলিশের অত্যাচারে, এ-নাগর বের করে দেয় পহান্। এ-নাগরের আওয়াজ অতি ভীষণ, গম্ভীর, রক্ত-কাঁপানো। ভূমিকম্প হলে পৃথিবীর পেট থেকে এর আওয়াজের মতো গম্ভীর সাবধান-হুঙ্কারে ফেটে বেরোয়। দরজা খুলে দিয়েছিল সুগানা।

—'কি হয়েছে?'

মানুষ, গ্রামের সকল মানুষকে বজ্র-বিদ্যুতের নীল আলোয় দেখা যাচ্ছে, কালো চামড়ায় বৃষ্টির জল চমকাচ্ছে, গড়াচ্ছে।

সকলে বলেছিল, 'চেয়ে দেখ্।' ধরতি-আবারে চেয়ে দেখ্। সবাই একসঙ্গে মাথা হেলিয়ে দিয়েছিল।

সে এক অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। সে দৃশ্য ভাবলে পরে বুক কেঁপে যায়। নাগরা বাজছে গম্ভীরে, জঙ্গল ঝড়ের চাবুকে আর্তনাদ করছে, আকাশ বজ্র-বিদ্যুতে হাসছে আর জল ঢালছে। আর আকাশপানে দু-হাত তুলে বিরসা আসছে। বিরসার চোখেমুখে বৃষ্টির জল, দৃষ্টি উজ্জ্বল, ভীষণ, ভবিষ্যতের মতো, মুণ্ডাদের ভবিষ্যতের মতো ভীষণ।

এগিয়ে আসছিল বিরসা। মাথা উঁচু করে দু-হাত তুলে। সুগানা আর কর্‌মির মুখে কথা সরেনি।

—'বিরসা!' কর্‌মির মুখে অবিশ্বাস।

—'বিরসা বলিস না মা। আমি ভগবান। আমিই ভগবান। আমি মুণ্ডাদের ছেলে ভুলাব না, কোলে দুলাব না। আমি সকলের জন্য এই জঙ্গল মাটি জিনে এনে দিব। এরা ভগবান চেয়েছিল মা, আমি ভগবান হয়ে ফিরে এলাম!'

—'আমার বুকে আয়।'

কর্‌মির শীর্ণ, কুঞ্চিত বুকে বিরসা কপাল ঠেকিয়েছিল। কর্‌মির হাত দুটি নিজের হাতে তুলে ধরে বলেছিল, 'আমি ভগবান, মা গো! আর তোর কোলে মোরে ধরবে না;

আটকাবে না। আমি এই ধরতি-আবা।'

করমির আর্ত, বুকফাটা হাহাকার সকল মুণ্ডার জয়োল্লাসে চাপা পড়ে গিয়েছিল, ডুবে গিয়েছিল নাগরার ডুমড়ুমুড়ুম্ গম্ভীর ঘোষনার ঢেউয়ের নিচে।

মুণ্ডারা চেঁচাচ্ছিল, ভগবান হয়েছে গো বিরসা। সকল রুগা-ভুগা বাঁচবে, মরাকে জীয়াবে, ভুখাকে ভাত দিবে।'

নাগরায় ঘা পড়ছিল।

— 'সকল জমি ফিরা দিবে, জঙ্গল ফিরা দিবে, দিকুদের খেদা করা দিবে।'

নাগরায় ঘা পড়ছিল।

সুগানা কানে হাত চাপা দিল। বলল, করমি! তোরে বলি নাই এই ছেলে তোরে হাসাবে যত, কাঁদাবে তত?'

'হ্যাঁ, কি হবে?'

—ভগবানের বাপ আমি, মা তুই! যেমন হাসাবে-কাঁদাবে তেমনি হাসব কাঁদব।'

সুগানা গভীর, অবোধ্য দুঃখে, ভয়ে বার বার মাথা নেড়েছিল।

৯

ক-দিনেই সুগানার ঘর তীর্থ হয়ে উঠল।

বীরসিং মুণ্ডা, যে ওদের এ গ্রামে বসত করায়, সে সর্দারদের দলে অনেক দিন আছে। সে সব সর্দারদের খবর দিল।

শিমুলগাছের ফল ফেটে তুলোর আঁশ দিকে-দিকে উড়ে যায়। বিরসার খবরও চলে গেল দূর হতে দূরে। লোঙ্গা কুরিয়া, নারাঙ্গা, তুবিল, মুচিয়া, বনপিরি, বারতোয়া, গোপালা, বীরবাঁকি, বোন্দো, বাম্বা .....দূর দূর থেকে লোক আসতেই থাকল।

মুণ্ডাদের সকল প্রত্যাশা পূর্ণ করে ভগবান মানুষ হয়ে জন্মেছে। দলে-দলে সবাই ভগবানকে দেখতে আসে। সেই কিশোর গায়ক সুনারা মনিবের ছাগল বনে ছেড়ে দিয়ে একটা বুরুর ওপর এখানে পিয়াসাল গাছটার ডগায় উঠল। বসে বসে দেখতে লাগল সবাই মুণ্ডারা সব সারি বেঁধে গান গেয়ে-গেয়ে চলছে চালকাড়ের দিকে। ওপর থেকে ওদের মনে হচ্ছে মানুষ-পিঁপড়ের ঝাঁক। সুনারা ভুরু কুঁচকে গালে হাত দিল। ভাবল কিসের বান আসছে? কোন্ আশ্রয়ের খোঁজে ওরা বিরসার কাছে চলেছে?

সুনারা বিরসাকে সেই 'বোলোপে বোলোপে' গান শুনিয়েছিল। এরা কি গান গাইছে এখন?

'নে মুলুক দিসুম্রে ধরতি' আবায় হাইজি লেখায়ে ভাদ্রমাসে,
'মানোয়া হোন্কো রসিকতানারে ভাদ্রমাসে......'
'এই দেশেতে ধরতি আবা জন্মাল গো ভাদ্রমাসে।
মানুষ আনন্দ করে ভাদ্রমাসে
প্রার্থনা জানায় মানুষ সার বেঁধে এসে

চলে যায় দল বেঁধে

....

চল যাই, আনন্দ করি, ধরতি-আবাকে প্রণাম করি

সে আমাদের দুশমনদের বন্দী করবে ভাদ্রমাসে।'

সুনারা অবাক হয়ে গেল।

কাল সুনারা হাটে গিয়েছিল মনিবের সঙ্গে। হাট থেকে ও কত নতুন নতুন কথা শুনে এল।

শুনল, বিরসা যে ধরতি-আবা—সে খবর, এমনকি পালামৌ অবধি চলে গেছে। আর কোনো জাত-পাতের বাধা নেই, বিরসার নাম এখন প্রবল জলোচ্ছ্বাস। বড় বড় পাথরের বাধা সে জলোচ্ছ্বাসের মুখে ভেসে চলে গেছে। পাথুরে জমির বুকে বয়ে চলে তাজ্‌নে নদী কান্‌চা নদী। সে নদীতে বান থাকলে পাথর ভেসে চলে যায়।

বিরসা এখন ধরতি-আবা। কতদিন ধরে আদিবাসীরা বিরসার মতো কারোকে চাইছিল কে জানে! সিংবোঙার সঙ্গে, মিশনের ধর্মের সঙ্গে একই সাথে সে নামাতে পারে যুদ্ধে—সেই ধরতি-আবাকে চাইছিল। ওরাওঁ, কোল, খারিয়াদের আর রক্ষা করতে পারছিল না সিংবোঙা। তারা ভরসা পাচ্ছিল না যিশুর শরণে। নতুন ভগবান চাইছিল ওরা। সে-ভগবান শুধু জাদু আর অপদেবতা আর অভিশাপ দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখে না। যে-দেবতা কিংডাম অফ হেভ্‌নের কথা বলে না উপোসী মানুষদের।

যে-দেবতা বলে, অপদেবতা নয়, দিকু আর সরকারকে খতম কর।

নিজেদের হক্‌ নিজেরা কেড়ে নাও।

যে-দেবতা বলে, দরকার হলে মারো, মরার জন্য তৈরি থাক।

সেই দেবতার কথা পৌঁছে গিয়েছিল দূর দূরান্তে। পালামৌ কোথায়, কোথায় ছোটনাগপুর। পালামৌয়ের বারোয়ারী আর চেচারি অবধি চলে গিয়েছিল খবর। অধিকাংশ ওরাওঁ আর মুণ্ডা হয়ে গিয়েছিল বিরসাইত।

না, জাত-পাতের বাধা থাকছিল না। হিন্দু-বেনে-মুসলিম—সবাই চলেছিল চালকাড়ে।

বিরসাকে দেখবে তারা।

মুণ্ডারা গান গাইছিল, গান গাইছিল হিন্দু-সদন্‌রা।

পায়ে পড়ি বলো কতদূর চালকাড়?

আমি ধীরে যাব,

কে বলে পুবে, কে বলে দক্ষিণে,

আমি ধীরে যাব,

জঙ্গলে গির্জায় চিতাবাঘ, ডাকে ভালুক

ওগো, ধীরে যাব? যাব দল বেঁধে?

বিরসার কথায় নাকি আলো ঝরে?

আমি ধীরে যাব, শুনবো তার বাণী।

সুগানা হাটে শুনে এসেছে, সরকারের কাছে খবর চলে গেছে। তাতে লেখা হয়েছে, রুগ্ন, খঞ্জ, অন্ধ—সবাই চলেছে চালকাড়ে। কত দূর চালকাড়, কত দুর্গম জঙ্গলে! সেখানে থাকার জায়গা নেই কোনো। তবু এই ঘনঘোর বর্ষায়, জঙ্গলে, চালকাড় ঘিরে ভক্তদের মেরা বসেছে।

সুনারাকে গোতং মুণ্ডা বলেছে, আমিও গিছলাম।'

'দেখলি?'

'দেখলাম।'

'কিরকম দেখলি?'

'ভ—গ—বা—ন!'

'ভগবান!'

'হ্যাঁ রে! আগে দেখাছি কত, তুইও দেখেছিস। এখন দেখলে সে বিরসা বলে চিনবি না। সে কি বিষ্ঠি রে সুনারা! আকাশ হতে জল ঝুঁঝায়। মোরা মাথার পর বাঁশের ছাতা ধরে বসে রইলাম। ছাতু আর লবণ নিয়ে গিছলাম অ্যা—ত! যদ্দিন ছাতু থাকল, দুটি খেয়ে বসে থাকলাম। খাবার ফুরাতে তবে ফিরছি। আমরা এতজনে গিছলাম, কি বলি।'

'কি দেখলি?'

'যত কানা-খোঁড়া-রুগা-ভুগা সবে গিয়ে বসে আছে। খুব গান বেঁধাছে রালুড়ুর গোমী মুণ্ডা।'

'কি গান?'

'চল্, তোরে শুনাই।'

'খাব কোথা?'

'তবু শুন্'—

চল হে মিতা চালকাড়ে যাই, বনের বুকে চালকাড়ে যাই
তারে দেখতে চল যাই
সবাই যায় মোরাও চল তারে দেখতে যাই
আকাশ হতে সুতার ভরে নেমে এসেছে সে
নূতন কথা গলায় নিয়ে নেমে এসেছে সে
লাউয়ের খোলে জল বহে মোরা যাব গো
মনের আশা পুরাব গো
ও যে সূরজ পারা উদেছে, পূর্ণ চাঁদের মত—
নিতি নিতি আসবে না সে
হঠাৎ কবে মিলাবে যে
চল মোরা যাই তারে দেখি
চলে গেলে আর ত পাব না দেখা
নিতি নিতি আসবে না সে
কবে দেশ ত্যজে চলে যাবে, মিলাবে আঁধারে গো।।

সুনারা শুনেছে, গোতং বলেছে ওকে—

বিরসা নাকি বলেছে সাদা হল সাহেবদের রং। সাদা মুরগি সাদা শুয়োর সব অশুচি। তাই মুণ্ডারা সাদা মুরগি, সাদা শূওর কেটে কেটে খেয়ে নিচ্ছে।

বিরসা নাকি আকাশ-বাতাস-জঙ্গল-মাটির গতিক দেখে বলেছে, ভীষণ অকাল হবে ১৮৯৫ সালে। পাপে ভরে গিয়েছে সব। সেংগেল-দার আগুনের চেয়েও বড় সর্বনাশ নেমে আসবে আকাশ থেকে।

সব অবিশ্বাসীরা মরবে।

বাঁচবে শুধু বিরসায় বিশ্বাসীরা।

তারপর আসবে সুখের দিন।

সেই সুখে আদিবাসীরা চাষবাস—কাজকর্ম ছেড়ে দিচ্ছে। আসুক অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করতে প্রলয়। পাপের রাজ্য ধ্বংস হোক। চাষ করে—কাজ করে—বেঠবেগারী দিয়ে—সেবকপাট্টা মতো খেটে দিকু-মহাজন-বেনের পেট মোটা করে কি হবে?

নতুন দিন এনে দেবে বিরসা। নতুন দিনে, মুণ্ডাদের সুখের জন্যে খাটা যাবে। এখন কাজ বন্ধ।

সর্দাররা বলে বেড়াচ্ছে, 'ভগবান বলছে মহা সর্বনাশ আসছে। দশটা সেংগেলদা-র চেয়েও ভারী সর্বনাশ। কেউ চাষ-বাস ক'র না, খাজনা দিও না, যে-যার খেতের ফসল খেয়ে ফেল গা।'

তা শুনে মুণ্ডারা আনন্দে, ভয়ে ক্ষেপে গেছে। এগুলো ভগবানের কথা না সর্দারদের কথা, তা কেউ ভেবে দেখছে না। গাই বাছুর ছেড়ে দিয়েছে খেতে। আমনের কচি চারা সব নির্মূল। যে-যার মুরগি কেটে খেয়ে নিচ্ছে। সব বেচে দিয়ে নতুন কাপড় কিনছে হাট থেকে। নতুন কাপড় পরে গান গেয়ে-গেয়ে সব ভগবানকে দেখতে যাচ্ছে। বেনেরা কাপড় বেচে লাল হয়ে গেল।

সুনারা মাথা নাড়ল। বোঝা যাচ্ছে না কিছু। কাটুই গ্রামে কলেরা লাগল। খবর পেয়ে ভগবান আপনা হতে দৌড়ে গেল। বলল, 'রোগীকে আলাদা রাখ, লবণ সিজিয়ে জল খাওয়াও। ওর কাপড় ইঁদারার পাড়ে, ঝর্ণায় কেচ না। সবাই জল সিজিয়ে খাও। এই তোমরা করগা! ভাত-পান্তা, ঘাটো, আমানি, যে-যা খাও, ঢেকে রাখ গা। বাসি-পচা খেও না।'

—'ভগবান, পূজা করব না তোমাকে?'

—'ওতেই আমার পূজা হে।'

—'তা মন্ত্র বলে দিবে না?'

—'দিব।'

ভগবান ধুরা নদীর ধারে গেল। বলল, পাথর দিয়ে জল ঘেরেছে কে? জল বন্ধ হয়ে সবুজ হয়ে উঠেছে?'

—'মোরা করেছি।'

ভগবান পাথরগুলো ফেলে দিল। হাত জোড় করে চোখ বুজে বলল; 'এদের জ্ঞান

দাও হে, বুদ্ধি দাও হে, মোর ভিতরের ভগবান। মুণ্ডারা হাজার মরণে মরে।'

বলল, 'এই বহতা স্রোতের জল খেও। মন্ত্র পড়ে দিলাম। আর হায়জা হবে না। আপাং গাছ সবাই চিন। তার শিকড় বেটে খেতে ভুলো না।'

সত্যিই হায়জা হয়নি কারো। সর্দাররা বলেছে, 'দেখলি তোরা? হায়জা বুড়ি ভগবানের মন্ত্র শুনে কেমন পাখিপারা ডানা সাপটে উড়ে চলে গেল?'

সুনারা মাথা নাড়ল। বিরসা যদি ভগবান হয়ে যায়, মুণ্ডাদের ভগবান, তবে সুনারা তার চেলা হবে। যদি সেংগেল-দা নেমে আসে তবে সে কেন মনিবের ঘরে পড়ে থাকে বান্দা হয়ে? মনিব, তার জ্ঞাত-গুষ্টি বেনে-মহাজন, মনিবের মনিব জমিদার, জমিদারের মনিব রাজা, সবাই ক্ষেপে গেছে।

—'পাগল একটা, খেপাটা! বয়সের ছেলে, ধাত বিগড়ে যা-নয় তাই বলে ভূতগুলোকে খেপাচ্ছে!'

এ-কথা মনিবে-মহাজনে হয়েছে। মহাজন বলেছে, এবার আকাশের গতিক দেখেছ? বিরসাকে জঙ্গলে নিয়ে ভগবান করবে বলে ক-দিন ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। তারপর থেকে আকাশ কেমন বিগড়েছে দেখেছ? জলের নাম নাই?'

—'না। আকাশের গতিক বুঝে বেটা বলছে এবার সৃষ্টি জ্বলে যাবে। সব খাক হয়ে যাবে।'

—'সর্দাররা কম বদমাস? তারা বলছে এ বাদে শুকনো খেতে আগুন দিব। মুণ্ডারা জানবে ভগবান সাঁচাই বলেছিল।'

—'কিন্তু গতিক বড় মন্দ হে।'

—'কেন?

—'আকাল আসে। মুণ্ডারা আসে। সেবকপাট্টা লিখাই, ওদের কিনে রাখি। তা বাদে সুখ কত। খেতে খাটে, ঘরে খাটে, পালকি টানে, বেটারা অবুঝ বোকা। খেত পাহারা দিবে তা চুরি করে না এক দানা। ঘরে ঠাকুর পেতে পূজাপাঠ দেখলে দুনো ডর খায়।'

—'অবুঝ বোকা।'

—'এবার কোনো লোকটা আসে না বিক্রি হতে? সর্দাররা কথা উঠায়ে দিয়াছে মানুষ কিনা-বিচা বে-আইন। আরে বে-আইন সে তো আমরাও জানি; পাট্টা তো ওদের ডর খাওয়াবার লেগে।'

'হ্যাঁ। কথাটা আমিও শুনেছি বটে। এবার তো সবাই জ্বলে যাবে, তবে আর ডর কিসের? দেখ যারা চিরকাল ভয়ে জুজু হয়ে থাকে, তারা যখন ভয় ভুলে যায়, যখন মুণ্ডারা হাসতে হাসতে নিজেদের খেত নষ্ট করে, তখন লক্ষণ খুব খারাপ। এই বিরসা হতে আমাদের ক্ষতি হবে খুব। এতকাল মুণ্ডারা কি করেছে বল দেখি? ডর খায় নাই?'

—'এতকাল ডর খেয়েছে।'

—'বিরসা ওদের বুঝিয়ে দিচ্ছে মরবি যখন ডরবি কেন?'

—'আমরা তো আমরা। মিশনে সাহেবরা ডর খাচ্ছে কত? কেউ ক্রিশ্চান রইতে চায় না। সবাই মিশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওরা বলছে মোদের কাছে চার বছর থেকে

বিরসা যা-যা শিখল, তাই ভাঙিয়ে বেটা মুণ্ডাদের ভুলাচ্ছে।'

—'এতে ডরের কি? আকাল হয়, চাল পায়, যেয়ে ক্রিশ্চান হয়। একেকবার বোকার মতো খেপে সরকারের সঙ্গে লড়তে যায়। মার খায়, জেহেল-ফাঁস-কয়েদ-কোড়ার ভয়ে যেয়ে ক্রিশ্চান হয়। দু-বছর ফসল পায়, পেটে খায়, মিশন ছেড়ে দেয়। সাহেবদের ডরের কি?'

—'বিরসাকে ডর। ও কি করছে বুঝা যাচ্ছে না কিছু।'

—'বুঝলে ডর থাকে না। না বুঝলে ডর বড়।'

সব মনে হচ্ছিল সুনারার। ও দেখেছিল মানুষ চালকাড়ের দিকে চলছে।

বিরসার কথা বলে যত কথা শোনা যাচ্ছিল সব বিরসার নিজের কথা কি না কেউ জানে না।

বিরসা কর্‌মির রান্না খাচ্ছিল। কর্‌মির ঘরেই ঘুমোচ্ছিল কিন্তু কর্‌মি জানছিল ওর ছেলেকে আর ওর কোলে ধরবে না। ধরতি-আবা ও। ওই হল মাটির পৃথিবীর মূর্ত রূপ। কর্‌মির সাধ্য কি ছেলেকে বলে, 'তোরে দেখে মোর ডর হয় বিরসা, তোর তরে ডর হয়। এত মানুষ পূজে যারে তার ডর বড়। মানুষ বড় ভুলে যায় বিরসা, আজ মাথায় তুলে, কাল মাটিতে ছেঁচড়ায়।'

ভয় পাচ্ছিল হরমু ওঝা। চিরকাল মুণ্ডাদের ভূতে ধরেছে, ডাইনী নজর দিয়েছে, শত্রু বাণ মেরেছে। চিরকাল ওরা হরমু ওঝার কাছে এসেছে। হরমু ওঝা চাল, মুরগি-খাসি নিয়েছে। তুকতাক—যাগযজ্ঞ করেছে। সবাই ওর কথা মেনে নিয়েছে।

এখন বিরসা যদি সিংবোঙা হয়ে ওঠে, তারই মতো শক্তিমান, মুণ্ডারা হরমুকে মানবে কেন। বিরসা বলছে, 'মন্ত্রতন্ত্র বিশ্বাস ক'র না, মনের আঁধার কাটাও, সামনে বড় দুর্দিন।'

তাই, গ্রামে যখন বসন্ত লাগল, হরমু বলল, 'বিরসার পাপে গাঁয়ে চেচক লেগেছে।'

বিরসা বলল, 'আমি চলে গেলে চেচক চলে যাবে?'

—'যাবে।'

চালকাড়ের সীমানা ছেড়ে চেলে গেল বিরসা। কিন্তু মড়ক কমল না। ঘরে ঘরে মানুষ মরতে লাগল।

মুণ্ডারা বলল, 'হরমু ওঝা! তোরে মোরা মেরে লাহাশ করে বনে ফেলে দিব। ভগবানকে তুই খেদা করলি। সেই পাপে চেচক ঢুকে গেল গাঁয়ে।'

হরমু ওঝার ভয় ধরে গেল। সে-ও গিয়ে বিরসাকে বলল, 'তখন বুঝি নাই বিরসা। তুই ধরতি-আবা বটিস। তোর জীবন থাকতে আর বোঙা-বুঙ্গি পূজাবার দরকার নাই। এখন তুই চল্‌। চেচক খেদা কর। নইলে ওরা মোরে লাহাশ করে বনে ফেলে দিবে।'

বিরসা ফিরে এল। সকলকে ডাকল। বাড়ির সামনে কাঠের মাচা। তাতে উঠে দাঁড়াল। হলুদ-ছোপানো নতুন ধুতি পরনে, গলায় পইতে, কপালে চন্দন। আকাশের দিকে হাত তুলে অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইল। তারপর বলল, 'সবে শুনহে!'

—'বলহে ভগবান!'

—'যাদের চেচক ধরে নাই, সকল লোকে নিমপাতা সিজে জল খাও। নিমপাতা জলে সিজে সে-জলে গা মুছ। যার গায়ে চেচক ধরেছে, কিন্তু গুটি বারায়নি, সাদা তুলসীপাতার রস, আদার রসে মিশিয়ে তারে খাওয়াও, গুটি বারাবে। তা বাদে সকল চেচক রোগীরে করলা পাতা আর হলুদের রস মিশায়ে খাওয়াবে।'

—'আরও বল।'

'রোগীকে গা মুছাবে যে, খেতে দিবে যে, সে একোজনা। অন্যরা যেয়ে যে-ঘরে চেচক নাই সে-ঘরে পড়োশির সঙ্গে থাকগা। যা বলি শুন।'

—'মোর ছেলে যে কচি, ভগবান! হাঁটে, হাঁটেও না। তার চেচক হল যে?'

—'আমি তারে দেখব। আর যেটা মরবে সেটার কাপড়ের মায়া ক'র না। অমনি কাপড় পুড়াবে। কেচে পরবে না। যে ঘাসের চাট্টিতে শুয়েছে, সে চাট্টিও পুড়াবে।'

—'তা বাদে?'

—'তোমরা যাও। আমি চন্দন বেটে লয়ে যাচ্ছি। চন্দন লেপে দিব ঘায়ে।'

বিরসা ঘরে ঘরে ঘুরতে লাগল। মুণ্ডারা হায়জা-চেচক-সাপকাটা-বাঘ ধরা এ মরণ ভাগ্যের লেখা বলে জানত। বিরসা ওদের শেখাতে লাগল চেচক-হায়জার সঙ্গেও যুদ্ধ করা যায়। জ্যান্ত ভগবান সঙ্গে থাকলে হায়জা-বুড়ি, চেচক বুড়ো আপনা হতে পালায়।

গ্রাম থেকে বসন্তের মহামারী চলে গেল। তারপর কর্‌মি বলল, 'বিরসা! তুই সাঁচাই ভগবান হচ্ছিস বাপ? চেচক হয় কিন্তুক বিশ-পঞ্চাশটা মুণ্ডা মরে না, এ তো আমার জীবনকালে দেখি নাই?'

বিরসা বলল, 'এত মানুষের মাঝে আমি তোর বিরসা নই রে মা! আমি ধরতি-আবা।'

—'ধরতি-আবাই হছিস্।'

—'ভগবান হয়ে এসেছি। তোমাদের পথ দিশাব। তা বাদে চলে যাব। দিকুরা আমার ক্ষমতা দেখে বশ না মানলে মুণ্ডারা বাঁচাবে না, মনে জানলাম।'

১০

বিরসা বুঝতে পারছিল, নতুন ধর্মের প্রচার—মড়ক রোখবার উপায় নির্দেশ—শুধু এতে ধরতি-আবা হওয়া যাবে না। এ পর্যন্ত ও যা যা করেছে, তারও পেছনে আছে ওর মিশন-জীবনের শিক্ষা—হয়তো বা বৈষ্ণব ধর্মের কিছু শিক্ষাও। পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত স্নান করা, শুদ্ধশুচি দেহেমনে প্রার্থনা করা—এর পেছনে আছে ওর জীবনের গত ছয়-সাত বছরের অভিজ্ঞতার ইতিহাস।

কিন্তু ওকে অন্য ভূমিকায় নামতে হবে।

অন্তরের অন্তরে ও অরণ্য জননীর কান্না শুনতে পাচ্ছিল।

শুদ্ধশুচি হব আমি!

অন্তরের অন্তরে—ওর রক্তের নদীকূলে ও সেই জননীকে দেখতে পাচ্ছিল। নগ্নিকা মুণ্ডারী যুবতীর মতো তার কৃষ্ণা জননী—আদিম আরণ্যক কাঁদছিল আর বলছিল, বেবস্ত

রব না আমি। ওরা আমার লাজলজ্জা কেড়ে লয়ে লেংটা করে আকাশের নিচে দাঁড় করায়ে দিয়েছে।

কাঁদছিল ওর অন্তরের একাকিত্বে, ওর অন্তরের অন্ধকার একাকিত্বে নির্বাসিত জননী কৃষ্ণা ভারত। বলেছিল, মোর বুকে আজও ক্ষীর আছে, তবু মোর সন্তানদের বেবাগী করে রেখে দিল ওরা, এমন কপাল!

অস্থির হয়ে উঠেছিল বিরসা।

ওর অস্থিরতা জেনে কর্‌মি একদিন উঠে এসেছিল রাতে।

কর্‌মি বলেছিল, 'ধরতি-আবা হলি, তবু তোর ছটফটা ঘুচে না কেনে বাপ মোর? ফাঁদে পড়া বাঘ যেমন ঘুরে ঘুরে ফিরে, তেমুনি ফিরিস রাতভোর? হা বিরসা, কি চাস তুই?'

'মা, তুই কি রাতে ঘুমাস না?'

'না বাপ! যেদিন হতে তুমি ধরতি-আবা হয়াছ, মোর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়াছ।'

'কেন মা, কেন?'

'বাপ! তুমি ত আর মোর বুকের বেথা বুঝবে না। তুমি যে এখন সকলের বেথা বুঝ। কেও জানত না, চিনত না মোরে—এখন মোরে দিশলে পহান্-বেনে উঠে দাঁড়ায়। বলে, ব্বাপো, রে ব্বাপো। তোমার ছেলে ভগবান, তোমার সামনে মোরা বসতে পারি?'

'তাতে তোর দুখ, না সুখ?'

'সুখ যত দুখ তত বিরসা! কোম্‌তা কনুর মত হতে তুমি, বউ আনতে ঘরে, ছেলামেয়া হত, দুখ রত না কিছু। কেন তুই ভগবান হলি বিরসা? এত বড় কেন হলি, যে মোর কোলে তোরে আর ধরল না, মোর বুকে তোরে আর আঁটল না। কেন তুই বলিস, চলে যাব? কোথা যাবি ও আমার বাপ, মোর আবা? কেন তুই হতে মোর ঘরের আকাশে মানুষ তিন তারা দেখল? কেন ধানীর বোন তোরে চাইবাসায় দেখে এসে সকলেরে প্রচার দিল, কর্‌মির পেটে ভগবান জন্ম নিয়াছে?' কেন, কেন, কেন রে?'

'চল্, ঘুমাবি চল্।'

'সকলে ঘুমায়, ভগবানের আশ্রয়ে আছে, নিশ্চিন্তে ঘুমায়। মোর চোখে ঘুম নাই। ভগবানের মা আমি, ভগবানের কি হবে সেই ডরে আমি জেগে জেগে কাঁদি।'

'চল্ মা তোরে পাশে নিয়ে শুব।'

'কবে মোর কোল ঘেঁষা ঘুমাতি, কবে তোরে ক্ষিধায় খেতে দিয়াছি, কবে তোর বেথা লাগলে কোলে লয়ে কান্না ভুলায়েছি, সব মনে ছোঁয়ার মত আঁধার আঁধার লাগে রে বিরসা!'

'চল্ মা!'

'শুনছি। কোন মুণ্ডা মায়ের ছেলেকে আইড়কাঠি লয়ে গিয়াছিল। কোন্ পথে ছেলে ফিরবে সেই পথ চেয়ে নদীর ধারে বসে কান্‌তে—কান্‌তে—কান্‌তে—কান্‌তে—কান্‌তে—কান্‌তে সে মা পাথর হয়ে যেয়াছিল! তুই মোরে যত কাঁদাবি বিরসা, সে ত মনে জেনাছি। আমিও পাথর হয়া রব বুঝি!'

'না মা! ডরিস্ না।'

'আয়, মোর কাছে আয়।'

বিরসা কাছে এল। কর্‌মি ওর শুক্‌নো, শীর্ণ বুকে ছেলের মাথা টেনে নিল। মাথা শুঁকে বললে, 'তোর গা-মাথা হতেও সে চিনাজানা গন্ধ চলে গিয়াছে রে!'

'শো দেখি মা! মাথায় হাত বুলাই।'

'বুলা। তুই কাছে আছিস, আজ মোর চোখ ঢেলে ঘুম নামে।'

'সারাদিন খাটিস কেন?'

'বাপো রে! এখন আমি ভগবানের সংসার দেখি। আমি না খাটলে এত এত মানুষ ভাত-জল পায়? না ঘর লেপাপুঁছা রয়?

'ঘুমা!'

কর্‌মি ঘুমিয়ে পড়ল। বিরসা ভুরু কুঁচকে সর্দারদের ভূমিকার কথা ভাবতে লাগল।

মাঝিয়া মুণ্ডা, বুধ মুণ্ডা, পরান পহান্‌, ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ যারা, তারা বলছে, 'ভগবান, সর্দাররা তোমার কাঁধে কুড়াল রেখে শালগাছ কাটতে চায়।'

জানে বিরসা, জানে সে কথা।

সর্দারদের আন্দোলন মানে আর্জি করার আন্দোলন। সে-আন্দোলনে কোনোদিন এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। যে আন্দোলনটা সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারের মতোই মিশনারীরাও আসলে মুণ্ডা স্বার্থের বিরোধী। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করাই যে একমাত্র পন্থা, তাও বোধহয় সর্দাররা মানেনি। সর্দাররা মুণ্ডাদের স্বার্থের জন্যেই আন্দোলন চালিয়েছে। কিন্তু সে যেন শুধু ছোটনাগপুর টেনিওর অ্যাক্‌ট কার্যকরী করার আন্দোলন। এবারই ওরা মিশনের সংস্রব ছাড়ল। দেখা গেল, ওরা যেন উদ্দেশ্যে খানিকটা স্থির, পন্থায় খানিকটা মরিয়া।

সর্দাররা সবাই এসে তার কাছে শামিল হচ্ছে। কিন্তু তার পেছনে নানা উদ্দেশ্য কাজ করছে।

এই ত, বীরসিং মুণ্ডা—যে ওদের চালকাড়ে বসত করিয়েছে, তার কথাই ধরা যাক। বীরসিং মুণ্ডা প্রবীণ সর্দার। ১৮৩১-৩২ সালের কোল্‌ বিদ্রোহে যোগ দেবার কারণে ওর ঠাকুরদা চালকাড় সমেত বাইশটা গ্রামের মান্‌কিদারী হারায়। বীরসিং চাইছে বিরসা আন্দোলন করুক। সে আন্দোলনে শামিল হলে ও মানকি হবে আবার!

মাংগা মুণ্ডা, জন মুণ্ডা, মার্টিন মুণ্ডার মত সর্দাররা এসেছে তার কাছে। তার কারণ, তারা জানে সর্দারদের আন্দোলন দুর্বল।

তারা জানে, বিরসার ওপর মুণ্ডাদের অসীম আস্থা। ওরা বিরসাকে কাজে লাগাতে চায়। তাহলে ওদের আন্দোলন সফল হয়।

সর্দাররা বিরসার অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়াচ্ছে। গিডিয়ুন, ইলায়াজার, প্রভুদয়ালের মতো বিশিষ্ট সর্দাররা আসছে বিরসার কাছে।

ভাল, খুব ভাল।

তার আন্দোলনে সর্দারদের আন্দোলন মিশে যাক। কিন্তু বিরসা সর্দারদের হাতের

পুতুল হবে না। সেই হবে নেতা।

তবে কি মুণ্ডা রাজের ডাক দেবে বিরসা? সে রাজে সব বিদেশী হবে বিতাড়িত। যে রাজের প্রধান হবে বিরসা নিজে?

বিরসা বুঝল, শুধু এক ঈশ্বরের ধর্ম, নতুন রীতির উপাসনার কথা বলতে ও ধরতি-আবা হয়নি। তার মা, সেই কৃষ্ণা অরণ্যকার দুঃখ ও লজ্জা তাতে ঘুচবে না। অন্য কথা বলতে হবে তাকে।

বিরসা ঠিক করল, এখন থেকে মুণ্ডা ছাড়া কারো সঙ্গে কথা কইবে না ও। বেনে ও মহাজন, দিকুদের আসতে দেবে না তার সভায়। জমিদার মহাজন ও বেনে যে মুণ্ডাদের শত্রু, এ-কথা বলবে ও মুণ্ডাদের!

কিন্তু বিরসার নামে ভয় পাচ্ছিল দিকুরা। বিরসা জানত না সর্দাররা সবাই ওর দলে ভিড়ছে বলে মিশন সাহেবদের কাছে সরকারী দপ্তর থেকে খবর চলে এসেছে। সাহেবরা রিপোর্ট তৈরি করেছে। চাইবাসা ও রাঁচিতে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে। মুণ্ডারা একটি নামের পাশে গিয়ে জুটছে, খরা-আকাল, সরকারী পুলিশ সকলের ভয় ভুলে যাচ্ছে, সাহেব-সরকার ভয় পাচ্ছে।

বিরসা জানত না ওর নামে বড় বড় রিপোর্ট যাচ্ছে। মিশনের সাহেবরা লিখছে বিরসা আমাদের কাছে যা-যা শিখেছে, সেইসব বাইবেলের গল্প বলে মুণ্ডাদের ভোলাচ্ছে। আমাদের যে-ভাবে মড়কের সময়ে সেবাশুশ্রূষা করতে দেখেছে, সেইভাবে সেবা করে মুণ্ডাদের ভোলাচ্ছে। লোকটা অশিক্ষিত, বদমাস, বোকা ঠক্‌বাজ।

সরকারী চিঠি এল, 'তাই যদি হবে, তাহলে তোমার থেকে মুণ্ডারা ওর কাছে চলে যাচ্ছে কেন? ও-ই বা কেন মিশনের প্রচারকদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ঘুরছে! বিরসা কিসের পুনর্জন্ম চাইছে? এক আদিম ধর্মবিশ্বাসের না বিদ্রোহের? মনে রাখতে হবে, ১৮৩১-৩২ সালেও তামার বিদ্রোহে জ্বলে উঠেছিল। মনে রাখতে হবে, সর্দারদের বিদ্রোহে সাহেব-সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ গোড়ার দিকে ছিল না। সর্দাররা লড়েছিল দিকুদের বিরুদ্ধে। সাহেব-সরকার যে শত্রু, এ-বিশ্বাসটা ওদের মনে পরে এসেছিল। কিন্তু এখন সর্দাররা জানে সাহেব-সরকার ওদের শত্রু।'

উত্তর গেল, বিরসা যাই বলুক, মুখে যতই ধর্মের কথা বলুক, ওর ভক্তরা কিন্তু হাতিয়ার যোগাড় করছে। বিরসার ধর্ম কি তা বোঝা যাচ্ছে না। এবার ঘোর আকাল। তবু মুণ্ডারা মিশনে এসে লঙ্গরখানা খুলতে বলছে না। বিরসার প্রভাব এমন বেড়ে চলেছে যে সর্দাররা নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। ও একবার ডাক দিলে সবাই, সব মুণ্ডারা বিদ্রোহ করবে।'

সাহেবদের কথা না জেনেই বিরসা মুণ্ডাদের আহ্বান জানিয়েছিল, 'নানাভাবে তোমরা দেখলে হে আমিই ভগবান।'

—'দেখলাম।'

—'এখন শোনো। মুণ্ডারা বড় বাঁধা পড়ে গিয়েছে হে। দিকুরা মুণ্ডাদের ধারে-কর্জে-কয়লাখাদে-রেলে-জেহেলে-আদালতে হাজার পাকে বেঁধেছে। এখন মোদের সবরকমে

আজাদ হতে হবে। সকল বিদেশীকে তাড়াব। কারেও কোনো খাজনা দিব না। সকল বন নিয়ে নিব। যেমন আগে নিয়েছি, তেমনি করে নিব।'

—'কবে?'

—'আমি বলে দিব। আজ হতে আমি কোনো কটা মানুষ, সাদা মানুষের সঙ্গে কথা বলব না। মোরে কেও "বাবু" বলবে না।'

—'বলব না। মান করে বলতাম।'

—"বাবু" ডাকে মোরে মান দিয়া হয় না।'

—'বলব না।'

—'কবে লড়াই শুরু হবে বলে দিব। এখন হতে গ্রামে গ্রামে তীর পাঠাও হে সবে। পাতা পাঠালে জেনেছ ধর্মের কথা শুনতে ডাকছি। তীর ভেজলে জানবে লড়তে ডাকছি হে আমি।'

—'দিব। দিব রে, তীর ভেজে দিব! কুচিলাতীর!' আনন্দে ধানী মুণ্ডা লাফ মেরে উঠেছিল। সাদা চুল কাঁপিয়ে কালো গ্রন্থিল হাত আকাশ পানে তুলে চেঁচিয়েছিল, 'নিয়ে যা তোরা! আজ পাঁচ বছর ধরে আমি অনে—ক তীর তৈয়ার করছি রে। আমি জানতাম বিরসা একদিন তীর ভেজা দিবে।'

১১

ধানীর তৈরি তীর সবগুলো গ্রামে গ্রামে পৌঁছতেও পায়নি, তার আগেই সরকারী চাকা নড়তে শুরু করল।

মুণ্ডারা চাষ করছে না, টাকা ধার নিচ্ছে না।

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল জমিদার জগমোহন সিং, মহাজন সূরজ সিং, পাটোয়ারী বনরাম সাউ, আড়কাঠি শিউলালের মতো লোকেরা। খাজনা হবে না, সুদ হবে না, ধান-গম ধার নেবে না কেউ জমি বাঁধা রেখে। কুলি হতে যাবে না কেউ চা-বাগানে।

ভয় পেয়েছিল মিশনের সাহেবরা। ক্রিশ্চান হতে চাইছে না কেউ। চলে যাচ্ছে মিশন ছেড়ে।

সরকারের টনক নড়ল। এ যদি বিদ্রোহের প্রস্তুতি না হয়, তবে এ কিসের ইঙ্গিত? কোন্ ভরসায় ওরা চাষবাস ছেড়ে দিচ্ছে? চাষ করলে, সারা বছর আকাশপানে মুখ তুলে আকাশের দয়ার দিকে চেয়ে চাষ করলে, তবু যাদের দু-পেটা ঘাটো জোটে না, তাদের বুকে এমন সাহস যোগাল কে?

ডেপুটি কমিশনার খবর পাঠালেন তামারের দারোগার কাছে। ১৮৯৫ সালের ৬ই আগস্ট খবর এল তামারে—বিরসা বলেছে, 'সরকার "উৎগেছে", খতম হয়ে গেছে। মুণ্ডারীরাজ এবার কায়েম হবে।' তখনি হেড কনস্টেবলকে আরও দুজন কনস্টবল দিয়ে পাঠিয়ে দিল দারোগা।

চালকাড়ে পৌঁছল ওরা অনেক রাতে। সুগানার ঘরের আশপাশ দিয়ে ঘরের পর ঘর তুলেছে বিরসাইতরা। একটি ঘরে বসে রইল পুলিস। বিরসাইতরা গ্রামে-গ্রামে তীর বিলি

করতে বেরিয়ে পড়েছিল। অন্ধকার রাত। বৃষ্টি পড়ছিল।

সকালে দু-জন কনস্টেবল বিরসার ঘরে গিয়ে হাজির হল। বলল, 'তোরে গেরেফতার করলাম বিরসা।'

কিন্তু বিরসাকে গ্রেপ্তার করা গেল না। সুগানা ও অন্য বিরসাইতরা কনস্টেবলদের বলল, 'চলে যা।'

বিরসা বলল, 'ও ঘরে জিরাও গা। এত জলে তামারে ফিরে যেও না।'

হেড কনস্টেবল বলল, 'সুকা চৌকিদার! তুমি চলে যাও। কোচাঙ্। পলুস প্রচারককে নিয়ে এস।'

পলুস প্রচারক আর ইউসুফ খাঁ কনস্টেবল দুশো মুণ্ডা, মাহাতো ও পহান নিয়ে চলে এল। আবার ওরা বিরসার ঘরের সামনে এল।

বিরসা হেসে বলল, 'সরকারের নিমক খাও, ধরতে এসেছ বুঝলাম। কেন আমায় ধরবে বল?'

সমবেত মুণ্ডারা বলল, 'জবাব দাও হে।'

—'তুমি মুণ্ডাদের খেপাচ্ছ।'

—'আমি ধর্মের কথা বলি।'

—'মুণ্ডারা আসে কেন?'

—'ওদের শুধাও।'

—'খাজনা দেয় না কেন?'

—'ওদের শুধাও।'

'—চাষ করে না কেন?'

—'ওদের শুধাও।'

—'তুই বল্। সরকার তোরে ধরতে বলেছে। তুই এদের কাজে বাধা দিছিস।'

বিরসা আস্তে বলল, 'পলুস, তুমি ওই পুলিশদের শুধায়ে দেখ, এরা ন-তারিখ রাত হতে ওই ঘরে আছে আমরা জানি। আমি ওদের মারতে পারতাম, খেদাতে পারতাম। কিছুই করি নাই। জলঝড়ে বের করে দিই নাই, দোষ হয়েছে। কিসের অসুবিধা শুধায়েছি। দোষ হয়েছে। ওদের কেউ চাল বেচতে চায় নাই। আমি বলেছি তবে ওদের চাল-ডাল-লবণ বেচেছে। সেও আমার দোষ হয়েছে। এখন বল দেখি, তুমি মুণ্ডা হয়ে মোরে ধরছ কেনে?'

—'তুমি সরকারের দুশমন।'

—'আমি ভগবান। মুণ্ডাদের ভগবান। হ্যাঁ, আমি তবে সরকারের দুশমন যদি সরকার মুণ্ডাদের সঙ্গে দুশমনি করে থাকে। আজ তুমি প্রচারক হয়াছ। সরকার মুণ্ডাদের বন থেকে খেদা করে, জমিদার-মহাজন ও অধ্বদের আইনের ভয় দেখিয়ে উচ্ছেদ করে, তুমি মুণ্ডা নাই আর, তাই মুণ্ডাদের দুঃখ তোমার বুকে বাজে না। তুমিও দুশমন।'

—'কার?'

—'মুণ্ডাদের। মিশনে মোর 'তুই' ছাড়া 'তুমি' বলত না কেউ। কেন? আমি মুণ্ডা।

এরা তো মোরে ধরবেই পলুস, এরা নাম সহি জানলেও সরকার চাকরি দেবে। মুণ্ডা যত লেখাপড়া শিখুক, চাকরি দিবে না সরকার। এরা তো মোরে ধরবেই পলুস, এদের জ্ঞাতস্বজন মুণ্ডাদের জমি-ঘর-আবাদী বন দখল করে বসেছে। কিন্তু তুমি কেমন মুণ্ডা হে পলুস প্রচারক?

—'বিরসা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

—'কেন, এমন কথা শুন নাই?' শুন পলুস, আমি মড়া তুলে মড়ার পয়সা চুরি করেছিলাম। মা আমারে খেদা করতে বনে চলে যাই। পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তা বাদে যখন আকাশে বাজ হাঁকড়ায়, বিজলী চিকুর দেয়, তখন আমার মধ্যে যেন সব শা—ন্ত হয়ে এল। সব যেন ভোম্ মেরে নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমার মনে তখনি জানলাম, হ্যাঁ, আমি ভগবান। আমি বিরসা, আমি ভগবান। সিংবোঙা হতে মিশনে যে ভগবানের কথা বলে, সে হতে সবা হতে মোর শক্তি বেশি।'

পলুস ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। চাইতে লাগল হেড কনস্টেবলের দিকে। হেড কনস্টেবলের চোখে আতঙ্ক। মুণ্ডারা ঘিরে ফেলল ওদের। কালো-কালো মুখে কি দুঃসাহসের দীপ্তি।

—'আমারে ধরবে সরকার?' ধরে রাখতে পারবে না। মারবে? মারতে পারবে না। যতদিন একোজন মুণ্ডা একোটা ধানগাছ রুইবে, একটা গাছ্ কাটবে, একটা ঘর বাঁধবে, তার মধ্যে আমি রইব হে পলুস। আমি ধরতি-আবা। আমার বিনাশ নাই। তোমাদের হাতে বিনাশ নাই।'

পলুস যে মুণ্ডাদের এনেছিল, তারা বিরসার সামনে লাঠি নামিয়ে রাখল। বলল, 'মহাপাপ করতে এসেছিলাম গো। মোদের মাপ করো ভগবান।'

বিরসা চেঁচিয়ে উঠল, 'খেদা কর ওদের। বের করে দাও। তাড়ায়ে দাও ওদের।'

মুণ্ডারা কনস্টেবলদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। ওদের হাতের বর্শা পুলিশদের পিঠে ঠেকিয়ে রাখল। মুণ্ডা মেয়েরা পেছনে পেতলের ঝাঁঝর বাজাল, গাল দিল। পালাতে পালাতে পলুস ভাবল কেমন করে এই গণ্ডগোলে ও গা-ঢাকা দেবে।

এবার এলেন রাঁচির পুলিশের ডেপুটি সুপার মীআর্স। সঙ্গে এল মুরহু মিশনের রেভারেন্ড লাস্‌টি, বন্দগাঁওয়ের জমিদার জগমোহন সিং। সঙ্গে এল বন্দুকধারী বিশাল পুলিশবাহিনী।

চালকাড় গ্রাম ঘিরে পুলিশ বেয়নেট উঁচিয়ে এগিয়ে এল। প্রতি বাড়ির সামনে পুলিশ, হাতে বন্দুক। বিরসা তখন ঘুমোচ্ছিল। পুলিশ সহজে তাকে ধরল। বেরিয়ে এসে বিরসা মুণ্ডাদের বলল, 'তোমরা ভেব না। আমি ফিরে আসব। ভেব না।'

তারপর ও মুণ্ডারীতে সুগানাকে কি যেন বলল। মীআর্স ভুরু তুললেন। রেভারেন্ড লাস্‌টি বললেন, 'বিরসা বলছে কোনো মুণ্ডা যেন বাধা না দেয়।'

—'ধানী, ধানী কি বলল?'

—'কি যেন বলল, ধানীর তীর এখনো মজুত আছে, এখনো সময় আছে। ও নির্দেশ না দিলে কেউ যেন লড়তে না যায়।'

—'ভগবানকে ধরলাম, ভগবান কিছু করতে পারল না। সেটা কিভাবে ব্যাখ্যা করল?'

—'ধূর্ত শয়তান! বলল এই বন্দী করা, নিয়ে যাওয়া, এটা ওর ঈশ্বরত্বের পরীক্ষা।'

—'শেষে হেসে কি বলল?'

—'প্রলাপ।'

—'তবু শুনি?'

—'কালো কুঁচগাছ খুঁজতে বলল।'

—'কুঁচ গাছ?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুঁচ তেল ওরা মাথায় মাখে।'

১২

কিন্তু চালকাড় থেকে রাঁচি অবধি খুন্‌টি, তামার, বন্দগাঁও, কোচাং জ্বলতে লাগল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। মুরহুতে লাস্‌টিকে, বন্দ্‌গাঁওয়ের জগমোহনকে পুলিশ পাহারা দিতে হল।

প্রদেশ সরকার বললেন, 'একটা খ্যাপা বিশ বছরের মুণ্ডা ছেলেকে বড় বেশি ভয় পাচ্ছে রাঁচির কর্তৃপক্ষ। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে খানিকটা। মীআর্স অত কায়দা না করলেও পারত। অত ভয়ের কি আছে।'

রাঁচি থেকে রিপোর্ট গেল—চালকাড় ও অন্যান্য বিরলবসতি, গরিব মুন্ডা গ্রামে অসম্ভব বিক্ষোভ জমে উঠেছে মানুষের মনে। মুণ্ডারা কোনো কথাই বলছে না, কিন্তু জমিদার বা মহাজনের কথাও মানছে না। খেতমজুর মিলছে না, বেঠবেগারী দিচ্ছে না কেউ। না-খেয়ে মরবি, এ-কথা বললে মুন্ডারা বলে বেড়াচ্ছে, আমরা কি দিকু, যে উপোস-অনাহারে ভয় পাব?'

প্রদেশ সরকার জানতে চাইলেন, 'দুর্ভিক্ষ তো দেখা দিল প্রায়। মুন্ডারা কি খাচ্ছে?'

উত্তর গেল, 'ঘাসের দানার ঘাটো। যখন মিলছে, খাচ্ছে। যখন মিলছে না, খাচ্ছে না।'

সহসা বিপন্ন বোধ করলেন লেফটেনান্ট গভর্নর। কি বিপদ! জমিদার মহাজনরা ক্ষুব্ধ। মুন্ডারা চাষ করছে না, ধার নিচ্ছে না, ভিক্ষে চাইছে না। ঘাসের দানা খাচ্ছে। ঘাসের দানা তো সরকারের খাজনা-আদায়ী শস্যের মধ্যে পড়ে না। যত সামান্য মনে হচ্ছিল, ঘটনাটা তত সামান্য নয়।

বড়লাট তখন সিমলায়। লেফটেনান্ট গভর্নর সিমলায় জানালেন, 'সরকার কিন্তু এ-কথা মনে রাখবেন, সরকার বাবুদের পিপের ওপর বসে আছেন।'

সে-কথা সিমলায় জানাজানি হতে শৈলাবাসে হাসির ধুম পড়ে গেল। বাবুদের পিপে! কেন, মুণ্ডারা কি জীবন্ত বারুদ নাকি? ওই তো দেশ। পাথর, পাহাড়, জঙ্গল আর আফলা মাটি। ফসল ফলে শুধু মুণ্ডাদের হাসিল করা অরণ্যভূমিতে। প্রয়োজনের তুলনায় তাও অপ্রতুল।

কি একটা সুজলা-সুফলা দেশ! কি তাদের অধিবাসীরা! প্রায় নগ্ন, গায়ের রং কয়লার

চেয়ে কালো, একবেলা ঘাসদানা সেদ্ধ করে খায়, শরীরে বল নেই, ভীতুর বেহদ্দ। তাদেরই ভয় করছে প্রদেশ সরকার?

বড়লাট কথাটা উড়িয়ে দিলেন। লেফটেনান্ট গভর্নর কিন্তু মীআর্স-এর রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন।

মীআর্স জানালেন, প্রথমতঃ, তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে বিরসার আন্দোলন ও সর্দারদের 'মুল্‌কি লড়াই' এক এবং অভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, প্রথমবার যে হেড কনস্টেবল বিরসাকে ধরতে যায় সে ঠিকই বলেছে। মুণ্ডা জনসাধারণকে দিয়ে বিরসা-বিরোধী কোন কাজ করানো যাবে না। তাদের বিশ্বাস বিরসা মূর্ত ভগবান। তৃতীয়তঃ, চার্চের মিশনারীরাই বলেছে, বিরসাকে ছেড়ে দিলে পরে রাঁচি ও চাইবাসা জেলা জুড়ে বিক্ষোভ ফেটে পড়বে। বিরসা একবার বললে মুন্ডারা মৃত্যু তুচ্ছ করে লড়াইয়ে নামবে।

লেফটেনান্ট গভর্নর জানতে চাইলেন, বিরসা সম্পর্কে মুন্ডাদের মনে অবিশ্বাস ও সংশয় জাগানোর উপায় কি?

মীআর্স জানালেন, ডাক্তার দিয়ে বিরসাকে পাগল বলে প্রতিপন্ন করতে হবে।

ডক্টর রজার্সকে ডেকে পাঠালেন রাঁচির কমিশনার।

রজার্স বললেন, 'আপনি যা বলছেন, সে মর্মে সার্টিফিকেট আমি লিখতে পারি না।'

—'কেন?'

—'বিরসা পাগল নয়!'

—'কি?'

—'পাগল নয় বিরসা।'

—'কিন্তু ও বলছে ভগবান।'

রজার্স বিরক্ত হলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'এটা ইউরোপ নয়। প্রাচ্য দেশ। যিশুও প্রাচ্যের লোক। তিনিও নিজেকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করতেন!'

—'যিশুকে বিরসার সঙ্গে তুলনা করছেন?'

—'না। আমি বলতে চাইছি যিশুকে কেউ পাগল মনে করেনি। কোনো মানুষের পক্ষে নিজেকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করার মানে এই নয়, সে-লোকটি পাগল। তাছাড়া কথা বলে দেখেছি ও অত্যন্ত স্বাভাবিক, বুদ্ধি আছে ওর। মুন্ডাদের প্রতি ওর ভালবাসা সত্যিই আন্তরিক।'

—'তাহলে ও সরকারের বিরুদ্ধে মুণ্ডাদের খেপাচ্ছে কেন? ও কি জানে না তার ফলে মুণ্ডারা বিপদে পড়বে?

রজার্স ধীরে বললেন, 'কমিশনার, আমি বা আপনি মুণ্ডা নই। বিরসা বোধহয় এইভাবে ভাবছে, মুণ্ডাদের আর কি বিপদ হতে পারে। তারা জমি-ঘর-বাড়ি-গাইবলদ সব একে-একে হারাচ্ছে। তাদের দেশে অন্যেরা এসে জুড়ে বসেছে। আমাদেরই তৈরি আইনের সাহায্যে।'

—'আইন মুণ্ডা বা অন্য লোকে প্রভেদ করে না।'

—'সে তো বইয়ের কথা। কাজে তা হয় না' তা আপনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। মুণ্ডারা বাংলা, হিন্দী, ইংরিজী জানে না, বোঝে না। বিচারক কোনোদিন মুণ্ডারী শিখে

মুণ্ডাদের বিচার করেন না। কোর্টে কেস উঠলে আসামী কি বলছে, বিচারক তা বোঝেন না। দোভাষী যথেচ্ছ মিথ্যে বলে বিচারককে বুঝিয়ে দেয়। ফলে কি হয় আপনি জানেন। এক আনার মূল্যে অপরের খেত থেকে তোলার অপরাধে মুণ্ডার এক্ বছরের জেল হয়, হরদম্ হয়।

—'গড্!'

—'বিরসার যদি মনে হয় মুণ্ডারা এখন, এই ব্রিটিশ শাসন যত বিপন্ন, এমন বিপন্ন তারা কোনোদিন হয়নি, তাহলে আমি তাকে, দোষ দিতে পারি না।'

—'হোয়াট আর ইউ টকিং?'

—'ইংরেজ হিসেবে, ক্রাউনের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে আমি তার মনোভাব সমর্থন করতে না পারি, তবু তাকে দোষ দিতে পারি না। বিরসা তার ভক্তদের মনে একটা আত্মবিশ্বাস জাগাতে পেরেছে। এই প্রথম দেখা যাচ্ছে, মুণ্ডা মুণ্ডা হয়ে জন্মেছে বলে গর্ববোধ করছে। এতদিন মুণ্ডা-জন্মের জন্য নিজেকে দোষ দিত, দুঃখ করত।'

—'আপনাকেও কি বিরসা ভজিয়ে ফেলল?'

—'ওর সঙ্গে, আমার মতো দিনের পর দিন কথা বললে আপনিও হয়তো ভজে যেতেন।'

—'অথচ আপনি ম্যান অফ সায়েন্স?'

—সেইজন্যেই তো ওকে পাগল বলতে পারছি না।'

—'তবে ওকে সাধারণ অপরাধীর মতো বিচার করতে হবে। বিরসার ওপর মুণ্ডাদের বিশ্বাস ভাঙতেই হবে।'

—'সে আপনার বিচার্য। তবে—'

—'কি'

—'বিচার করতে দেরি করবেন না।' সম্ভব হলে মুণ্ডারী জানে, অথচ মুণ্ডাদের জানোয়ার মনে করে না এমন কোনো লোককে দিয়ে বিচার করাবেন।'

রজার্স বিদায় নিলেন। কমিশনার তখনই ঠিক করলেন। রজার্সকে অবিলম্বে বদলি করতে হবে।

কমিশনার খবর নিলেন জেল কর্মচারীদের মধ্যে কে ভালো মুণ্ডারী জানে। শুনলেন, মেডিক্যাল অ্যাসিস্‌ট্যান্ট অমূল্যবাবু জানে। মেডিক্যাল স্কুলের ছেলে, তরুণ বাঙালী ডাক্তার অমূল্যবাবু।

তাকে নিয়ে বিরসার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কমিশনার। বিরসার ঘরে চেয়ার নিয়ে বসলেন। বিরসা অমূল্যবাবুর দিকে চাইল। ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল মৃদু হাসি।

কমিশনার বললেন, 'জিজ্ঞেস কর, কেন ও মুণ্ডাদের উত্তেজিত করছে।'

অমূল্যবাবু কিছু বলার আগেই বিরসা বলল, 'আমি মুণ্ডাদের উত্তেজিত করিনি।'

—'সে কি! তুমি ইংরেজি জান?'

—'আমার ফাইলে সে-কথা লেখা নেই বুঝি?'

—'লেখা আছে সামান্যই জান।'

—'ঠিকই লেখা আছে।'

—'তবে কেন ডাক্তারসাহেবকে বলেছ, না না উনি নিজেই কেন বললেন, মুণ্ডারী জানে এমন বিচারক চাই।'

—'কেন বলবেন না?'

—'তুমি তো ইংরিজী বুঝবে।'

—'আমার একার বিচার হবে বুঝি?'

কমিশনার চুপ করে গেলেন। কতটুকু জানে বিরসা? কতটুকু জানে না? অন্য কথাও পাড়লেন।

—'চালকাড়ে তুমি কি করছিলে?'

—'কি করছিলাম?'

—'মুণ্ডাদের খেপাচ্ছিলে।'

—'ধর্মের কথা বলছিলাম।'

—'তুমি ধর্মের কথা বলবার কে?'

—'আমি যে ওদের ভগবান।'

—'তুমি নিজেই জান এ কথা সত্যি নয়।'

—'তবে কোন্ কথা সত্যি?'

—'তুমি ভগবান নও। তুমি ওদের ধর্মের কথা বলনি। ওদের বিদ্রোহের প্ররোচনা দিচ্ছিলে।'

—'আমি ভগবান। আমি ওদের ধর্মের কথা বলেছি।'

—'তাহলে এখানে বন্দী হয়ে আছ কেন?'

—'বন্দী হলে কি ভগবান হয় না কেউ?'

—'না।'

—'যিশু বন্দী হননি? তাঁর বিচার হয়নি? তিনি মৃত্যুদণ্ড পাননি?

—'তুমি উন্মাদ, প্রতারক, মূর্খ।'

—'এ তো আমার কথার উত্তর হল না।'

—'উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'

—'তবে আমরা কথা বলছি কেন?'

—'আমি প্রশ্ন করব, তুমি উত্তর দাও।'

—'আমি তো উত্তর দিতে বাধ্য নই।'

—'তুমি জঙ্গলে মুণ্ডাদের অধিকার নিয়ে, খাজনা বন্ধ করা ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন করেছ।'

—'আমি উত্তর দিতে বাধ্য নই।'

কমিশনার কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন,—'তোমার বিচার হবে। সকলের সামনে। সেখানেই প্রমাণ হয়ে যাবে। মুণ্ডারা জানবে তুমি প্রতারক।'

—'বেশ।'

—'তুমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাও উকিল পাবে।'

—'উকিল?'

—'হ্যাঁ, উকিল। ব্রিটিশ-বিচার অত্যন্ত ধর্ম ও ন্যায়সংগত। বাদী ও ফরিয়াদ, দু-পক্ষই উকিল পায়।'

—'আমি উকিল চাই না!'

—'কেন?'

—'উকিল দিলেও মুণ্ডাদের জেল হয়, আজীবন দেখেছি। উকিল না দিয়ে কি হয় দেখি। ফল তো একই হবে, তবে কেন উকিলকে আসতে দেব?'

কমিশনার বেরিয়ে গেলেন। অমূল্যবাবু মাথা নাড়ল, বেরিয়ে গেল। কমিশনার বললেন, 'লুক আফটার হিম্, বাবু।'

—'ইয়েস স্যার।'

—'উদ্ধত, অসভ্য। আমি ওকে কাঠগড়ায় তুলব, দেখিয়ে দেব ও প্রতারক। দেখো যেন অসুস্থ না হয়।'

—'ইয়েস স্যার।'

—'কি বেপরোয়া সাহস! কি ঔদ্ধত্য!'

অমূল্যবাবু কিছু বলল না। পরে রাতে ও আবার বিরসার ঘরে গেল।

—'কেন এসেছ?'

—'তোমাকে দেখতে।'

—'কেন?'

—'তুমি যাতে অসুস্থ না হও, তা দেখা আমার স্পেশাল ডিউটি। তাই এসেছি।'

অমূল্যবাবু বিরসার হাত ধরতে গেল। বিরসা নিচু গলায় বলল, 'আমাকে ছুঁয়ো না তুমি। তুমি দিকু।'

—'না বিরসা, না!'

—'তুমি দিকু।'

—'বিরসা আমি—'

—'কিসের জন্য দিকু হলে বলতে পার? খাবে বলে, পরবে বলে, পালকি চড়বে, টমটম হাঁকাবে, রায়সাহেব হবে, বড়লোক হবে বলে?'

—'না—!'

—'আমার সঙ্গে তুমি আর কথা বলবে না। আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না। তুমি যারে জানতে সে বিরসা নাই। আমি যারে জানতাম সে অমূল্যও নাই।'

—'না বিরসা। তুমি তেমনিই আছ। তুমি যে একদিন মস্ত বড় হবে আমি তখনি জানতাম।'

—'একটা উপকার করতে পার?'

—'তোমার? বল বিরসা, কি উপকার?'

—'সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে, আমাকে বলতে পার। আমি জানি, সরকার ব্যবস্থা নিবে, জানি পোয়ালে আগুন ধরেছে তা সরকার জানে। ধুঁয়া দেখে সরকার ডর খাবে।'

—'বলে যাব। দু-চারদিন সময় নিব।'

—'তা নাও। এ এখন অনেকদিন চলল।'

—'শুনছি তাড়াতাড়ি বিচার হবে?'

—'না।'

বিরসা আস্তে বলল, মাথা নাড়াল, কম্বলটা টেনে কাত হয়ে শুয়ে একহাতেই কনুই মাটিতে ঠেকিয়ে চেটোর ওপর মাথা রাখল। ওর প্রতিটি ভঙ্গী, মাথা হেলানো, চাওয়া, আঙুল নাড়া সব কিছুর মধ্যে অসম্ভব আত্মবিশ্বাস স্থিরতা, ব্যক্তিত্ব,—আর—আর—আর একটা জ্ঞান—ও জানে ও কত ক্ষমতা ধরে, সেই জ্ঞান।

অমূল্যবাবু মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, অভিভূত হয়ে পড়ছে। কেন অভিভূত হচ্ছে? এ তো বিরসা, বিরসা দাউদ! হতভাগা গরিব সুগানা মুণ্ডার ছেলেটা! পড়ব বলে চাইবাসা মিশনে গিয়েছিল থাবায় থাবায় গরাসে গরাসে ভাত খেত, ইজের প্যাণ্ট কিভাবে পরতে হয় জানত না, অমূল্যবাবু ওকে পাখিপড়া করে শেখাত।

কত পথ হেঁটেছে বিরসা মিশন ছাড়ার পর থেকে? কেমন করে ও মুণ্ডারীদের ভরসা দিচ্ছে, সূর্যটা ধরার জন্যে আকাশপানে তারাও লাফ মারতে পারে?

বিরসা আবার বলল, 'তাড়াতাড়ি বিচার হবে না। করে কখনো? করে না; করে নাই, করবে না।'

—'তুমি জান বিচার করতে দেরি করবে? বিরসা, বিরসা, তুমি কি সত্যিই প্রফেট?'

বিরসা চোখের ওপর হাত চাপা দিল। বলল, 'মুণ্ডাদের, কোলদের, ওরাওঁদের, সর্দারদের বিচার তাড়াতাড়ি হয় কবে? হাজতে রেখে দেয়, প্রমাণ মিলে না, কেস তৈরি করতে দেরি হয়, কয়েদী হাল্লাক-পরেশান হয়, এ তো জানা কথা। জানি বলেই বললাম, আমার বিচার করতেও দেরি হবে। বললাম বলে যদি প্রফেট হই, তবে প্রফেট। কিন্তু ....'

—'কি?'

—'আমি মুণ্ডাদের ভবিষ্যৎ জানি, মনে রেখ। আমি জানি, আর কেউ জানে না।'

অমূল্যবাবু বুঝল না বিরসা কি বলতে চায়। যাদের বর্তমান নেই, আছে শুধু অতীত, তাদের ভবিষ্যৎ কেমন করে থাকতে পারে? অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পরস্পরের ওপর নির্ভর করে থাকে, না?

বিরসা বলল, 'আমাকে বলে যেও।'

বিরসাকে প্রথমবার ধরতে গিয়ে যখন পুলিস ফিরে আসে, তখন থেকেই অশান্তি আর বিক্ষোভ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছিল। কুল কাঠে আগুন দিলে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে সে আগুন জ্বলে আর অনুকূল বাতাস পেলে যে-কোনো আগুন থেকে দাবানল জ্বলতে পারে।

সেই সময় থেকেই মুণ্ডাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে চলছিল জোর আলোচনা, বাতাস গরম ছিল খুব, খুব গরম, মীআর্স বা লাসটি সে-কথা সবটুকু জানতেন না।

যারা খেরোয়ার আর সর্দার লড়াই লড়েছে, সেই সব প্রবীণ মুণ্ডারা বলছিল, কোনোদিন মুণ্ডারা সুবিচার পায় নাই, সুবিচার হয় নাই হে। দেখ, বিরসা ভগবান যত কথা বলেছে, তাহাতে বলে নাই এ-কথা?'

—'কি কথা?'

—'রাজা, জমিদার, দিকু, রাজপুত, আহীর, ব্রাহ্মণ, গোঁসাই, সকলে সরকারের সাথে শামিল থাকে।'

—'হ্যাঁ, এ কথা বলাছে ভগবান।'

—'মুণ্ডাদের লয়ে যত কথা হয়, সবেতে সরকার মদত দিয়া করে মিশনারী রাজা-জমিদারকে।'

—'হক কথা।'

—'মুণ্ডাদের খাজনা বাড়ে।'

—'হক কথা।'

—'আদালতও উয়াদের দলে হে! বহু আর্জি জানালে সাহেব আসে মুণ্ডা দেশে। এসে খানা-পিনা শিকার করে চলা যায়।'

—'চলা যায়!'

—'বিচার করে দিকুরা, বাবুরা।'

—'বাবুরা!'

—'তারা জমিদারের টালে ধান উঠে যাতে, সেই বিচার করে হে, সেই বিচার করে।'

'সেই বিচার করে।'

—'দারোগা কি পট্টিতে আসে না?' আসে। আসে মান্‌কিদের তরসাতে আর পয়সা পিটতে।'

—'হক কথা।'

—'ভগবান বলাছে, এমন করে চলতে পারে না।'

—'পারে না।'

—'আঁধি উঠবে, সে আঁধি সরকারকে উড়ায়ে নিয়ে চলে যাবে, ভগবানের কথা।'

—'হক কথা।'

বিরসা জানত না, ওকে ধরতে গিয়ে প্রথমবার যখন পুলিশ ফিরে আসে তখন হতেই এইসব কথা হচ্ছিল পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে। "ভগবান বলাছে" বলে এইসব কথা বলছিল যারা, তারা বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ, প্রবীণ, ক্ষতবিক্ষত যোদ্ধা। বিরসা একেবারে জানত না বলা ঠিক হবে না। কিছু কিছু ওর কানেও এসেছিল, কিন্তু বনে ঝড় উঠলে সব গাছের পাতা একসঙ্গে মিশে বাতাসের মুখে ঘূর্ণিপাক খেয়ে উড়তে থাকে। সে-ঘূর্ণি থেকে শাল-পিয়াসাল তফাত করা কঠিন। মুণ্ডাদের জীবনের যে আঁধি উঠেছে, সে আঁধির মুখে মুণ্ডা জীবনের বঞ্চনার লক্ষ হাজার কথা উড়ছিল।

কোন্‌টা বিরসার কথা, কোন্‌টা সর্দারের তা তফাত করা বড় কঠিন। আর, সময় বুঝে, প্রহর বুঝে, কথা দিয়ে আগুন জ্বালাবার কাজে সর্দাররা প্রবীণ ও অভিজ্ঞ। বিরসা তরুণ। আর, বলবার কথা বিরসার অনেক আছে। তার কোনো কথা বানাবার দরকার পড়েনি।

এসব আগে ঘটে গেছে। তারপর বিরসা গ্রেপ্তার হয়। এখন অমূল্যবাবু খবর আনল, খুন্‌টি আর তামার থানায় বাড়তি কন্‌স্টেবল মোতায়েন করা হয়েছে। জগমোহন সিং আর

কোচাং-এর বাসিন্দাদের পাহারা দেবার জন্যে, কি ঘটছে না ঘটছে দেখার জন্যে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ ফোর্সের চল্লিশজন সেপাই চলে গেছে বন্দ্‌গাঁও।

রেভারেন্ড লাস্‌টিকে পাহারা দেবার জন্য একটি সৈন্য ডিটাচমেন্ট চলে গেছে মুরহু। রাঁচির ডেপুটি কমিশনার সেনাবাহিনীর একটি কোম্পানি চেয়েছিলেন। তাঁর ভয়, বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা সিংভূমের অন্যত্র আগুন ছড়াবে।

রাঁচির কমিশনার সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'চালকাড় ও অন্যান্য গ্রামে পাঁচ মাস ধরে স্পেশাল ফোর্স রাখলে পরে অশান্তি বাড়বে। গ্রামগুলো বড় ছাড়া-ছাড়া। গ্রামবাসীরা হত-দরিদ্র। স্পেশাল ফোর্সকে পোষা তাদের সাধ্যি নয়। আর কোনো-না-কোনো ভাবে তাদের ওপর চাপ পড়লে সর্বনাশ হতে পারে।'

তবে, মুণ্ডাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য যে "বিদ্রোহ" তাতে কমিশনারের সন্দেহ নেই। মুণ্ডাদের জমায়েত ও উত্তেজক আলোচনা উনি বন্ধ করতে চান। দশজন মুণ্ডা একত্র হলেই এক কথাই হবে। বিরসার ভক্তরা জমায়েত ডাকতে চাইবে। তারই পট্টির মান্‌কি, সরজুম্‌ডির ঠাকুর, আর চারপাশের জমিদারদের বলা হয়েছে কোনো কোল্‌ বা মুণ্ডা জমায়েতীতে যায় না, তা দেখা তাদের কাজ। খরসোয়ানের ঠাকুর আর সিংভূমের ডেপুটি কমিশনারকেও অনুরূপ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

অমূল্যবাবু আরও বলল, 'বিরসা, যত কথা তোমাকে বললাম, তাতে আমার চাকরি চলে যেতে পারে। কিন্তু তোমাকে বলা আমার কর্তব্য।'

—'কেন?'

—'জানি না। মনে হয়।'

—'আর কিছু জানলে?

—'ছোটলাটের কাছে খবর চলে গেছে সব।'

—'তাও জান?'

—'হ্যাঁ। তুমি তো জান ছোটলাট সব নয়?'

—'তার উপরে আরও আছে?'

—'হ্যাঁ। বড়লাট।'

—'বড়লাট সবার উপরে?'

—'ভারতে সবার উপরে।'

—'সে কি বলে?'

বড়লাট, সেকেন্ড লর্ড এলগিনের কাছে ছোটলাট, লেফটেনান্ট গভর্নরের উদ্বেগ বড় অবাস্তব, বড় অপ্রয়োজনীয়, বড় বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল।

বড় দূর সিমলা আর দিল্লী, বড় দূর খুন্‌টি, তামার রাঁচি থেকে। সিমলা ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। সেখানে লাটপ্রাসাদের বিশাল, ইন্দ্রপুরী সদৃশ বাড়িতে যত আলো জ্বলে, টেবিলে যত খাবার ও মদ সাজানো হয়, বাগানে ফুল ফোটাতে যত আয়োজন হয় তার খরচে সব মুণ্ডাদের সব খুটকাট্টি গ্রাম ফিরে দেওয়া যায়। সেখানে বসে থাকলে অবান্তর মনে হয় জঙ্গল—কালো, উলঙ্গ প্রায় মানুষ—তাদের খিদে—তাদের ঘাটোর

থালা—তাদের লবণের স্বপ্ন—তাদের নিষ্প্রদীপ পাতার কুটীর। না সেকেন্ড লর্ড এলগিন বুঝতে পারছিলেন না একটা বিশ বছরের অর্ধোন্মাদ মুণ্ডারী যুবককে নিয়ে এত কেন চিন্তিত হচ্ছেন ছোটলাট? কি বিদ্‌ঘুটে নাম। বিরসা মুণ্ডা! কোথায় থাকে এরকম সব নামের মানুষ? কেন এইসব বর্বর, অসভ্য নাম সরকারী রিপোর্টে জায়গা পায়? কেন এরকম ঘটে?

অমূল্যবাবুর কাছে সব শুনল বিরসা। ওর চোখের দৃষ্টি গাঢ় হয়ে এল, স্বপ্নগভীর।

বিরসা বলল, 'আর নয়। আর কথা বোলো না আমার সঙ্গে।'

'কেন বিরসা, কেন?'

'তোমার পথ, তোমার জীবন—আমার পথ, আমার জীবন হতে আলাদা।'

'জানি।'

'তাড়াতাড়ি বিচার করব, এ কমিশনারের দপ্তের কথা।'

'কি জানি।'

বিরসা কি ভাবতে ভাবতে বলল, 'যা লিখেছি, সব ভুলে যেতে হবে। মুণ্ডার অধিক মুণ্ডা হতে হবে আমাকে। তোমার পথ আলাদা।'

অমূল্যবাবু বেরিয়ে গেল।

কমিশনার যা চেয়েছিলেন তা হল না। আগস্টে বিরসাকে ধরে আনা হয়। কেস শুরু হতে অক্টোবর কাবার হয়ে গেল। অবশেষে একদিন মুণ্ডাদের জানিয়ে দেওয়া হল, মুণ্ডাদের সামনে বিরসার বিচার হবে। প্রমাণ হয়ে যাবে বিরসা কত বড় প্রতারক। প্রমাণ হয়ে যাবে বিরসা ঈশ্বর তো নয়ই, এমনকি অসাধারণ মানুষও নয়। বিরসা এক অশিক্ষিত, সামান্য মুণ্ডা।

১৩

তামারের হেড কনস্টেবল্ আর কোচাং-এর বুড়া মুণ্ডা বিরসা আর বীর-সাইতদের নামে নালিশ দাখিল করে। বন্দগাঁওয়ে বসে মীআর্স সেই অভিযোগের তদন্ত করলেন। তাঁর তদন্তের ভিত্তিতেই কেস দাঁড় করানো হল।

মীআর্স ডেপুটি কমিশনারকে জানালেন, বিরসার আন্দোলন আর সর্দারের আন্দোলন এক এবং অভিন্ন। মুণ্ডা সর্দার আর বিক্ষোবকারীরা বিরসার আন্দোলনে শামিল হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হেড কনস্টেবলকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে, তাতে কোচাং আর অন্যান্য জায়গার, মুণ্ডাদের খুবই সমর্থন ছিল। সব মুণ্ডারাই বিরসার দলে ভিড়েছিল। কোচাং-এর বুড়া মুণ্ডা যায়নি। ফলে তাকে মেরে ফেলা হবে বলে শাসানি দেওয়া হয়েছে।

লিখতে লিখতে মীআর্স ভাবলেন, বুড়া মুণ্ডা বলেছে, 'ধানীটা আমার দিকে অপলক চেয়ে দেখে, আমার উপর নজর রাখে। ওরে সবাই ডরায় সাহেব। ওর কুচিলা বাণ বড় ভয়ানক।'

মীআর্স লিখলেন, 'দেওকী পাঁড়ে আর সাউ মুণ্ডারী বলছে, বিরসা মুণ্ডাদের খেপায়নি।

শুধু বলেছে বোঙা-বুঙি পুজো না, ভাল হয়ে থাক। আমি মনে করি ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান্ট, দুটো মিশনের লোকরা যা বলছেন তাই ঠিক। বিরসা এখানে ফিরে এলে সর্বনাশ হবে। এখন অবস্থা আয়ত্তে এসেছে বটে, কিন্তু সামান্যতম উস্‌সানি পেলেই দলে দলে মুণ্ডা গিয়ে বিরসার সঙ্গে শামিল হবে।'

ডেপুটি কমিশনার রিপোর্টটি সত্যি বলে মেনে নিলেন। যেসব অপরাধের ভিত্তিতে বিরসার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জাহির করা হয়, সেই একই ভিত্তিতে বিচারের ব্যবস্থা করা হল। একবার ভাবলেন, বিরসা ও বীরসাইতরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে বলে জনসাধারণ অভিযোগ জানাচ্ছে—এই ভিত্তিতে বিচার করা হবে। তারপর ভাবলেন, না— সে-কেস দাঁড় করানো যাবে না।

তবে বিচারের জায়গা রাঁচি থেকে খুন্‌টিতে সরিয়ে আনা হল। বিরসার বিচার হবে খুন্‌টিতে মুণ্ডাদের সামনে। মুণ্ডারা বিরসার প্রবঞ্চনায় ভুলেছে। বিরসা ওদের ত্রাতা-পাতা-ঈশ্বর—এই মোহে মুণ্ডারা ভুলে আছে। এখন খুব সাধারণ লোকের মতো ওর বিচার করে জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া হবে বিরসা নগণ্য, সাধারণ লোভী প্রবঞ্চক।

২৪শে বিচার হবে। ২৩শে রাতে কর্নেল গর্ডন দেখলেন, দূরে-দূরে পাহাড়ের গা দিয়ে, কোল ঘেঁষে, নদীর তীর ধরে, বনের পথ দিয়ে সারি-সারি আলোর মিছিল আসছে। দেখে দারোগা জিগ্যেস করলেন, ও কি?'

—'হুজুর, মুণ্ডারা আসছে।'

—'মুণ্ডারা!'

—'হ্যাঁ হুজুর। কমিশনার সাহেব সেইরকমই বলেছিলেন। মুণ্ডারা আসুক, বিরসার বিচার দেখুক।'

—'এত মুণ্ডা!'

—'এখনো সবাই খবর পায়নি হুজুর। খবর পেলে এদিক-ওদিক একশো মাইল থেকে চলে আসবে।'

—'খবর পেল কি করে?'

—'আমরা এ-কথা, হুকুম মতো ক-টা গাঁয়ের মান্‌কিকে বলেছিলাম। ওদের তো আর টেলিগ্রাফ লাগে না হুজুর। পাহাড়ের উপরে উঠে, আগুন লাগিয়ে দেয়, দেখে সব জেনে যায়।

—'আসতে হবে তা জানায় কেমন করে?'

—'ওদের সব জানা আছে। লেখাপড়া জানে না, জংলী তো? তা কখনো তিনোটা পাঁজায় আগুন দেয়, কখনো দুটায়, কখনো চারটায় দেখে ওরা বুঝে নেয় রাঁচি যাবে, না তামার, না রোগোতা।'

—'এত মুণ্ডা আসছে!'

—'এ আর কি দেখছেন হুজুর। কাল দেখবেন কত আসে? বিরসাকে দেখবে জানলে সবাই আসবে। যারা আসছে, তারা দু-পাশে গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে আসছে। নিমেষে অন্যরা জেনে যাবে পথের সলুক।'

—'হাতিয়ার নিয়ে-টিয়ে আসছে না কি?'

—'হাতিয়ার তো ওদের সঙ্গের সাথী হুজুর। বনে যায়, বনের মধ্যে বাস করে, বলোয়া থাকে সঙ্গে। ওদের মেয়েরাও বলোয়া চালায় হুজুর। ধানী মুণ্ডার বোন এখন চাইবাসায় ভিখ মাঙে। সেবার ওর নাতিকে সাপে কাটল এমন সাঁঝে। ওঝার ঘর দু-খানা জঙ্গল পেরিয়ে। তা ছেলেটাকে পিঠে বেঁধে বলোয়া হাতে চলে গেল বুড়ি। আমরা পারি না হুজুর। বাঘ-ভালুকের ডর আছে, জিন বলুন, পরী বলুন, কি নেই জঙ্গলে?'

কর্নেল গর্ডন প্রমাদ গণলেন। 'বড় বিপদ হল তো?'

—'না হুজুর। বিরসাকে দেখতে আসছেই বই তো নয়।'

—'এখানে ওকে না আনলেই ভাল হত।'

—'আমরা সে-কথা বলেছিলাম হুজুর। এমনিতে ও-জাত মুখে রক্ত তুলে খাটবে কথা বলবে না। আমরা ওদের সামনে ভাত খাব, ওরা ঘাটো খাবে। একটা ছোট ছেলেও ভিখ মাঙবে না একমুঠো ভাত। কিন্তু ক্ষেপে গেলে—'

—'ক্ষেপে গেলে কি করবে?'

—'তখন মনিবকে কেটে ফেলতে ওদের বাধবে না। বন্দুক মারব, দুটা তিনটা লাশ ফেলে দেব। তবু ওরা আগাতেই থাকবে। মুখে কথাটি বলবে না। খালি আগাবে আর আগাবে। সে দেখলে আমাদের ভয় ধরে যায় হুজুর।'

—'হাতিয়ার নিয়ে আসছে, যদি ক্ষেপে যায়?'

—'না হুজুর। ওদের জমি নিয়ে চাষবাস করছি আমি। হেথা জীবন কেটে গেল, এদের ধাত জানি আমি। মুণ্ডারার মুখ পাথরপোরা থাকে। যদি ফাঁসিতে চড়ে, তবু মুণ্ডা কাঁদে না। সে মুখ দেখলে আপনারা বুঝবেন না। আমরা ঠিক জেনে যাব মুণ্ডা কি ভাবছে। আমি জানি ওরা এখন ভগবানকে দেখতে আসছে। ভগবান গেরেফতার হয়েছে থেকে গোটা মুণ্ডা জাতটা অশুচ পালন করছে। অশুচ অবস্থায় ওরা কাউকে মারবে না। আমি জানি।'

'তুমি ওদের বেশ বোঝ?'

—'হ্যাঁ হুজুর। থানায় জীবন কেটে গেল। বাপ হেথা কাজ করে গিয়েছে, তা বাদে আমি ঢুকেছি কাজে, আমি ওদের জানব না? আগে ওরা আমাদের ছটে, দশেরায়, হোলিতে কত এসেছে। এই জগমোহন সিং, সুরজ সিং এদের মতো লোকেরা ওদের ভিত-মাটি কেড়ে, বেঠবেগারী আদার করে, সুদের টাকার জন্যে কথায়-কথায় ওদের ধানক্ষেতে হাতি নামিয়ে দিয়ে, ওদের বিগড়ে দিল।'

—'পাজি বলেই বিগড়ে গেল।'

—'না হুজুর। তেমন ছিল না। থাকলে পরে কি, দেখুন না, ওরা হেথা কত-কত, ভদ্দরলোক কত কম এ অঞ্চলে। মুণ্ডারা পাজি হলে, মার-দাঙ্গা করলে ভদ্দরলোক টিকত একটা?'

—'তবু সাবধানে থেকো।'

—'হ্যাঁ হুজুর।'

সকালে দেখা গেল খুন্‌টি থানা-হাজত-আদালত ঘিরে বসে আছে শত শত মুণ্ডা। মেয়ে-বুড়ো-ছেলে-শিশু-কানা-খোঁড়া কেউ বাদ নেই।

তিরিশ জন মুণ্ডা পুরুষ এগিয়ে এল। পরনে সাদা ধুতি। হাতে কোনো অস্ত্র নেই, মাথা উঁচু, মুখের ভাব ব্যঞ্জনাহীন।

—'আর্জি আছে।'

কর্নেল গর্ডন, ডেপুটি কমিশনার, এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। রুক্ষ গলায় বললেন, 'কিসের আর্জি?'

—'আমরা ধরতি-আবাকে দেখতে চাই।'

—'কে ধরতি-আবা?'

—'যাকে তোমরা ধরে রেখেছ।'

—'কেন দেখতে চাও?'

—'পূজা দিব, ফুল দিব, বহু, বহুকাল মোরা অশুচ হয়ে আছি হে। তারে দেখব।'

গর্ডন দেখলেন মেয়েদের হাতে পাতার ঠোঙায় ফুল। তখনি তাঁর মনে হল একটা বিশাল দেওয়াল উঠে যাচ্ছে সামনে। কিছুতে তিনি সে দেওয়াল টপকে ওদের কাছে পৌঁছতে পারছেন না। এখনি দেওয়ালটা ভেঙে দেওয়া দরকার। মনে-মনে গাল দিলেন কমিশনারকে। বিরসার ওপর ওদের অন্ধ ভক্তি, অচল বিশ্বাস ভাঙতে হবে। কেমন করে ভাঙা যাবে?

তিনি হাত তুললেন। —'শোনো। এখন বিচার চলছে। কাছারি ভাঙলে ওকে যখন হাজতে আনা হবে, তখন ওকে দেখো।'

—'আমরা ভগবানকে দেখব।'

—'ভগবান নয়, তোমাদের মতো ই সাধারণ মানুষ বিরসা। ভগবান বলছ কেন? বল বিরসাকে দেখব।'

তিরিশ জন মুণ্ডা পেছন ফিরে চাইল। একশো জন মুণ্ডা ভিড় থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল। বলল, 'কি বললে সাহেব?'

—'বিরসা ভগবান নয়।'

—'বিরসা ভগবান নয়?'

—'না।'

ভরমি মুণ্ডাকে চিরদিন সবাই বিপদে-আপদে হাঁক দিতে ডাকে। ভরমির গলা বাজের মতো। ভরমি হেঁকে বলল, 'আবার বল।'

—'বিরসা ভগবান নয়।'

—'কে বলে সে ভগবান নয়?'

—'তবে তার বিচার হচ্ছে কেন?'

—'সে মোদের গুরু, ভগবান, সর্দার। তুমি কি জানবে সাহেব, সে কয়েদ হয়েছে হতে মোরা অশুচ হয়ে আছি। কেও তেল ছুঁই না, শিকার করি না। মেয়ে-পুরুষে হাত ধরি না।

সে মোদের ভগবান। মোদের সাথে-সঙ্গে জীইবে মরবে। কেমন করে বল ভগবান নয়? হ্যাঁ ধানী দুই কথা বল্‌ না কেন? তুই বল্‌? তুই সবার চেয়ে বুড়া, তুই বল্‌।'

—'আমি আর কি বলব রে ভরমি, সাহেবের কথা কিছু বুঝি না যে! আমি বোকা মুণ্ডাটা সাহেব, আমি শুধাই, যদি বিচার করবে তবে তোমরা, সরকার, বিচার কর না কেন? কেন তারে দিন মাস হাজতে রেখে দিয়েছ?'

সাহেব চোখ কুঁচকে ওদের দিকে চাইলেন। তারপর দারোগাকে ডাকলেন। বললেন, 'ওদের বুঝিয়ে বলো।'

'কে বুঝাবে? ওই ভরত দারোগা? ও কি বুঝাবে আমাদের?'

জনতার মধ্যে চাপ। কিন্তু বেপরোয়া, উদ্ধত, ব্যঙ্গের হাসি শোনা গেল। দারোগা গলা সাফ করে বলল, ' তোমরা ঘরে চলে যাও হে, নয়তো ঠাণ্ডা মেরে বসো।'

—'তুমি বসগা।'

—'নয়তো ঘরে যাও। কাছারি ভাঙ্গবে তিনটায়, তখন দেখা পাবে।'

—'কেন?'

—'বিচার হচ্ছে যে?'

—'বিচার এখন—এখন খতম কর। আমরা ভগবানকে দেখব। নয়তো মসিদাসকে জান, ও বড় রোখা ছেলে।'

—'মসিদাস, তুই ওদের বুঝা।'

মসিদাস বলল, 'আমি নিজে বুঝলাম না, আমি বুঝাব! দেখ দারোগা, ভগবানরে না দেখাও যদি, আমি সয়ে-রয়ে থাকব না। মোকে তুমি জান।'

—'হেই! হেই! কাছে আগাস কেন? মারবি?

— 'মারব কেন? আমার হাতে কি আছে?'

—'কাছে আগাস কেন মাতাল হয়েছিস?'

—'মাতাল তোর বাপে হয়েছে?—মুণ্ডা আমি, বিরসাইত হয়ে মদ খেয়ে ভগবান দেখতে এসেছি?'

—'ধানী, তুই মসিদাসরে ডাক্‌।'

—'ডাকব কেন? এখন বিচার কর্‌। বিচার করে মোদের ভগবানরে ফিরায়ে দে। না হলে মোর গলাটা কাট। নে। কাট। মুণ্ডার গায়ে মারতে তো তোর হাত খুব উঠে।'

—'হুজুর। এরা রুখে গেল যে!'

মসিদাস চেঁচিয়ে বলল, 'আরে, ওধারে চোরের মতো চায় কে? জগমোহন সিংরে এনেছ কেন? সাক্ষী দিয়া করাবে? রাজসাক্ষী করাছ?

ধানী মাটিতে থুথু ফেলে বলল, 'বাবু জগমোহন সিং! বাবুরে বাবু না বললে বাবুর গরম কত হয়! তখন বাবু হাতি চেপে বসে আর এ—ই লম্বা হাতির সুঁড়পারা চাবুক নিয়ে মুণ্ডাদের কি মারে! 'বাবু' বল্‌, কি মসিদাস?'

মসিদাস সত্যি রোখা ছেলে। বলল, 'দিকুরে আমি 'বাবু' বলি না।'

পাত্রা মুণ্ডা, ভরমি মুণ্ডা চেঁচিয়ে বলল, 'বিচার হবে না। বিচার বন্ধ কর।'

ভীষণ গোলমাল শুরু হয়ে গেল। মুণ্ডারা সবাই চেঁচাচ্ছে, কথা বলছে। ভরমি বলল, 'আমার সাথে-সাথে চেঁচা তোরা। ভগবান জানুক মোরা এসেছি।'

ভরমি আকাশ ফাঁটিয়ে উঠল, 'ভগবান!'

মুণ্ডারা চেঁচাল 'ভগবান।'

—'মোরা এসেছি ধরতি-আবা!'

—'মোরা এসেছি।'

—'তুমি হাজতী হতে মোরা অশুচ হয়ে আছি।'

—'অশুচ হয়ে আছি গো!'

—'তুমি এলে মোরা স্নান করব।'

—'তুমি এলে!'

গর্ডন ঘোড়া ছুটিয়ে কাছারি চলে গেলেন। বিচার বন্ধ হয়ে গেল। একদল পুলিশ কোড়া হাতে, হাতকড়া হাতে এগিয়ে এল। একজন পুলিশ ঘোড়া নিয়ে রাঁচি চলে গেল।

পুলিশের হাতে হাতকড়া। এদিকে-ওদিকে চেয়ে পাত্রা ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'মোর হাতে কড়া দাও, আমি ভগবানের সঙ্গে জেহেলে থাকব!'

—'মোর হাতে কড়া দাও।'

—'জেহেলে থাকব! আমাকে ধর।'

পুলিশ হাতকড়া পরাতে লাগল। ধরা দেবার জন্যে কালো-কালো শরীরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মাঝে মাঝে কোড়ার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

রাঁচি থেকে সৈন্য এল। বিরসাকে নিয়ে চলে গেল রাঁচিতে।

রাঁচিতে মুণ্ডারী-নবিশ ডেপুটিবাবু। কালীকৃষ্ণ মুখার্জীর এজলাসে বিচার হল। যারা গ্রেপ্তার হল, সকলের। কালীকৃষ্ণ মুখার্জী সকলকে করে খালাস দিলেন। রায়ে লিখলেন, 'মুণ্ডাদের গণ্ডগোল বাধাবার কোনো অভিসন্ধি ছিল না। তাদের কথাবার্তা ডেপুটি কমিশনার বোঝেননি। আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

কমিশনার, ডেপুটি কমিশনারকে বদলি করে দিলেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার যে অভিযোগ আনলেন, তা নাকচ করলেন না। কালীকৃষ্ণ মুখার্জীর রায়টি, স্বীয় ক্ষমতাবলে খারিজ করে দিলেন। আবার মুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করা হল।

নতুন ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে বিচার হল। রায়ে বিচারক বললেন, সর্দার-আন্দোলনে ও বিরসার আন্দোলনে যোগ আছে। মুণ্ডা জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ, সে-বিক্ষোভে প্ররোচনা যুগিয়েছে বিরসা। বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দরকার ছিল। তাহলে তারা ভণ্ড ঈশ্বরবেশী, হৃদয়হীন প্ররোচক, এদের আর অনুসরণ করত না। বড় দুঃখের কথা, সে-শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না। বিরসা প্রচারক, বিক্ষোভের স্রষ্টা। সে মুণ্ডাদের মনের ভেতর ব্রিটিশ সরকারের ওপর অনাস্থা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফলে আজ হাটে-বাজারে মুণ্ডারা বলে বেড়ায় সরকার খতম হয়ে গেছে। এখন মুণ্ডাদের বিদ্রোহে প্ররোচনা দেবার জন্য সবচেয়ে বেশি যে দণ্ড আইনমতো দেওয়া চলে, তাই দেওয়া হোক।

১৮৯৫ সালের ১৯শে নভেম্বর বিরসাকে দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। অন্য মুণ্ডাদের বিশ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হল।

বিরসাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলা হল। বিরসা মাথা নাড়ল। রায় শুনে ভরমি বলল, 'এ কি হল ভগবান?'

বিরসা বলল দু-বছর সময় কি অনন্তকাল ভরমি?'

—'সরকার জুলুম করবে খুব।'

—'করতে দাও। কবে করে নাই।'

—আবার মুণ্ডারা ক্রীশ্চান হতে গেল দলে দলে। ধানী বলল, 'হবে না কেন? দু-বছর তো বাঁচুক। তা বাদে দেখা যাবে।'

তবু অনেকে গেল না। হফ্‌ম্যান মাথা নাড়লেন চার্চের দরজা সদাই খোলা থাকে। সাহেবদের ভগবান শরণাগতকে ফেরান না।

ব্যাপটিজ্‌মের পবিত্র জল ছেটাতে ছেটাতে পলুস প্রচারক বলল, 'কেন আসছিস বাপু সকলে? ফের তো যেয়ে ভগবানের চেলা হবি।' জান্‌কি মুণ্ডানী ধমক দিয়ে বলল, 'তোর তাতে কি রে পলুস? তুই চাকর, জল ছিটাতে বলেছে, ছিটা। অত কথা কিসের?

—'জল ছিটাব কোথায়? মাথা হুড়া করে গির্জা এসেছিস, গায়ে খড়ি উড়ছে।'

—'কোনো মুণ্ডার ঘরে তেল নাই।'

—'জঙ্গলে কুসুম বীজ নাই?'

—'আছে। মোরা তেল বানাতে বিস্মরণ হয়ে গিয়াছি।'

পলুস মাথা নাড়ল। বলল, 'তোমরা বড় চালাক হে। বিরসা হাজতে তাই অশুচ হয়ে আছ।'

—'ধুর বেটা। তুই ছিটাচ্ছিস জল, সালী ছিল না?'

—'সালী আসে নাই?'

—'না।'

—'কেন?'

—'তোরে বলবে কেন আসেনি! যা, যেয়ে সুধা।'

—'নে জল নে।'

১৪

সালীর কথা জানতে চেয়েছিল পলুস প্রচারক। সালী ক্রিশ্চান হতে যায়নি। এখন শীতকাল। জঙ্গলে পাতা ঝরছে তো ঝরছেই। সারাদিন ঝরঝর-সরসর শব্দ শোনা যায়। জঙ্গলে বুনোকুল পেকেছে। কুল, পাকা আমলকী, করঞ্জা খেতে ভালুক আসে, হরিণ আসে। প্রাণ হাতে করে সালী কুল কুড়োচ্ছিল। এক ঝুড়ি কুল কুড়োলে দু-দিন খেয়ে বাঁচবে।

ভরত দারোগা একটু দূরে বসেছিল। সালীর ওপর নজর রেখে ও আজ ক'দিন ধরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। সালীর ওপর নজর রাখলে ধানীর খোঁজ মিলতে পারে। রাঁচি থেকে

পালিয়ে এসে ধানী সালীর ঘরেই উঠেছিল। জেল খাটছিল। কয়েদীদের দিয়ে পাথর কেটে রাস্তা বানাবার কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিল জেল দারোগা। ধানী সেখান থেকে পালায়।

ভরত বলল, 'ধানীকে ধরা করালে তোর বিশ-পঁচিশ টাকা মিলত রে। ভুল করে বসলি।'

সালী সোজা হয়ে দাঁড়াল। পেটে সন্তানের ভার, শরীর শ্রান্ত অবসন্ন। অবসন্ন গলায় বলল, 'কতবার বলেছি হে, কে, কি কিছু জানি নাই। আমি কি জানি ও বিরসাইত হয়াছে? বুড়াটা! জল চাইল জল দিলাম। খালভরা! ছাগল-ঘিরা মাচানের উপর শুয়ে রইল। বিহানে পালাল। তা বাদে শুনি বুড়ো ছিল বিরসাইতটা। জানলে তারে ঘরে ঢুকাই? পঁচিশ টাকা কি হে এখন পঁচিশটা ঢেবু পয়সা পেলে আমি বাঁচি। ধানীরে দেখলে আমি ওর পা ভেঙে দিব। তা বাদে তোমারে খবর দিব।'

—'বিরসাইতদের উপর রাগ কেন রে, তোর মরদ ডোনকাটাও তো যেয়ে বিরসাইত হয়েছিল!'

—'হয় নাই আবার! ধান বিচে বিরসাইতদের খাওয়াছিল কত। কাপড় ফর্সা চাই, গায়ে হলুদ চাই, সে কত বাহানা। তা বাদে দেখ মোর কোলে একটা, পেটে একটা। তুই বুড়াটা জেহেলে গেলি। এখন আমার হাল কি হল? তোমরাও বা মানলে কই, মোর মরাই ভেঙে সমান করে দিলে। আমার কি দোষ বল?'

—'তারে সামাল করলি নাই কেন?'

—'করলে সে শুনত! মুণ্ডা পুরুষদের জিদ কত, জান না? বলে কি ভগবান তোরে সব দিবে। এই যে সব দিয়াছে ভগবান। ঝুড়িটা দিয়াছে, কুল টোকাই। বলোয়া দিয়াছে, ভালুক খেদা করি।'

—'কি শরীরটা কি হল তোর! তোর পারা রূপ কার আছে বল!'

—'কপাল পুড়া যে, শরীর থাকে?'

—'তাই তো বলি!'

—'কপাল পুড়া না হলে বাপ ডোনকারে মান্‌কি দেখে বিয়া করাল? সে ছিল বুড়া, আমি তার নাতিনটার মত না কি বল?'

—'তোরে কি বিয়া করবে বলেছিল বিরসা?'

—'না গো না! সে শঙ্করা গাঁয়ের পরমী। ধুরাই মুণ্ডার বোন। ধুরাই খুব বিরসাইত হয়াছিল। বিরসা বলেছিল বোনেরে বিয়া করবে। বিয়া অমন নামে-নামে। স্ত্রী-পুরুষ হবে না উরা? দুজনে ভগবানের কাজ করবে।'

—'আরে! পরমীটা তো ঘুরে কনুর সাথে।'

—'কোন্ কনুর কথা বল্?'

—'বিরসার ভাই কনু নয় রে। এ সে কনু পহান্। কনু আর পরমী সর্বদাই সাথে-সঙ্গে ফিরে।'

—'কনুরে পরমীর সেই কবে মনে ধরেছে। যখন এতটুকা তখনি বলত আমি কনুরে আরান্দি করব।'

—'বিরসা সব জেনাশুনা সেই মেয়েরে চাইল?'

—'তুমি বুঝবে না গো। বিরসা বলাছিল, ধুরাই, তোর বোনেরে আরান্দি করতে পারি যদি তোর বোন মোরে পুরুষ বলে না চায়। আমার কাজ করে।'

—'ওঃ কি আমার শেঠ-মহাজন রে। ভিখারী মুণ্ডা। তার মুখে যত বড় বড় কথা।'

—'আমিও ত তাই বলি দারোগা! তুই ভিখারীটা, তুই মুণ্ডাটা, তোর মুখে বড় বড় কথা কেন?'

—'মেয়েটা কি বলল?'

—'বলে দিল, যা যা, আমি কনুরে বিনা কারে অ চাই না। কনু আমার মনের মানুষ।'

—'বলল?'

ভরত দারোগা মাথা নাড়ল বার বার। বলল, 'তোরা ত ভাল কথা শুনবি না। দেখ, মুণ্ডাদের মরণ কিসে।'

—'কিসে? আমি বলি পরমী-কনু-বিরসার আরান্দির কথা। ই-তে মরণের কথা কোথা হতে পেলে?'

—'বাবা, গাছের ভিতর ফলের কথা। ফলের ভিতর গাছের কথা, মোরে বলতে দিবি ত?'

—'বল। দারোগা তুমি। ব্বাপো রে! কত ক্ষমতা তোমার! তোমার মুখের কথা শুনলেও লাভ আছে।'

—'শোন্—মুণ্ডাদের মরণ কিসে, পুরুষগুলো হটাকটা, নরম কথা বুঝে না বলে না। আজ বলে খাজনা দিব না, কাল বলে বেঠকগারী দিব না, পরশু বলে মহাজনকে মানি না, বাপুরে! অমন হাঁকডাক হাতির সাজে, পিঁপড়ার সাজে কি?'

সালী মাথা নাড়ল। এ ওর মনের কথা। বলল, মুণ্ডা মরদগুলো অমুনি বটে। কথা নয় ত সিঁয়াকুলের কাঁটা যেন।'

—'তা দেখ, পুরুষ হল শিবের অংশ। তারা রুঠাসুঠা হলেও হতে পারে। এই আমিই ত বউকে পিটাই কত। কিন্তু বউ একটা কথা বলে না। মুণ্ডা মেয়েগুলোও যেন কেমন? এই যে কথাটা বললি তুই? ই কি মেয়েছেলের কথা? এরে আরান্দি করব, ওরে মনে ধরেছে, ওরে মনে ধরে না—লাজসরম নাই তোদের? কাপড় পরবি উঁচা করে, চলবি বেটাছেলের মত— মেয়েছেলা যখন মেয়েমরদ হয়, তখন জেতের মরণ।'

—'তা যা বলেছ।'

—'হ্যাঁ রে, তুই যে বনে বনে ফিরিস, তোর ছেলেটা কোথা থাকে? কার কাছে?'

—'মার কাছে রেখে আসি।'

—'দিন ভোর?'

—'কোথা থুব? সাথে লয়ে বনে বনে ঘুরব? মোরে ত কোন্‌দিন বাঘে খাবে। ওরেও মারবে?'

—'ইস্‌স্‌। কি কষ্ট রে তোর। আহা, তোর ঘরে ছিল ধানের গোলা, দেখেছি ত আগে আগে।'

—'স—ব গিয়াছে।'

—'যাবে না? বিরসাইত হলি কেন?'

—'আমি?'

সালী রেগে আগুন হয়ে গেল। বলল, 'আমি হব বিরসাইত? আমার সোনার সংসারে আগুন লাগায়ে দিয়াছে বিরসা। আমার মরদটা বোকাটা— সে যেয়ে বিরসার নামে নেচে উঠল। কোথা হতে আকালের পোকপতঙের মত মুণ্ডা ধরে ধরে আনে। বলে, সালী! ই-রা সব বিরসাইত। লে ভাত রাঁধ্ সবে খাবে।'

—'বলিস কি?'

—'আর কি বলি! মোর ছিল ধানের গোলা। আকালে-অজন্মায়, খরায় আমি মুণ্ডাদের ধান দিয়াছি কত। করম পরবে লাচতে যাব, ত সকল মেয়ে আমার ঘরে আসবে। আমি সকলের মাথায় দিব তেল-কাঁকই, হাতে দিব গালার চুড়ি। কোনোদিন ঘাটো খাই নাই, বনের পথে হাঁটি নাই, ছিঁড়া বস্ত পরি নাই, রুক্ষ চুলে থাকি নাই।

—'আর আজ?'

—'আজ সকল কষ্ট ওই বিরসা হতে। ওই বিরসা হতে যত কষ্ট।'

—'ভগবান তোদের! ধরতি-আবা! তারে বিরসা বলিস?'

—'সুগানার ছেলা বিরসা ভগবান। তাহলে ত পিঁপড়াও হাতি, বুরুডিও রাঁচি শহর।'

সালী কুলের ঝুড়ি তুলে নিয়ে বুরুডির পথ ধরল। ভরত ভাবল ভরা পোয়াতি— তবু হাঁটে কি দুলে দুলে, শরীরের গড়ন কি ভরা-ভরন্ত। সাধে কি থানার সবাই বলে, মুণ্ডা মেয়েগুলো কালো আগুন। দেখলেও শরীরে রক্ত জ্বলে ওঠে। কিন্তু এমন বেয়াড়া বদজাত, মেয়েদের হাত ধরলে বলোয়া দিয়ে কাঁধ থেকে মাথা নামিয়ে দেবে।

ভরত পেছন পেছন যেতে যেতে বলে, 'অ সালী! একটা কথা শুন্।'

—'বল না গো!'

—'আজকের রাতটা তোর গোহালে থাকতে দিবি!'

—'কেন?'

—'এত রাত্রে ফিরব? ভয় লাগে।'

—'দিব।'

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ হাঁটল।

হঠাৎ হাত থেকে ঝুড়ি নামাল সালী। পেট খামচে ধরে বসে পড়ল।

—'কি হল রে সালী?'

—'ও রে ব্বাপোরে! মা রে!'

—'হল কি?'

সালী শুয়ে পড়ল কাত হয়ে? বলল, 'পেটে দরদ উঠলো গো দারোগা, বুঝি কি হয়া পড়ে!'

—'বলিস কি?'

—তুমি যাও, তুমি যাও গো।'

—'তোরে ফেলে থুয়ে যাব?'

—'ই সময় পুরুষ ছেলা কাছে রয় না, রইতে নাই। তোমার বউ নাই ঘরে? তুমি জান না?'

—'তুই একা যে!'

—'শোন দারোগা—হো—ই গ্রাম দেখা যায়। তুমি যেয়ে মানী পহানীরে ডাক। আর কেও যেন না শুনে পহানীরে ডাক।'

'পহানী ওষুধ জানে, আরাম করবে, ছেলে হলে খালাস করবে। আর এক কথা।'

—'কি?'

—'বুরুডিতে থেক না। বুরুডিতে মানুষ নাই কেউ। বিরসার কারণে পুলিশ এসে সব খেদা করাছে। যারা আছে, তারা জানোয়ার হয়া গিয়াছে। পুলিশের নামে খ্যাপাখিপ্ত। রাতে-ভিতে গ্রাম লুঠে, পুলিশ মারে। তুমি রইলে তোমারে ত মারবেই, মোরেও মারবে।'

—'বলিস কি? মারবে?'

—'হ্যাঁ গো! দেখ, এখনো আকাশ রাঙা, আলো মরে নাই। লাতু গ্রামে চলে যাও। সেথা কোনো ভয়ভিত নাই।'

ছুটতে ছুটতে চলে ভরত দারোগা।

ও চলে যেতে চুল, কাপড় গা থেকে ধুলো ঝেড়ে উঠে বসল সালী। পেটকাপড় খুলে এক বোঝা তীরের ফলা নামাল মাটিতে। বারালো ইস্পাতের লোহার ফলা। কুচিলার কালো বিষে ইস্পাতের সূচীমুখ মুণ্ডারী যুবতীর মতো কালো। মুণ্ডারী যুবতীদের মতোই লোভনীয়, মোহনীয়, উদ্ধত।

কুলের ঝুড়ি উপুড় করে ঢালল মাটিতে। তারপর ঝুড়িতে ফলাগুলো রেখে, ওপর দিয়ে কুল রাখল। তারপর কুল খেতে লাগল।

মানী পহানী ছুটতে ছুটতে এল।

সালী বলল, 'এত দেরি কেন? আমার বলে ব্যথা উঠেছিল জানিস না।

—'ব্যথা ত উঠল, ছেলা কোথা?'

—'ওই ঝুড়িতে।'

—'তুই কোথা যাস?'

—'আর ও তীর আনি।'

—'আবার যাবি?'

—'যাব না? কালও ত ভরত আসবে। ওরে পেট দেখাতে হবে না? ও পাছু ছাড়বে না?'

—'কেন পাছু ধরে আছে বল্ ত?'

—'কেন আর? যারা পলায়ে আছে, তাদের ভাত জল দিবে মেয়েরা, রাখবে, তা ত জানে। ওর আশা, পাছে পাছে ফিরলে তারাদের সন্ধান পাবে।

—'এই আঁধারে আরও যাবি?'

—'ধানী বসে থাকবে।'

—'তবে যা।'

—'ভরত চলা গিছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ডরায়েছে খুব?'

—'আমিও ভয় ধরায়ে দিয়াছি। বলাছি আকালে সব ক্ষেপা হয়া আছে। দারোগা দেখলে মারবে নিশ্চয়। মোরা কজনা মেয়াছেলা আছি। তোমারে ঘর দিয়াছি জানলে মোদের মারবে। তা ডর খেয়ে ছুটে পালাল।'

—'পলাক। লাতু গ্রামে কেও ওরে থাকতে দিবে না। আঁধারে পলাক ভাতুকাডু।'

—'পথে বাঘে খাবে।'

—'বাঘ দারোগা খায়? দারোগাদের সবাই ডরায়। বনের পশুর প্রাণে ডর নাই?'

—'হা তোর প্রাণে ডর নাই? এই আঁধারে আবার যাবি, আর আসবি?'

বিরসার তরে তোর এত—

—'চুপ কর।'

—'তুই মোরে বল্ সালী। এই নিমাগিমা আঁধার, কেও কারো মুখ দেখে না, তুই মোরে বল্? আমি ত বুড়াটা, মরা গাছের গুঁড়ির মত শরীর, মোর পেটের কথা পেটে থাক, কাকপক্ষী জানে না।'

—'কি কব?'

—''বিরসাকে শুধু ভগবান বলে এমন করিস? সি দলমলা ছেলা, তু দলমলা মেয়া—'

—'চুপ কর।'

—'সালী ধমক দিল। বলল, 'অমুন কথা কারো ভাবতে নাই মানী, মোরও ভাবতে নাই। ভাবলে পরে মহাপাপ।'

—'কি? ভগবানের সব ভাল। শুধা ই-গুলান্ আমি ভাল দেখি না।'

—'কি।'

—'এই লাচ-গান-মৌয়া-তাড়ি-ফুলের সাজ-স্ত্রি পুরুষে ভাব-ভালবাসা—সব নিষেধ করা দিল।'

—'পুরানো পথ না ছাড়লে তার পথ ধরবি কি করা। ই ফাল্গুনেও শাল ফুলের গন্ধে মন মৌয়া মেতে যেয়াছিল। বনে কত ফুল রে মানী। একটি তুলি নাই। চুলে পরি নাই। করমের দিনে লাচি নাই একা বনে।'

—'ই বড় কষ্ট। মোর পায়ে বল নাই। তবু লাচতে বল, লাচব খুব।'

—'তুমি বুড়ো তবে যুবা কে?'

মানী হাসল, ঝুড়ি মাথায় তুলল। সগর্বে বলল, 'পহান্ যতদিন ছিল। তারে কাঠ কাটতে দিই নাই। এখনো কুড়াল দিয়ে একোটা গাছ ফালা করে দিতে পারি। তোরা পারবি না।'

—'এখন যা মানী, আঁধার হয়।'

—'তুই যাবি না?'

—'এই ত যাই।'

বাতাস চমকে, বাতাসে বিঁধে যেমন তীর ছুটে যায় তেমনি করে সহসা যেন উড়ে আঁধারের বুকে মিলিয়ে গেল সালী। অন্ধকার অরণ্যের আত্মার মতো সহজে ছুটে চলল। এ জঙ্গল, এ পথ, সব ওর চেনা। নিজের শরীরের মতো চেনা। জঙ্গলের বুকে নির্জন কুণ্ডীর জলে ও যখন স্নান করে, তখন স্নান করার আগে নিজের নগ্ন শরীরের ছায়া দেখে নেয় জলে। সেই নিথর প্রতিবিম্বের প্রতিটি রেখা ও ভাঁজে, উঁচু-নিচু রেখাগুলি ওর চেনা, আর তেমনি চেনা, এ অরণ্য। পথ ছেড়ে জঙ্গলের গহীনে ঢুকল। পাহাড়ের ঢাল ধরে নামল। ঢালের নিচে নদী—এখন শুকনো বুক তার, শুধু ক্ষীণে বয় রুপোলি জল। নদীর কিনারে কিনারে পাহাড়ের ঢালে গুহা। গুহায় ঢুকে গেল ও কাঁটাঝোপের ঝাঁপ সরিয়ে।

—'হ্যাঁ খুব কষ্ট করে এসেছি। ভরত পাছু নিয়েছিল গো। ছাড়তে চায় না মোটে। কত ভুজংভাজং দিয়ে তবে আসতে পারলাম। উ শালাকে আমি একদিন বলোয়া ভুঁকে দিব।

—'ভুলায়ে ভালায়ে হেথা লয়ে আয়।'

—'না না। দারোগা মারলে গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালায়ে দিবে।'

—'তাও ত সত্যি?'

—'তীরের ফলা?'

—'এই যে!'

—'দাও। বেঁধে রেখাছ?'

—'হ্যাঁ।'

ধানীর হাতে বলোয়া সুন্দর চলে। বলোয়া আর চকমকি থাকলে ধানীর আর কিছু দরকার হয় না। বর্ষাকাল হলে ধানী জঙ্গলের ঝোপ কাটতে কাটতে ঢুকে যাবে। বলোয়া দিয়ে গাছের ডাল ছুঁচোলো করে তাই ছুঁড়ে শুয়োর বা হরিণ গেঁথে ফেলবে। সেবার মুল্‌কি লড়াইয়ে জোতদারের ঘর-খামার-মরাই জ্বালিয়ে দিয়ে ও যখন জঙ্গলে পালায়, তখন বলোয়া দিয়ে ডালপালা কেটে গাছের মগডালের কাছাকাছি সুন্দর মাচা বেঁধে ফেলেছিল একটা। বেশ কিছুদিন ছিল সেখানে।

বলোয়া দিয়ে ডাল কেটে, তীরের ফলার আকারে কেটে ও সুন্দর ফলা বানিয়েছে। সালীকে দিল সেগুলো।

'সালী বলল, 'আজ কি খেয়েছ?'

—'খরা মারছিলাম একটা। খাবি? নিয়ে যাবি একটু?'

—'না। আমার উঠানেই ঘুরে, ধরি ফাঁদ পেতে।'

—'ঘর যা।'

—'হ্যাঁ, যাই। ছেলেটা আছে।'

—'কাল লবণ আনিস।'

—'আনব।'

—'হাঁসুটা আনিস।'

—'আনব।'

—'আঁধার হয়ে গেল যে?'

—'ভগবানের নাম কড়ে চলে যাব।'

অন্ধকারে মিশে ফিরে চলল সালী। এখন অন্ধকারে ভয় করে না। কোনো কিছুতে ভয় করে না। আগে করত। এখন শুধু মনে হয় এও দিন দিন নয়, এখন যা ঘটছে, যেভাবে দিন কাটছে, সব অলীক হয়ে যাবে। সত্যি হয়ে থাকবে শুধু বিরসার ফিরে আসার দিনটা। বিরসা এলে সব পালটে যাবে।

বহুদিন ধরে ওর মনে যেন অন্ধকারে ভরে থাকত। ছেলেবেলা থেকে সালী শুনে এসেছে ও বড় সুন্দরী। ওর বিয়ে হবে, দেখার মতো জামাই আসবে। কিন্তু ডোন্‌কার সঙ্গে আরান্দি হতে মনে সুখ ছিল। ডোন্‌কার ততদিনে দুটো বউ মরে গেছে। একটা পট্টির মান্‌কি ডোন্‌কা। ডোন্‌কার পট্টিতে এগারোটা গ্রাম।

গ্রামও তেমনি, জঙ্গুলে গ্রাম। কোনোটায় দশ ঘর লোকের বাস, কোনোটায় বিশ ঘর। যারা থাকে তাদের অবস্থাও তেমনি। ঘাটো জুটলে নুন জোটে-না। তবুও ডোন্‌কার অবস্থা ওরই মধ্যে ভাল। বয়স ওর অনেক। তবে সব বলে কয়ে ও সালীকে ঘরে এনেছিল। সালীর বাবাকে বলেছিল, 'আমি কতদিন জীইব বল? সব তোমার মেয়ে পাবে।'

সালীর বাবা আর মা সেই থেকেই এই গ্রামে উঠে এল। বাবা মরেও গেল একদিন। সালীর মনে সুখ হল না। নতুন বিয়ের সুখ হল না কোনো। কিন্তু পেটে ভাত, পরনে কাপড়, মাথায় তেলের বড় ভঁরসা। বুড়ো বরের দুঃখ ভুলে গেল সালী।

ক্রমে সে সুখও গেল। ডোন্‌কা একদিন সাদা কাপড় পড়ে, কপালে হলুদ মেখে ঘরে এল। সঙ্গে আরও চারটে মুণ্ডা। বলল, 'এদের ভাত রাঁধা কর্।'

—'কেন?'

—'এরা বিরসাইত। আমি বিরসাইত হয়াছি। বিরসাইতে বিরসাইতে ভাই হয়। আমার ভাইরে আমি ভাত দিব।'

বিরসাইতদের খাওয়াতে, দান করতে, ধানের টাল ছোট হতে লাগল। যখন তখন মানুষ আসতে লাগল। কথাবার্তা ওদের গোপনে হয়। তাই সালী আর ছেলেকে ডোন্‌কা অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিল থাকতে। সালীর মনে জ্বালা ধরল। একি সর্বনেশে বুদ্ধি ডোনকার? পুজোপার্বণে ও মুণ্ডা প্রজাদের প্রণামী চাল-মুরগি ফেরত দিয়ে দিচ্ছে, চাষবাস তুলে দিচ্ছে? তখন ও গাল দিতে শুরু করল। নিজের বাপকে, ডোন্‌কাকে, ভাগ্যকে। শেষে ডোন্‌কা একদিন পালাল। বলল, ভগবানের কাজে চললাম রে!'

বিরসার কাছে গিয়ে বসে রইল ডোন্‌কা। হরিণের পাল এসে সালীর কচু খেত। খেত-খামার তছনছ হয়ে গেল। রাগে জ্বলতে জ্বলতে সালী বিরসার কাছে গেল মান্‌কির বউ। তাই চুলে তেল মেখে, খোঁপা বেঁধে, খোঁপায় ফুল গুঁজে ফর্সা কাপড় পরে গেল। মনে জ্বালা ওর চলনে-বলনে ফুটে বেরোচ্ছিল।

বিরসা বলল, 'তুমি ডোন্‌কারে গাল দিও না। ও আমার কাজ করে।'

—'হা রে তোমার কাজ! সব উড়ায়ে পুড়ায়ে দিল। ছেলেটারে দেখে না, সব নাশ করে দিল যে! গাল দিব না?'

বিরসা নেমে এল উঠানে। ওর মাথার হাত রাখল। ওর চিবুক ধরে ওর মুখের দিকে

চাইল। কি যে মন্ত্র বলে চলল আস্তে। ওর চোখে গভীর বেদনা। ওর আঙুলে যেন মন্ত্র ছিল। সালী বুঝতে পারল ওর ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, উত্তপ্ত মন জুড়িয়ে বর্ষার পূর্বে বাতাস বহে যাচ্ছে।

সালী বলল, 'কি দেখ?'

—'তোমারে।'

—আমারে?

—'হ্যাঁ।'

বিরসা বলেছিল, 'ডোন্‌কা হতে আমার অনেক কাজ হবে। তুমি হতে আরও বেশি কাজ হবে।'

—'আমি হতে।'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি কে, বল?'

—'তুমি সালী।'

—'মেয়েছেলে হতে লড়াইয়ের কাজ হয়?'

—'হয়। আমি তোমায় বলে দিব।'

সালী আশ্চর্য হয়ে মাথা নিচু করে ঘরে ফিরে এসেছিল। ডোন্‌কাকে বলেছিল, 'তুই তো মান্‌কি আছিস। আর কি পাবি বলে ওর কাছে গিয়াছিস্?'

ডোন্‌কা বিষণ্ণ হেসে বলেছিল, ওকে দেখলে, ওর কথা শুনলে আমার বুকে জানি বান ছুটে সালী, পাহাড় ভাঙ্গে। ওর কাছে যেয়ে তবে আমি জানলাম মুণ্ডা নামে গরব কত!'

সালী তখন বুঝেছিল ডোন্‌কা কেন বিরসার ভক্ত হয়েছে। মুণ্ডা মানে জংলীটা, অসভ্যটা। মুণ্ডাদের জীবন দিকুদের জন্যে। দিকুদের গোলায় ধান-সরসে-আখ উঠবে, দিকুরা এসে জঙ্গল-হাসিল জমি দখল করবে, বোঙা-বুঙির থান—বলির জায়গা পহনাই—খুটকাট্টি গ্রামের সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে সেখানে দিকুরা তাদের দেবদেবীর স্থান বসাবে, মুণ্ডাদের জীবন সেজন্যেই। মুণ্ডা কেমন করে মুণ্ডা বলে গর্ব করবে? কেমন করে আত্মবিশ্বাস অটুট রাখবে?

না, বিরসা কোনো মুণ্ডাকে ঘাটোর বদলে ভাত, বেঠবেগারীর বদলে স্বাধীনতা, জেলকাছারি থেকে অব্যাহতি, চাষের জমি—বসতবাড়ি—অরণ্যে অধিকার দিতে পারেনি।

কিন্তু ডোন্‌কার বুকে সাহস, গর্ব দিতে পেরেছে।

সালী নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 'আমিও কাপড় হলুদ রঙ করে নিব কুসুম ফুলে। স্ত্রী-পুরুষে যেমন থাকে, থাকব না। আমিও যেয়ে চালকাড় হতে শুনে আসব ওর কথা।'

—'যাবি?'

—'নয় তো তুই একা যাবি? বুড়াটা, রাতকানাটা, রাতে-ভিতে দেখিস তুই?'

সবই করেছিল সালী। বিরসার জন্যে অনেক কাজ করে বিরসার চোখে প্রশংসা

দেখবার জন্য ও সব করেছিল। তারপর, ধানী যখন তীরের ফলা বিলোচ্ছে, তখন বিরসা ধরা পড়ল। ডোন্‌কাও জেলে গেল।

সালী দেখল গ্রামে-গ্রামে পুলিশের তাণ্ডব। দেশে আকাল। দুরন্ত খরায় জঙ্গল অবধি নিষ্পত্র হয়ে গেল। মুণ্ডারা আবার ক্রীশ্চান হতে চলে গেল দলে দলে।

দেখল এখন বিরসার শত্রুরা বলছে, 'বিরসার পাপে সব জ্বলেপুড়ে গেল হে মুণ্ডারা।'

মুণ্ডারা বলছে, 'তবে?'

—'তবে আর কি! সকল বোঙা-বুঙি ছেড়ে একা বিরসাকে ভগবান বলে পূজলে দেবতা রেগে যাবে না?'

—'তবে?'

—'যেয়ে পুজো দে গা। জল নাই। চাষ নাই, কোন্ বোঙার শাপে হচ্ছে সব, পহান্ বলে দিবে।'

—'তা বাদে?'

—'সেই বোঙারে তুষগা, যা।'

আবার সিংবোঙার থানে মুরগি বলি পড়ল। আবার পহান্ রক্তভরা সরা নিয়ে অন্ধকারে ছুটে গিয়ে শুকনো কুয়োয়, নদীর মরা খাতে ঢেলে দিল। আবার সুখি ডাইনি এসে তুক-তাক-মন্ত্র-তন্ত্র শুরু করল।

দেখে ভারী কান্না পেল সালীর। এমন কান্না পেয়েছিল যখন বাবা ডোন্‌কার সঙ্গে ওর বিয়ে দেয়। মনে হয়েছিল বুঝি মরে গেল।

জঙ্গল জ্বলে গেছে। হরিণ গ্রামে এসে টাল ভেঙ্গে ধান খেয়ে যায়। ঘরের ভেতর কাঠের খুঁটি দিয়ে আরেকটা জায়গা ঘেরা। সেখানে মা ওর কচি ছেলেটাকে নিয়ে শুয়ে থাকে। সালী ঘরের বাইরে বলোয়া হাতে চেপে ঘুমায়। খচমচ টাল ভাঙ্গার শব্দ পেলেই বলোয়া ছুঁড়বে, নয় সড়কি বিঁধবে।

একদিন রাতে পায়ের শব্দ হল। সালী বুঝল বাইরে কোনো মানুষ এসেছে। ও সড়কিটা বাগিয়ে ধরল। নিচু গলায় বলল, 'কে?'

—'ধানী রে ধানী মুণ্ডা!'

সালী দরজা খুলল। ধানী ঢুকল। বলল, 'জেহেল হতে পলায়েছি।'

—'তুই একা?'

—'হ্যাঁ।'

—'হেথা এলি?'

—'যাব কোথা?'

—'তোর পিছে পুলিশ আসবে।'

—'একদিন তো সময় দিবে।'

পরদিন রাত হলে, সালী ধানীকে গুহায় নিয়ে গেল। বলল, 'কেউ সুলুক জানে না। দিনেমানে সাফা করে রেখে গিয়াছি। ঝাঁপ ফেলায়ে দিয়াছি সামনে। হেথা থাক তুই। পরে আসব। না এলে জানবি গ্রামে পুলিশ এসেছে বলে আসি নাই। ভুখ লাগলে এই

মকাইয়ের ছাতু খাস, চকমকি, জলের মটকি রইল।'

সেই থেকে ধানী এখানে। ধানীকে এখানে পৌঁছে দিয়ে তবে সালীর মনে হল, সব ঠিক আছে। ধানী বলেছে বিরসা দু-বছর বাদে ফিরবে। যতদিন না ফেরে ততদিন মুণ্ডাদের জানতে হবে সব আছে।

বুকে সাহস নিয়ে ফিরে গেল সালী। আবার জীবন স্বাভাবিক মনে হল। মনে হল সব ঠিক আছে। পুলিশ ধানীর খোঁজে এসে ওর ধান-মরাই ভেঙে দিয়ে গেল। সালী মাকে বলল, 'কাঁদিস কেন? জন্মে ধানের মরাই কবে তোর উঠানে ছিল? আমারে বুড়ার ঘরে দিয়ে তবে না মরাই দেখলি?'

—'কি খাবি এখন?'

—'আগে যা খেতাম।'

সালী জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করল। জঙ্গলে ফল হয়, কন্দ হয়, খরা-শজারু মারা চলে। জঙ্গলে মেয়েরা দল বেঁধে যায়, ছড়িয়ে পড়ে কথা বলে-বলে, মন জেনে-জেনে সালী বুঝল—না, সবাই বিরসার নামে কাঁপে না।

মানি পহানী ওকে বুদ্ধি দিল। বলল, 'যে, হাটে দিকু আসে যে বড় হাটে যাব না। ছোট ছোট জঙ্গলের ভিতর-ভিতর গ্রামে তীর নিব, উপরে কচু-কলা-শাক রাখব। আমার ঝুড়ি করে বেচব, তার ঝুড়ি আমি নিব। সে যেয়ে রাতে-ভিতে মানুষের বাড়ির দেওয়ালে তীর বিন্ধে চলে আসবে। আমার কথা শুন্।'

সালী মানির কথা শুনল। সবাই দেখল সালী, ডোন্‌কা মান্‌কির বউ, পেটে ছেলে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। বড় আকাল, বড় খরা, জঙ্গল ছাড়া মুণ্ডার গতি কি? দিকুরা আর ধান-টাকা ধার দেয় না। বলে দিকুদের তো তোরা তাড়াবি। তবে দিকু তোদের দেখবে কেন?'

বড় আকাল, বড় দুর্দিন। বিরসা জেলে গেল। সেই থেকে পর পর দু-বছর বৃষ্টি নেই।

১৫

বৃষ্টি নেই। সৃষ্টি জ্বলে খাক হয়ে গেল। দ্বিতীয় বছরে বাতাসে জল ছিল না, মাটি টাটা-ফাটা। শীতেও রাতে শিশির হয় না। সকালে দেখা যায় জঙ্গলে গাছের পাতা শুকনো, ঝিমন্ত। নদীর বালি আঁচড়ে গর্ত করে রাখে মেয়েরা। সারারাতে সে গর্তে এক আঁজলা জলও ওঠে না। ১৮৯৭ সালে ছোটনাগপুরে ভাদোই ফসল জ্বলে গেল, রবিশস্যও উঠল না।

১৮৯৭ সালে নভেম্বরে বিরসা মুক্তি পেল।

সঙ্গে সঙ্গে সে-খবর ছাড়িয়ে গেল বাতাসের আগে। আবার মুণ্ডা গ্রামে-গ্রামে মাদল বাজল। মেয়েপুরুষে নাচল, গান গাইল। যারা ক্রিশ্চান হয়েছিল তারা পলুস প্রচারককে বলে দিল, 'আর তোর গির্জা যাব না, যা তুই। ভগবান এসে গিয়াছে।

—'মিশনের সাহেবরা তোমাদের খাওয়ায় নাই এ আকালে?'

—'খাওয়ালে কি হয়াছে?'

—'তোরা আমারে বিপদে ফেলালি।'

—'বিপদে তুই নিজেরে ফেলাছিস, যখন ভগবানের ধরা করাতে গিয়াছিলি।'

—'এই দেখ, আবার সে কথা তুলে।'

—'যা, চলে যা তোর গির্জায়।'

রাঁচি থেকে চালকাড়ে আসতে আসতে বিরসা দেখল সব জ্বলে খাক্ হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস ফেলল ও। মুণ্ডাদের অনাহার, উপবাস, দারিদ্র্য সব যেন ওর মনে পাষাণ হয়ে চেপে বসল। ভগবান সে, মুণ্ডাদের ভগবান। কমিশনারকে কথা দিয়াছে আর ও মুণ্ডাদের খেপাবে না। বিরসা বুঝল কথা ও রাখতে পারবে না। এখন মনের কোথায় যেন প্রতিধ্বনিতে শুকনো, রুক্ষ বাতাসের প্রতিধ্বনিতে ফিরে এল মায়ের কাছে শোনা প্রাচীন গৌরবের কথা। চুটিয়া জগন্নাথপুর নওরতনে মুণ্ডারা মন্দির গড়েছিল। সে মন্দিরের পাথরের বেদীর নিচে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সিংবোঙার সঙ্গে কথা বলা চলত। ঈশ্বর আর মুণ্ডারা সেদিন বড় কাছাকাছি ছিল। তারপর, মা বলত, 'তারপর স—ব নিয়ে নিল দিকুরা। মুণ্ডারা বেদখল হয়ে গেল।'

চালকাড় পৌঁছে গেল ওরা।

ডিসেম্বরের সাত তারিখে স্বয়ং কমিশনার ওকে চালকাড়ে এসে হুমকি দিয়ে গেলেন। বললেন, 'সরকারকে কথা দিয়েছ। কথা ভাঙ্গলে গুরুতর শাস্তি পাবে।'

বিরসা বলল, 'মনে আছে।'

কমিশনার চলে গেলেন দুপুরে। সন্ধ্যায় বিরসার উঠোন ভরে গেল। সোমা, ধানী, গয়া, সুরাই, ভরতো, মুণ্ডা সর্দাররা এসেছে। এসেছে মুণ্ডা মরদেরা।

উঠোনে জ্বলন্ত মশাল পুঁতে দিয়ে গেল একজন। মশালের ধক্‌ধক্ আলো। বিরসার মুখ গম্ভীর। বলল, 'একে একে কথা বল। সোমা, তুমি বল।'

—'তুমি জেহেলে। এদিকে শ্রাবণ-ভাদ্র আসতে শুনলাম সরকার আকালের জন্য ব্যবস্থা করাছে। খয়রাতে, গ্রামে-গ্রামে কর্জ ধান-চাল সব দিবে। আমরা হাঁ করে চেয়ে থাকলাম। বাদে শুনলাম সরকার বেবস্থা করাছে, সবাই সব পেয়ে গিয়াছে, রিপোর্ট চলে গেছে সদরে। কিন্তু ভগবান! আমরা একজনও এক খুঁচি চাল পাই নাই। আর আমি কি বলব?'

—'গয়া, তুমি বল।'

— 'আমি থানায় যেয়ে বললাম খুন্‌টি, সিসল, বাসিয়া থানায় একশোর বেশি মানুষ উপোসে মরল তা রিপোর্ট করে লেখ আকাল এসেছে। তারা লিখে দিল চল্লিশ জন মরাছে। চল্লিশ জন মরালে তারে আকাল বলে না!'

—'ভরতো, কি বল?'

—'হ্যাঁ, মিশনের সাহেবরা লঙ্গরখানা খুলে দিয়েছে। মানুষ খাওয়াচ্ছে কতক। কিন্তু জমিদাররা, ভগবান! সাহেব বলতেও না দিছে কর্জ, না বলেছে টালে কত ধান আছে। যত ধানচাল ছিল সব নিয়ে গুম করে ফেলাল! তা বাদে এক দিকু মামলা ঠুকে দিলে

আর দুখার নামে। ওরা ওর জঙ্গল হতে বাঁশের কোঁড় ভাঙ্গছিল।'

—'আইনের কথা কে জানে?'

ধানী এগিয়ে এল, 'আমি জানি।'

—'তুমি। জেহেল থেকে পালালে কেন?'

'ভাত দিল না কেন?' ঘরেও ঘাটো খাব, জেহেলেও ঘাটো? তা বাদে ওয়াডার আমারে শিয়াল বলল কেন?'

—'অন্যায় করেছিলে।'

—'আর করব না।'

—'আইনের কথা তুমি কি জান?'

—'সব জেনে নিয়াছি। একে একে বলি?'

—'বল।'

—'খাজনা বাড়াতে আইন হল, খাজনা কমাতে আইন হল। একই আইনে বলে দিল খাজনা বাড়বে, আবার যখনই দেখবে রায়তের ক্ষমতা নেই, তখন খাজনা মাপ করবে। খাজনা বাড়ালে জমিদারের মুখ চেয়ে। জমিদার বুঝাল এখন দিনকাল মাহাঙ্গা খুব। খাজনা না বাড়ালে জমিদার মরে যায়। আইনে বলে দিল যে রায়ত বেশি খাজনা দিতে পারবে না, সে বেগারী দিবে। যার সঙ্গে বেগারীর কথা, সে বেগারী দিতে অপারক হলে টাকা দিলে রেহাই পাবে।'

—'কাজে কি হল?'

—'তখন সোমারা পাঁচজন যেয়ে জেকবকে চিঠি লিখা করাল। জেকব এসেছিল রাঁচি। কেন তুমি শুন নাই?'

—'শুনেছি জেকব অনেক লিখালিখি করল সরকারকে। নিজে খরচে মুণ্ডাদের দিয়ে কেস দায়ের করাল আদালতে। যাতে আপত্তিগুলো রেকর্ড হয়, এ-আইন পাস হলে মুণ্ডার সুবিধে এক আনা। জমিদারের সুবিধে পনেরো আনা। তোমরাও তো তা বুঝ হে! মুণ্ডা থাকে জঙ্গলে। বলল, সরকার খাজনা ধরা করাছে, এ খাজনা মুকুব করা আমার সাধ্য নাই। মুণ্ডা যদি মুণ্ডারীতে চেঁচায়, সরকার জানবে?'

—'না। শুনবে না। সরকার কানে কালা।'

—'তবে?'

—'মামলা দায়ের করে সরকারকে বুঝাতে হবে।'

—'হ্যাঁ। মামলা দায়ের করবার সাধ্য মুণ্ডার নাই, কোনোদিন হবে না। তখন জেকব এ-সকল কথাই সরকারকে জানাল। কিছুই হয় নাই। আইন পাস হয়ে গেল। তা বাদে কি হল, বলি—এই! মশাল দাও একটা নতুন।'

নতুন মশাল জ্বলে উঠল।

বিরসা বলতে লাগল, কমিশনার স্ট্রীট্‌ফিল্ড জেকবের সকল আপত্তি ফাইল করায়ে দিল। বলল, বিরসা! আমি সব রেকর্ড করছি! এ আইন আবার নতুন করে হবে। কিন্তু কলকাতা হতে জন উডবার্ন, ছোট লাট চলে এল রাঁচি। বলে দিল বিরসা মুণ্ডা যে হাঙ্গামা

করাছে তাতে মুণ্ডা চাষী খেপে আছে। এখন ওদের সুবিধা হল এমন কোনো কথা আইনে ঢুকাবে না।'

গয়া মুণ্ডা বলল, 'তাতেই দেখ! জমিদার এখন বেঠবেগারী নিচ্ছে, খাজনাও নিচ্ছে। কে দিবে খাজনা? কার ঘরে দুটো রূপার টাকা মজুত আছে? আজ দু-বছর তুমি জেহেলে। তুমি ধরতি-আবা, তুমি জেহেলে। ধরতি ফসল দিতে পারে? দু-বছর ধরতি জ্বলে খাক হয়ে রাতেদিনে শাঁস ফেলাচ্ছে কি! জঙ্গল জ্বলে গেল, নদীতে জল হয় না। জমিদার বলে, তোদের তরে সরকার আইন করাচ্ছে, যা, মামলা করগা যা। তাতেই মোরা চোর হলাম।'

—'চোর হলে?'

—'হ্যাঁ ভগবান!' তুমি জেহেলে। এদিকে দু-বছর ফসল নাই, খয়রাতি নাই, ধার-কর্জ নাই, খাজনা বেড়ে গিয়াছে, বেঠবেগারীর হাঁকোড় খুব বেশি হয়াছে। তা হতে ধানী বলল, চল্ ধান লুটিগা। জমিদারের ঘরে ধান রইতে মোরা শুকিয়ে মরব? তা হতে ধান চুরি করি মোরা। সেই হতে তো সরকার পিটুনি খাজনা জারি করছে। যে-গ্রামে ধান চুরি হবে, সে-গ্রামে খাজনা হবে। তা মোরা এখন আগে হতে বলে রাখি টাল ভাঙ্গি, চাল নিই, রাতে-ভিতে জঙ্গলে পলাই। মুণ্ডাদের জানায়ে যাই, কেউ পিটুনি দিতে গ্রামে রয় না। জঙ্গলে পলায়।'

ধানী বলল, 'আবার ঘরে ফিরি। আবার পলাই। এখন মুণ্ডারা জেনে গিয়েছে তুমি বিনা তাদের গতি নাই।'

বিরসা বলল, 'বোর্তোদিতে সালীর ঘরে সবারে ডাক। সেথা যেয়ে সব ঠিক করব।'

—'করবে?'

—'হ্যাঁ।'

সবাই চলে গেল একে একে। তবু বিরসার ঘুম আসে না। খাটিয়ায় শুয়ে সে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। ভগবান সে। ভগবানই তো। ভগবান না হলে সে ডাক দিলে সব মুণ্ডা এল কেন? ভগবান আসে, যখন একটা যুগ অন্ত হয়। এও তো যুগ অন্ত হবার সকল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে 'সেংগেল-দা' হয়ে, আগুনে মুণ্ডাদের দেশ জ্বলে গেল। মাঝখানে জালের মত বিছিয়ে আছে দিকুদের জগৎ। এখনই তো ভগবানের দরকার ছিল।

কিন্তু নিজের ভেতর থেকে বিরসা যে-নির্দেশ পায়, সে-নির্দেশ এখনো কেন পাচ্ছে না? শরীরটা কারাগারে থেকে অশুচি হয়ে গেছে বলে?

ধীরে ওর পায়ের ওপর দিয়ে গা অবধি যেন রজাই বিছিয়ে দিল।

—'কে, মা?'

—'হ্যাঁ রে? ঘুমাস নাই?'

—'না মা! এ-রজাই কোথায় পেলে?'

—'তোর তরে বানায়েছি বাপ। তুষ ভরে দিয়াছি, তুলো পাব কোথা? কাপড় আনল তোর দিদি। মোরা মা-মেয়েতে সিঁয়ালাম।'

—'এমন রজাই তুই কচিবেলা দিস নাই।'

—'কচিবেলা সব তুষের ভিতর ঢুকে ঘুমাতি।'

—'ওম হত কেমন!'

—'রজাই দিতে পারি নাই, আদর করতে পারি নাই, পরবে মাথায় গুঁজবি তা নতুন কাঁকই দিতে পারি নাই।'

—'দাদা কাঁদত খুব?'

—'কাঁদত, বায়না করত। তুই আমায় কোনো দুঃখ দিস নাই বাপ, এখন এত দুঃখ দিবি বলে?'

—'কেন এত দুঃখ মা?'

—'হ্যাঁ রে বিরসা! জগতের দুঃখ বুঝিস, যে-মা তোরে ধরতি ধরাল তার দুঃখ বুঝিস না? তুই ভগবান হয়াছিস ভাল! কিন্তু এখন যে-বাপ, তুই যে-পথে চলেছিস, সে-পথে গেলে সরকার তোরে মারবে।'

—'সরকার রইবে না মা।'

—'রইবে না!'

—'না মা! আবার আমাদের দেশ আমাদের হবে। স—ব পেয়ে যাবি তুই। সকল মুণ্ডা দেশ জিনে নিয়ে তোরে এনে দেব। দুই দুঃখ করিস কেন?'

কর্মি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কাল হতে তুই আবার সকলের হয়া যাবি।' মোরে তোর কাছকে যেতে দিবে না কেউ। আজ আমার কাছকে ঘুমা টুখানি। তোরে একবার বুকে ধরি।'

বৃদ্ধা জরতী কর্মি পৃথিবী-দেবতাকে বুকে জাপটে শুয়ে রইল। বাইরে শীত, উত্তুরে বাতাস। কর্মির বোবা কান্নার মতো জঙ্গলটা বিলাপ করতে লাগল বাতাসের দাপটে।'

ভগবান আসবে, তার ঘরে আসবে। সালী, মানি পহানী আর অন্য মেয়েদের নিয়ে উঠোন ঝেঁটিয়ে নিকিয়ে ঝকঝকে করল। ডোন্‌কা ও অন্য বিরসাইত পুরুষরা উঠোনের এক কোণে নতুন ঘর বাঁধল, ভগবান থাকবে। জঙ্গলের গহীনে বোর্তোদির কুণ্ডী। সে কুণ্ডীর জল কোনো কালে শুকোয় না। গ্রামে সবাই ক্ষার সিজিয়ে কাপড় কাচল, তেল মেখে চুল আঁচড়াল। সবাই হলুদ বেটে কপালে গলায় মাখল।

এই যে ঘরে ঘরে চাল ছিল না, এখন যে যা পারল নিয়ে এল। মানকিনীর মতো বসে বসে সালী সব চাল, লবণ, ডাল রাখল ডোলে-ডোলে। এখন আবার বিরসাইতরা আসবে। কি বলে ভগবান, যদি বলে এখানেও ঘাঁটি হবে একটা? তারপর মহুয়া তেলে মাথা ভিজিয়ে রিঠাফলের ক্বাথ নিয়ে সালী কুণ্ডীতে স্নান করতে গেল। রিঠার ক্বাথে গা সাফ করে খুব। এক বোরা রিঠা সালীর ঘরেই ছিল। ধুঁধুলের খোসায় গা-হাত-মুখ ঘষে স্নান করল সালী। কুণ্ডী থেকে উঠে সাফ কাপড় পরে চেটালো একটা পাথরে বসল চুল খুলে। চুল শুকোবে, চুল বাঁধবে কাঠের কাঁকই গুঁজে।

টুপ করে কে ওর পায়ের কাছে পাথর ছুঁড়ল। বলোয়া হাতে ছিটকে উঠল সালী। তারপর বলল, 'কে? পরমী? ধরাইমুণ্ডার বোন?'

—'হ্যাঁ।'

—'হেথা এলি?'

—'তোর সঙ্গে কথা বলব বলে।'

—'আমার সাথে!'

—'হ্যাঁ তুই মোরে বলে দে কি করব।'

—'কেন?'

'দেখ ভগবান জেহেলে যাবার আগে বাপরে বালা-খাড়ু-শাড়ি দিয়া গেল। বলে গেল, তোর মেয়ের সঙ্গে আরান্দি হবে আমার!'

'তোর ভাগ্য!'

পরমী মুখ ফেরাল। কাঁদতে লাগল।

—'কাঁদিস কেন?'

—'এমন আরান্দি আমি চাই না রে। সে কোথা রইবে, আমি কোথা রইব। স্ত্রী-পুরুষে যেমন থাকে তেমন থাকব না। খালি বিরসাইতদের ভাত রাঁধব, হলুদ বাটব, তাদের কাজে ছুটোছুটি করব, এমন আরান্দি আমি চাই না।'

—'কনু কি বলে?'

—'আর কি বলে! সেও বিরসাইতটা হয়াছে। বাপ তাই, দাদা তাই! ভগবানের বালা-খাড়ু ফিরা দিলে, সে কথা ফিরায়ে দিলে তবে কনু মোরে আরান্দি করবে।'

—'আমারে বলিস কেন?'

—'তোর ঘরে আসতাছে, তুই বললে, ভগবান কথাটা নিবে। তুই বলগা সালী!

—'এই কথা।'

সালীর বুক থেকে যেন পাষাণ নেমে গেল। সালী বলল, 'বলব। দেখ্ দেখ্ পরমী! কুণ্ডী এতদূর বলে কেউ আসে না। তেলাকুচা পেকেছে কত! পাখিতেও জানেনি? নে ছিঁড়ে নিয়ে যাই। কড়ুয়া তেলে মরিচে তেলাকুচা ভাজব।'

—দাঁড়া। পাতা ছিঁড়ে ডুলি বানাই দুটো।'

দুজনে তেলাকুচা তুলতে লাগল।

সালী বিরসার পায়ে জল ঢেলে দিল, আঁচল দিয়ে জল মোছাল। বসতে নতুন পিঁড়ি দিল। অন্য মেয়েরা হাত জোড় করে বসে রইল।

—'ভগবান! একটা কথা।'

—'বল!'

'পরমী হতে বালা-খাড়ু তুমি ফিরা নিবে। ও ঘর চায়, ছেলা চায়, পাঁচটা বিয়াতির মাথায় তেলসিঁদুর দিতে চায়।'

—'তাই হবে।'

—'তারে তুমি শাপ দিবে না?'

—'না।'

—বাস, আর কথা নাই!'

—'তুই আমায় কিছু দিবি না?'

—'কি দিব? আমার মরদরে নিয়াছ। ওই ঘর-আঙিনা-টাল দিয়ে দিয়াছি তোমার কাজে। আর তো আছে শুধু ছেলেটা।'

—'তারে দিবি না?'

—স—ব নিবে?'

—'সব।'

সালী ছেলে কোলে নিল। বলল, 'নাও, তোমায় দিলাম। কচি ছেলা নিয়ে তুমি করবে কি?'

—'ও হতে মোর নাম থাকবে।'

সালীর চোখ নিচু হয়ে এল। বিরসা সালীর ছেলের কপালে হাত রাখল। বলল, 'তোমরা জানলে সালী আন ডোন্‌কির ছেলাকে আমি গোদ নিলাম। ওর নাম দিলাম পরিবা। তোমরা ওরে মোর বলে জানবে।'

হলুদ রাঙানো সুতো পরিবার হাতে বেঁধে দিল বিরসা। সালীর চোখ জলে ভরে এল।

—'কাঁদিস কেন?'

—'মোরে তোমার কাজ করতে দিও।'

—'তুই তো করছিস।'

—'করাছি তো!'

সালী চোখ মুছে হেসে উঠল। বলল, 'আমি, মানি, ফুল্‌না, মোরা সবাই করাছি। আগে পুরুষরা হেসাছে কত! তোরা মেয়েছেলা তোরা যেয়ে ভগবানের কাজ করবি? পুলিশ তো দু-বছর পুরুষদের পিছনে ঘুরাছে। আমরা মেয়েরা কাজ করাছি। এখন আর কেউ হাসে না। চল, বাইরে চল, বাইরে চল, এসে গিয়াছে সবাই সমরাই, রমাই, বুধু বাঙ্গিয়া, সকল বুড়ো সর্দাররা এসাছে হে। বুধু জীয়ে আছে তাই জানতাম না।'

—'চল!'

নতুন ঘরের দাওয়ায় উঠে দাঁড়াল বিরসা। ওর নির্দেশে নাগরায় ঘা মেরে ডোন্‌কা মুণ্ডা সকলকে থামিয়ে দিল। বিরসার পরনে ধবধবে কাপড়, মাথায় পাগড়ি, গায়ে পিরান, পায়ে খড়ম।

বিরসা বলতে লাগল, 'শুনে হে মুণ্ডারা! বড় ভাল সময়ে এসেছ তোমরা। জেহেলে বসে-বসে আমি শুধু ভেবেছি কেমন করে তোমাদের কোন্ পথে নিয়ে যাব। এখন পথ পেয়ে গেছি। তোমাদের পথ দেখাব।'

—'দেখাও ধরতি-আবা।'

—'আগেই বলি, সে-পথে গেলে শরীরটা মরবে কি বাঁচবে, তা ভাবলে চলবে না।'

—'ভাবব না।'

—'তবে শুন। আজ হতে যে আমারে পূজবে সেই বিরসাইত। তোমাদের হাতে সময় নাই! এতকাল ভেবেছি মুণ্ডার শত্রু কে? কে তার দুশমন! এই জমিদার-জোতদার-

মহাজন? যারা এসে আমাদের খেতে খামারে জুড়ে বসেছে শুধু তারাই দুশমন? না যারা খুটকাট্টি গ্রামগুলো জমিদারদের হাতে তুলে দিল, সেই সরকার?'

—'তুমি বল হে কে দুশমন!'

—'দুশমন সবাই। সকলের সাথে মোদের লড়াই হে! এমন লড়াই মুণ্ডা কখনো লড়ে নাই। সকল দিকুদের সঙ্গে লড়াই, লড়াই সরকারের সঙ্গে।'

—'তা বাদে—'

—'আমাদের জঙ্গল আছে। আমরা জঙ্গলে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পাহাড়ে সাঁধাব, ঘাঁটি করব। ওদের বন্দুক আছে, কিন্তু বন্দুক চালাবে ক-জনা? আমরা হাজারে হাজারে আছি।'

—'তবে বল।'

—'তবে শুন। এখন দু-পথে কাজ চাই। আমার ধর্মের কাজ। আমার লড়াইয়ের কাজ। জলমাইয়ের সোমা মুণ্ডারে তোমরা জান। সর্দার সোমা? মুলকুই-লড়াইয়ের সময় হতে অনেক মার খেয়েছে, অনেক জেহেল খেটেছে। তারে আমি ধর্মের কাজে এক হাত রাখলাম। আমার ধর্মে কোনো সন্ন্যাসীকে দিয়ে কাজ হবার নয় হে, যে লড়েছে, তারে চাই।'

—'ভাল বলাছ হে ভগবান।'

—'লড়াইয়ের কাজে গয়া মুণ্ডা আমার আরেক হাত। গয়ার কথা আমি কি বলব বল! ওরে তোমরা জান।'

—'ভাল বলাছ হে ভগবান।'

—'আজ হতে সকল বিরসাইতের বাড়ি এ-লড়াইয়ে গড় হল। সেথা বেস্পতিতে-রবিতে সবে মিলবে, ধর্মের কথা, লড়াইয়ের কথা বলবে। যারা মিলবে সবে রাতে মিলবে।'

—'রাতে মিলবে!'

—'আজ এ-গাঁয়ে, কাল পাঁচ কোশ দূরে অন্য গাঁয়ে, দিকে-দিকে আমাদের সভা হবে। এসব খবর পাবে তোমরা দুই কনুর কাছে, আমার ভাই কনু মুণ্ডা, শঙ্করা গ্রামের কনু মুণ্ডা।'

—'আমরা কি করব হে?'

—'একোদল, যাদের বাড়ি জঙ্গলের খুব ভিতরে, থানা হতে অনেক দূরে, তারা হল প্রচারক। তারা প্রচারক, গুরু যা হয় বল। তাদের বাড়িতে-বাড়িতে প্রথম দিকে রবিরার বিযুতবারে বিরসাইতরা রাতে মিলবে। সে বিরসাইতের বাড়ি, সে সকলরে শুতে ঠাঁই দিবে। যারা যাবে তারা যে যা পার নিয়া যাবে, সবাই একসঙ্গে পাক করে বেঁটে খাবে।'

—'এ কথা ভাল হে! নয়তো কারো সাধ্য নাই দশটারে মুখে দানা দেয়।'

—'একোদল, তোমরা! সর্দাররা! যারা বুড়ো হে! তোমরাই আমারে লড়াইয়ের কথা শিখায়েছ। আমি যে ভগবান, তোমরাই আগে জেনেছ। তোমরা পুরাণক। তোমরা লড়াইয়ের কথা শিখাবে। কোথায় পালাবে, কেমনভাবে ঘাঁটি করবে, কেমন করে হাতিয়ার যোগাড় করবে, এ সকলে শিখাবার সাধ্য নাই। তোমরা আসল কাজ করবে।'

—'করব ভগবান! করব।'

—সোমা দেখবে, ডোন্‌কা দেখবে, কাজের লোক বেছে নেবে, বিরসাইত করবে। শেষে থাকল নতুন বিরসাইতরা। তারা নানক। নানকরা রবিতে-বেস্পতিতে পঞ্চায়েতে আসবে না। তারা বিরসাইত হবে। পুরাণকদের কাছে লড়াই জেনে নিবে।'

—'খুব বলাছ ভগবান।'

—'এখন আর ধিমা-ধিমায় কাজ হবে না। আগে মোরা একসঙ্গে সকল কাজ করব। লড়াই শিখা, নানক যোগাড়, পঞ্চায়েত, ঘাঁটি তৈরি, রসদ যোগাড়, সকল কাজ চলবে। কিন্তু মোরা মোদের পুরানো দখল পেতে চাই। পুরানো দেবস্থানই চাই। তাই! চুটিয়া আর জগন্নাথপুরের মন্দির কেড়ে নিব। মন্দির আমাদের ছিল—সে মন্দিরে আমরা ঢুকতে পারি না। দিকু রাজা, দিকু জমিদার, যেমন তাদের সামনে মোদের বড় ধুতি, পাগড়ি, জুতা পরতে দেয় না—যেমন মোদের কাঁসা পিতলে খেতে দেয় না—যেমন মোদের উঁচু আসনে বসতে দেয় না—তেমনি মোদের পিতা-পুরুষদের মন্দিরেও ঢুকতে দেয় না।'

—'মন্দির কেড়ে নিব!'

—'মুণ্ডাদের আদি রাজধানী নওরতনগড়ের কেল্লা হতে জল আনব, মাটি আনব। দখল নিব।'

—'দখল নিব।'

বিরসা দু-হাত তুলল, ওদের মধ্যে নেমে এল। বলল, 'এবার আর ধিমা-ধিমা লড়াই নয়। একোসঙ্গে সকল মুণ্ডা সকল দেশ জুড়ে লড়ব। আমার এ-লড়াইয়ের নাম উলগুলান! বুঝলে? উলগুলান!'

—'উলগুলান?'

—'উলগুলান!'

বিরসা নাগরাটার দু-হাতে কাঠি নিয়ে ভীষণ জোরে ঘা দিল। শত-শত গলার আওয়াজ উঠল 'উলগুলান!'

১৬

উলগুলান! নতুন ছেলেদের, 'নানক'-দের দীক্ষার মন্ত্র হল এই পাঁচটি শব্দ! হাটে জঙ্গলে, পাহাড়ে, শহরে, দুজন অচেনা মুণ্ডা একসঙ্গে হলে একে বলে 'উল!'

ও বলে 'গুলান!'

দুজনে একসঙ্গে বলে 'উলগুলান!' তারপর যে যার কাজে চলে যায়।

হাটে বাজারে বাঁশি বাজিয়ে ঘোরা ওদের চিরদিনের অভ্যাস। এবার দেখা গেল অনেক গ্রামের মুণ্ডা একসঙ্গে হলে একজন একটি গানের একটি লাইন বাজায়। আরেকজন পরের লাইনটি বাজায়, আরেকজন তার পরের লাইনটি। তারপর কোনো একজন পুরো গানটি বাঁশিতে বাজায়।

পলুস প্রচারক যোহনরাম গোলদারকে বলল, 'এ কি বাঁশি বাজাবার রীতি গো? এমন কখনও শুনি নাই।'

—'এ বেটাদের শহুরা রীতি হয়াছে। জেহেল-থানা করতে শহরে যাচ্ছে, মেলা দেখছে, নোটঙ্কি—গান বাজনা কোন্‌টা শুনতে বাকি আছে বল হে!'

পলুস প্রচারককে ভরত সিং দারোগা বলল, 'তুই তো মুণ্ডা। তুই কি বুঝিস কিছু?'

পলুস বলল, 'না বুঝি না।'

পলুস মনে মনে ভাবল, যদি বা বুঝি তোমাকে বলতে যাব না। এখন আমি একঘরা হয়ে আছি। মুণ্ডারা আমারে বিশ্বাস করে না কিন্তু আমার মনে সুখ নাই কোনো। আমার আপনজনা সব এই আকালে মরল ক-জনা। সবাই তো কিরিশ্চান হতেও অন্ন পায় নাই? নতুন আইন হতে লুকাস, মেথু, কিরিশ্চান রায়তদের কষ্টও বাড়ল। আমি ভাল করতে না পারি মন্দ করতে আর যাব না।

ভরতকে বলল, তুমি কার খোঁজে?'

—'সুনারাটা, সুরজ সিংয়ের মুণ্ডাটা। বেটা সেবক পাট্টায় ছাপ দিয়েছিল। তবু পাজি এমন! সুরজের ঘরে আগুন দিয়া পলায়েছে। সে-ঘরে ছিল না কিছুই, ক-টা ঝুড়ি ধামা। তবে চুরি তো করেছে। কেস হয়ে গেল।'

—'কি চুরি করাছে?'

—'চিনার দানা এক বোরা, এক ডেলা লবণ! বেটা বোকাটো! চিনার দানার যে ওজন, চালেরও তাই! এটা নিলি, ওটা নিলি না কেন? কেসেও পড়লি।'

—'সে কোথা?'

—'কে জানে?'

—'ধরলে পরে?'

—'জেহেল হবে দু'মাস আর কি।'

—'জেহেল, হবেই তাই না?'

—'হ্যাঁ, বিরসার তো কোমর ভেঙে দিয়েছে সরকার। আর মুণ্ডাদের কোমরে জোর নাই। জেহেল হলে আর পাঁচটা ডরাবে।'

পলুস প্রচারক মাথা নাড়ল বিস্ময়ে। মুণ্ডাদের হল কি? সেবক-পাট্টা লিখে দিয়ে কোনো মুণ্ডা মালিকের ঘরে আগুন দিয়ে পালাতে পারে?

ভরত দারোগা বলল, 'মুণ্ডারা চোর ছিল না, চুরি জানত না। দিনে দিনে হল কি?'

—'যাও, যাও। এখন বাজে বক না হে! মোরে দুটা তিনিটা ঠেঙে যিশুর বাণী বলতে হবে।'

রোগোতোর এ হাটটা মস্ত হাট। হাটে ভ্রাম্যমাণ মুণ্ডাদের দেখে পলুস প্রচারকের চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। এমন অঘ্রাণে ফসল বেচে টাকা নিয়ে মুণ্ডারা হাটে আসে। ফুর্তি করে, চুড়ি-খেলনা-বাঁশি কেনে। সাদা গুড়, পেঁড়া কেনে। গামছা-কাপড় বেচে। এবার কারো হাতে পয়সা নেই, কেনার গরজ নেই। ছোট ছেলেরাও যেন জেনে গিয়েছে আবদার করলে সে আবদার বাবা রাখতে পারবে না! তাই তারা শীর্ণ মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে বিষণ্ণ, বুড়োটে চোখগুলো পেঁড়া জিলিপির দিকে ফিরাচ্ছে না পর্যন্ত। মুণ্ডা মেয়েদের মুখে হাসি নেই।

ঘরে ফিরতে ফিরতে পলুসের মন খারাপ হয়ে গেল। ও একটা নিচু বুরুর ওপর উঠে বসল। পাথরে হেলান দিল। হেলান দিয়ে বসল। বাঁশিতে যে গানটা বাজাচ্ছিল, তার কথাগুলো ও শুনতে পেল।

ও বসেছে উঁচুতে পাথরের আড়ালে। নিচে পথ। মুণ্ডারা গ্রামওয়ারী দল বেঁধে চলে যাচ্ছে। একটি গ্রামের লোকেরা, পেছনের দলটির সঙ্গে কথা বলছে না। একটি কলি এরা গাইল, ওরা গাইল পরেরটি।

'বোলোপে বোলোপে হেগা মিসি হোন্ কো'...

এরা সরদুলার লোক।

'হোইও ডুডুগার হিজু তানা'...

এরা করমদির লোক।

'ওতে-রে ডুডুগার সির্‌মা রে কোআন্‌সি'...

এরা মহুরির লোক।

'দিসুম্ তাবু বুআল তানা'...

আমজোরার লোকেরা গাইছে।

'আইওম্ তে দো হোরা কাপে নামিআ'...

এরা জামদার লোক।

'দিসুম্ তাবু নুবা জানা।'

সিরুবুয়ার মেয়েরা গাইল।

ওদের গলা নিচু, মাথা নিচু। সবাই গান গাইল, গান থামল। ওরা চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। পলুস প্রচারকের বুকে অব্যক্ত বেদনা। ওরা সকলে সকলকে ডাকছে, কেননা এ হল মহাপ্রলয়ের সংকেতে জোট বাঁধবার গান। পলুস প্রচারক চোখ মুছল। ও দলছুট হয়ে গিয়েছে। মুণ্ডারা যখন এক হবে তখন ওরা পলুস প্রচারককে দলে নেবে না।

কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে ওর বুকে গর্ব ঠেলে উঠল। তবু তো সুনারা, একটা হতভাগা নিরন্ন ছেলে সেবক-পাটার ভয়ঙ্কর অনুশাসনে চকমকি ঠুকে দিয়ে পালিয়েছে। সেবক-পাট্টা জমিদার-মহাজন-জোতদার-বেনে-গোলদার যে ভাষায় লেখে, সে ভাষা মুণ্ডারা বোঝে না। মুণ্ডারা জানে না সেবক-পাটা বে-আইনী। তারা টিপছাপ দিয়ে জন্ম-জন্ম দাস হয়ে যায়। মুণ্ডা যদি জানেও, তাহলেও কিছু করতে পারে না। কেননা তখন মালিক সেবক-পাটার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। মুণ্ডা বোকা বনে যায়।

মুণ্ডা চেঁচায়, 'তবে কি আমি মিছা বলছি?'

আদালতে সবাই হাসে।

'তবে উকিলবাবু কেন বলল, তোর জন্যে মামলা করা দিব?'

আদালতে সবাই হাসে।

'সেবক-পাটায় কেউ দিও না হে টিপছাপ,' একথা বলেও লাভ নেই। কেননা আকাল হলে, খরা হলে, বান ডাকলে মুণ্ডারা যাবেই গ্রামে-গ্রামে। বলবে, 'সেবক-পাটায় ছাপ দিয়া কিনা করে নেন গো! প্রাণটা বাঁচান ঘাটো দিয়ে। জন্মভোর আপনার খেতে-গোহালে-

বাড়িতে খাটব।'

মুণ্ডাদের জীবনই এই। সকলেই জানে 'সেবক-পাটা' মুণ্ডাদের জীবনে বহু নাগপাশের মধ্যে আরেকটা পাশ। দিকুরা হল শঙ্খচুড়ের মতো।

তারা হাঁ করে বসে থাকে। ক্ষুধার্ত শঙ্খচুড়ের আহার খুঁজতে যেতে হয় না। অন্য সাপরা আপনা থেকেই তার মুখে গিয়ে ঢোকে।

একটা ছেলে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বেলে পালিয়ে গেছে। পলুস বুরু থেকে নামল। নিজের গ্রামের পথ ধরল।

আর সুনারা সেই ছেলেটা ততদিনে বিরসার কাছে চিনাদানার বোরা আর নুনের ডেলা নামিয়ে দিয়ে 'নানক' হয়ে গেছে। কর্‌মি বলল, 'তোরও কি কি কেউ নাই বাপ?'

—'কেন, ভগবান আছে না?'

—'ওই এক কথা খালভরাদের মুখে। বুলি, বাপ নাই? মা নাই? ভাইবোন নাই?'

—'নাহ্! আমি সেবক হয়াছিলাম।'

কর্‌মি মাথা নাড়ল। সুনারা কিন্তু চালকাড় ছেড়ে গেল না। কর্‌মি একদিন বলল, 'ভগবানের পিছে না ঘুরে মোর পিছে জঙ্গলে এলি কেন?'

সুনারা কাঠ কেটে বোঝা বেঁধে টেনে আনল। বলল, 'তুমি ঘর যাও গো! কাঠ আমি নিয়া দিব।'

—'বলে দিব তোর ভগবানকে।'

—'ভগবান বলাছে।'

—'কি?'

—'মোর মাকে দেখিস।'

—'তার মা! দেখবি তুই।'

—'দেখতে হবে বই কি! ঘর তো তোমার নয় গো! ভগবানের ঘর। ভগবান যা যা বলবে তাই করতে হবে।'

—'ঘরে থাকে না, মার কথা তার মনে থাকে?'

—'থাকে গো।'

সুনারা কাঠ টেনে আনল। জল নিয়ে এল ঝর্ণা থেকে। উদখলে জোয়ার ভেঙে ছাতু করে দিল। বন থেকে আমলকী, কন্দ, বাঁশকোড় মেটেআলু এনে দিল। কর্‌মিকে একদিন বাতের ওযুধও এনে দিল।

—'ছেলেরা দেখে না তাই তুই দেখছিস!'

—'তোমার কোম্‌তা ছেলা, কনু ছেলা, সব ভগবানের কাজ করে যে? তারা দেখবে কোথা হতে?'

—'তুই কেন দেখিস?'

—'আমি নানক বটি! যখন সময় হবে লড়াইয়ে যাব।'

—'লড়াইয়ে যাবি? খরা মারলে কাঁদতে বসিস না তুই?'

—'তাতে কি?'

করমি নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 'নে, ঘরে তোল্ ছাগলগুলো। আজ বিরসা ঘরে আসবে, কাজ আছে।'

—'কাল কিন্তু আমি থাকব না।'

—'কোথা যাবি?'

—'ভগবান যেথা বলবে।'

—'আর আসবি না?'

—'আমি জানি?'

—'যাবি কোথা?'

—'ভগবান বলা দিবে।'

সন্ধ্যায় বিরসা, কোম্‌তা, কনু, তিন ছেলেকে একসঙ্গে দেখে করমি চোখ কুঁচকে চাইল। বলল, 'দাস্‌কির আর চম্পা, দু-বোন কোথায়? তাদের বর কোথায়?'

বিরসা হাসল। বলল, 'কেন?'

—'সবাই এসে পড়াছে, তারা বা পিছে থাকে কেন?'

—'তারাও আসবে।'

—'তুই ভগবান হয়াছিস, হ। কোম্‌তা কনু আরান্দি করাছে, মেয়েগুলো স্বামীর ঘর গিয়াছে, সকলরে টানিস কেন?'

স্পষ্ট রাগের কথা! কিন্তু রাতে যখন বিরসা কাঠের মাচায় উঠে দাঁড়াল, বলতে লাগল আসন্ন অভিযানের কথা, তখন করমি সব কাজ ফেলে এসে পেছনে বসল অন্ধকারে। ছেলের জন্যে তার যত গর্ব, তত ভয়। অজানা ভয়ে বুকের ভেতর কেবলই নাগারা বাজে। করমির মনে আছে, ছোটবেলা ওদের ঘরে দিবর মুণ্ডার, ওর বাবার, একটা বিশাল নাগারা ছিল। কেউ সেটাতে হাত দিত না। ওদের বাড়িটা ছিল পাহাড়ের ঢালে। যখন জঙ্গলে আগুন লাগত, নদীতে হড়পা বান আসত, বুনো হাতির পাল বেরোত, তখন দিবর মুণ্ডা সেই নাগারায় ঘা দিত দিম্-দিম্-দিম্।

তখন সবাই জেনে যেত বিপদ আসছে।

করমি বুকের মধ্যে যেন সেই নাগারার সঙ্কেতই বাজে নিঃশব্দে দিম্-দিম্-দিম্! কেন মনে হয় ভীষণ বিপদ হবে, সে-কথা কেউ জানে না? একা করমি জানে!

বিরসাইতরা দাঁড়াল। সকল বিরসাইতদের পরনে সাদা ধুতি, হাঁটু অবধি ঝুলিয়ে পরা। পায়ে ঘরে তৈরি কাঁচা-কাঠের খড়ম। খড়মে অভ্যেস নেই বলে দড়ি জড়িয়ে বাঁধা। এ শুধু পঞ্চায়েতের সময়ে পরতে হয়। প্রত্যেকের গলায় উপবীত, কপালে তিলক।

সামনের সারিতে পুরাণকরা দাঁড়াল। পরের সারিতে প্রচারকরা তারপর নানকরা।

পুরাণকরা বলতে লাগল, 'সবার উপরে স্বর্গের ভগবানের জয়! পৃথিবীর ভগবান বিরসার জয়? মোরা মুণ্ডারা ধরতি-আবাকে প্রার্থনা জানাই, মোদের তীর, মোদের কুড়ালে যেন ধার থাকে, শাণ থাকে। মোদের দুশমনদের বন্দুক-গুলি-তরোয়াল যেন নাশ হয়া যায়!'

এখন সবাই একসঙ্গে হাত জোড় করে বলতে লাগল,

'হে ধরতি-আবা, পথের যত কাঁটা
দুশমনের হিংসা-দ্বেষ-মোদের যন্ত্রণা
দুঃখের দিন, দুঃস্বপ্ন—
যত রোগ যত পাপ
আর ব্রিটিশ
সব কাঁটা দূর হোক! দূর হোক! দূর হোক!'

প্রচারকরা এবার সমস্বরে বলল,

> 'হে আবা! হে বিরসা! তোমার ধর্মে যেমনটি বলছ, তেমনি করে মোদের হোরোমা-রোয়া-জী-আত্মামন (শরীর বিদেহ সত্তা-প্রাণ আত্মা-মন) আকাশ ছুঁয়ে পৃথিবী ব্যেপে, ছড়িয়ে যাক!'

নানকরা বলল, 'হে ধরতি-আবা! একা তুমিই মোদের ত্রাতা। মোদের শুচি কর।'

বিরসা হাত তুলল আকাশপানে। ওপর দিকে চাইল। তারপর বলতে লাগল, 'বড় শুভদিন হে! মোর যুগ শুরু হয়ে চলাছে! আজ জমিদাররা হাসছে মুণ্ডাদের দেখে। কিন্তু তাদের কাল শেষ হয়াছে। মোদের কাল এসে গিয়াছে।'

বিরসার গলা ভীষণ ও গম্ভীর।

'মোদের কাল এসে গিয়াছে হে! তোমাদের আমি দেশটা ফিরায়ে দিব। আমার রাজে খেতে-খেতে আল রবে না। সকল মাটি সকলের, সকল চাষ একসঙ্গে, সকল ফসল সকলের। যদি হাতে তুলে দাও তবু মোর রাজে কোনো মুণ্ডা একা মালিক হবে না। মোর রাজে যুদ্ধ রইবে না। ধর্ম রাজ হবে। মোদের পিতা-পুরুষ যেমন ধর্ম মতে রাজ করাছে, মোর রাজে মোরা তেমনি রাজ করব। লাঠি হাতিয়ার দিয়ে রাজ চালাব না।'

কর্‌মির চোখ বুজে এল। বুকের ভেতরে সুবাতাস বহে যাচ্ছে। জলবাহী বাতাস। খরার জ্বালা জুড়িয়ে দিচ্ছে। বুকের ভেতর বৃষ্টি পড়চে। খেতে ধানের চারা মাথা তুলছে। বিরসা, তুই কথা বল্‌। সত্যিই তুই ভগবান!

জমিদারের জমি কেড়ে দখল রাখতে চায়। যাদের হক, তারাই জমি পাবে। যাদের দেহ হতে দুধের ধারে রক্ত ছুটবে, তারাই জমি পাবে।'

'সকল দুশমনেরে খেদাব হে! ব্রিটিশ, রাজা, জমিদার, এ দেশে যত শয়তান, পিশাচ আছে, সবরে খেদাব।'

'মুণ্ডাদের দুশমনের মোকাবিলা করতে হবে, নয়তো তারা শত যুগেও দেশ ফিরে পাবে না। ভীষণ লড়াই হবে, তবে দুশমনরাজ খতম হবে, নয়তো নয়! আজ ক-জনা হাসে, হাজার জনা, মুণ্ডার কেঁদে কেঁদে দিন যায়। রাজ ফিরে পেলে তবে মুণ্ডা হাসবে।'

'সাবোধান হে তোমারা!'

বিরসা অল্প-অল্প দুলতে লাগল, এই মাঘের শীতেও ওর কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে, কর্‌মির মনে হল ওর চেহারা শীর্ণ, আর দুই ভ্রুর মাঝের রেখাটি চিরস্থায়ী হয়ে গেছে, আর তীক্ষ্ণ নাকের পাটার দু দিকের রেখা ঠোঁটের কোনা বরাবর তেরছা হয়ে নেমে এসেছে। কর্‌মির মনে হল, ওর জন্মের পর চব্বিশটি, 'হোলি'ও যায়নি। এখনি বিরসা,

ওর বাপ-ঠাকুর্দা পরদাদা বয়সী যে-সকল মুণ্ডা তাদের চেয়েও যেন বৃদ্ধ হয়ে গেল। মনে হল, আমার জোয়ান ছেলে। নতুন আরান্দির বউ নিয়ে সংসার করবে, কিন্তু নিয়তি এমন যে, মুণ্ডাদের সকল দারিদ্র্য-বঞ্চনা-অনাহারের বোঝা ও নিজের কাঁধে টেনে নিল।

'সাবোধান হও হে তোমরা, এ ধরতি নাশ হবে মহাপ্রলয়ে। আমি ধরতি চোটায়ে পাতালের জল বহায়ে দিব। পাহাড় ভেঙে সমান করে দিব। দুশমনের সৈন্য যেথা হতে যেথা পলাক, আমি টেনে বাহির করা আনব! কোথা পালাবে তারা?...

'জয় মোদের হবেই। সেদিন তোমরা বুক চিতায়ে, হাত তুলে, গোঁফ চুমরায়ে আনন্দ করবে। যারা মোরে মানবে না, তারা ধূলা হয়ে যাবে। যারা মোরে মানবে আমি তাদের দেখব।'

আঁজলা ভরে জল নিয়ে বিরসা সকলের উদ্দেশে ছিটিয়ে দিল। বলল, 'কাল হতে মোরা দিকে দিকে যাব। উলগুলানের আগে পিতা-পুরুষের আশীর্বাদ চাই। কাল সবে চুটিয়া যাব হে। মোর পিতা-পুরুষ সেই পূর্তি মুণ্ডা চুটিয়া যে ঠাইয়ে সিং-বোঙা পূজতে বেদী করছিল, সেথা রঘুনাথ রাজা তিনশো বছর আগে মন্দির বানায়েছে। সে-মন্দির বানায়েছে। সে-মন্দির হতে তুলসী নিব।'

'আর—।'

কর্‌মি উঠে দাঁড়াল।

—'কি বল হে তুমি!'

—'কনুর বাপ বলা দিক!'

সুগানা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আর সেথা আছে তামার পাটা। তামার পাটায় লিখা আছে, যারে দিকুরা ছোটনাগপুরে বলাছে, রেকর্ড করাছে, সেথা মুণ্ডাদের সকল অধিকার। সে পাটা মন্দিরে আছে, মোদের নিতে হবে। তুমি ধরতি-আবা। আমি তোমার বাপ হয়াও তোমার সেবকটা হয়াছি। সে পাটা নিতে হবে।'

—'নিব। কাল মোরা বোর্তোদি যাব। সেথা হতে চুটিয়াতে তিনো দলে ভাগ হয়া যাব। পহেলা দলের মাথা হবে বনপিরির রোকন মুণ্ডা, দোসরা দলের মাথা হবে মোর দাদা কোম্‌তা। আমি মাথা হই তেসরা দলে। আজ সবে জেনে রাখ, ধর্মে রইলে তারে দেখে। পহানের পা ধরে মোরা বলি দিব না। রোগেভোগে ডাইনওঝা দেওঁরার কাছে যাব না। কিন্তু পিতা-পুরুষ যা বলাছে স্বর্গে সিং-বোঙা, ধরতিতে পঞ্চকো, মাঝে রয় সরকার, এ-কথা মোরা মনে রেখে চলব। সিং-বোঙারে চাই না, আমি ধরতি-আবা! সরকার মোরা গড়ে নিব। কিন্তু পাঁচজনের পঞ্চকো রইবে, সমাজটা দেখবে। কাল মোরা সবে যাব। পিতা-পুরুষ জানবে মুণ্ডারা শুধু ঘুমায় না, বেঁধে মার খায় না, তারা জেগে উঠাছে।

বিরসাইতরা একসঙ্গে গাইল,

> সিরমারে ফিরুন রাজা জয়!
> ধরতিরে পুড়োই রাজা জয়!
> ('জয় স্বর্গের ঈশ্বরের
> জয় পৃথিবীর ভগবানের)!'

এখন পুরুষরা চুপ করল। মেয়েরা গুঞ্জন করে গাইতে লাগল,

'সিরমারে ফিরুন রাজা জয়।

'ধরতিরে পুড়োই রাজা জয়।'

কর্‌মি যায়নি, কোনো বিরসাইত মেয়েই যায়নি। 'আগে ঘরে এসে বলা যেও বাপ,' কর্‌মি বিরসাকে বলেছিল।

ওরা এখানে আসবে আশায়-আশায় কর্‌মি বাড়ি-ঘর লেপে পুঁছে ফেলল। বিরসা চালকাড়ে এলে নতুন ঘরে থাকে। উঠানের ওপাশে আরও আরও চালাঘর উঠেছে। অনেক বাড়িতেই ঘর উঠেছে নতুন-নতুন। আগে মুণ্ডা ছেলেমেয়ে বিয়ের আগে গিটিওরা'য় থাকত ইচ্ছে হলে। এখন বিরসার প্রভাবে বহু পুরানো রীতির সঙ্গে 'গিটিওরা'-বাসও উঠে গেছে। তাই যার পাঁচটি ছেলে, তার ঘর দরকার।

কর্‌মির ঘরের চারিদিকে তাই নতুন-নতুন ঘর। বিরসার ধর্মে সকলকে পরিষ্কার থাকতে হয়। ঘরে-ঘরে কাঠের মাচায় খড় ফেলে চাটি বিছানো। বিরসার ঘরের মেঝে ও দেওয়াল কর্‌মি একবার রাঙামাটির গোলা দিয়ে লেপল। আবার রাঙামাটি শুকোলে ছাইরঙা খড়ের কুচি মিশিয়ে লেপল। শুকিয়ে যেতে সব ঝলমল করতে লাগল।

বৃহস্পতিবার বিরসার জন্মবার। সেদিন কোনো জীবহত্যা করবার নয়। ফাঁদ কেটে কর্‌মি খরগোশ দুটো ছেড়ে দিল। তারপর পলাশগাছের নিচে চাটির আসনে বসল। বিরসা এলে এই পথে আসবে।

কিন্তু বিরসা এল না। এল সুনারা।

—'হ্যাঁ রে, সে এল না?'

—'না গো। হেথা আসে? বোর্তোদি হতে যাত্রা করাছে, হোথাই ফিরতে হবে।'

—'হোথাই ফিরতে হবে?'

—'হ্যাঁ গো। আমি খবর দিতে এলাম ভগবান পাঠায়ে দিল।'

গ্রামের অন্য মেয়েরা, বৃদ্ধরা, বালক-বালিকারা এসে পড়ল। সুনারাকে ঘিরে দাঁড়াল। সুনারার খুবই গর্ব। সবাই ওকে দেখছে, ওর কথা শুনবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান এলে ওকে দেখত কে, কে শুনত ওর কথা? কনু কর্‌মির ছোট ছেলে এলেও কেউ সুনারার কথা শুনত না। কনু যখন কথা বলে সব কাজ ফেলে শুনতে হয়।

—'বল রে নানক!'

—'দাঁড়াও হে, টুকে জিরাই। সে কি একটা কথা?'

—'জিরাস পরে। আগে বল্‌।'

'শুন তবে! মোরা তো বার্তোদি হতে সার বেঁধে চললাম। পথ অনেক। একদিনে যাবার নয়। কোথা বোর্তোদি কোথা চুটিয়া। ভগবান বলে দিয়েছিল, সেইমত কোম্‌তা, রোকন, দুজনাই যে সুধায় তারে বলল, মোরা জম্বুলে হতে আসি গো! চুটিয়া যাব, সেথা ছুঁত বাঁচায়ে বাহির হতে পূজা দিব। একথা শুনে কেউ মোদের কিছু কথা বলল না। মোদের সাঁঝ হল হাটিয়া পৌঁছাতে। সেথা কাঁঠালগাছের নিচে মোরা আগুন জ্বেলে পাক করলাম, খেলাম। সেথা ভগবান মোদের কথা শুনাল। কেমন কথা জান?'

—'বল।'

—'সে পাথর-মাটির কথা। নিচে তিনিটা পাথর, পাথরের পরের মাটির তাল, উনান হয়াছে। ভগবান মাটিতে হেলান দিয়ে শুয়েছিল। বলল, দেখ হে! পাথর উঁচায় মাটি নিচায় দেখ।'

—'জয় ভগবান।'

—'সবে বারে বারে দুবার দেখল পাথর নিচায়, মাটি উঁচায়! ভগবানরে সে-কথা জানাল। কিন্তু ভগবান আবার বলল, দেখে এস পাথর উঁচায় মাটি নিচায়। সবে গিয়ে দেখল, উনান যেমন জ্বলাছে, তেমন তাতে শুকায়ে মাটির ডেলা গড়ায়ে পাথরের নিচে পড়াচ্ছে! হ্যাঁ গো!'

—'হাই গো।'

—'তখন ভগবান সকলেরে বুঝায়ে দিল, দেখ! দিকুরা আজ তোমাদের উপরে উঠাছে, তোমাদের নিচে ফেলাছে। কিন্তু উলগুলানে সকল জ্বলবে। তখন তার তাতে তোমরা উঁচায় উঠবে ওরা নিচায় পড়বে।'

বীরসিং মুণ্ডার বড় গিরি মুণ্ডনী কেঁদে ফেলল। কর্‌মিকে বলল, 'হা রে! তোদের মেয়ে-পুরুষকে হেথা বসত করাল আমার মরদ! ভগবানকে এতটুকুটা নিয়ে তুই এলি। মোর কাছে রেখে বনে যেতিস কাঠ কুড়াতে। ঝর্ণা যেতিস মাছ ধরতে। তোকে বলি নাই এ আশ্চর্য ছেলা? এর মুখে চাঁদ-সূর্য খেলা করে?'

বীরসিং মুণ্ডা বলল, 'হোঃ! তুই চিনাছিলি! আমি যদি না চিনব, তবে ওদের আনা করব কেন?'

কর্‌মি বিরক্ত হল, কিন্তু ভগবানের মা হলে ক্ষমা করতে জানতে হয়। বিরক্ত দেখানো চলে না। সে বলল, 'তোমরা আশ্রয় দিয়াছ, প্রাণ রেখাছ, যতদিন ঘর তুলি নাই, থাকতে ঘর দিয়াছ, সেকথা আমি সবারে বলি গো!'

বীরসিং মুণ্ডা বলল, 'এখন শুন, নানক কি বলে! আহা, আমি গেলে, আমি পুরাণক স্বচক্ষে দেখতাম গো, কিন্তু দেহে জ্বর, রোগ হলে দেহ অশুচি হয়, তাই ঘরে থাকলাম। তুই বল্ বাপ।'

সুনারা বলল, 'হাটিয়া হতে মোরা চুটিয়া গেলাম। রাঁচি এত কাছে সবে মনে মনে ভাবল সাহেব জানলে কি হবে। কিন্তু ভগবানের মুখ দেখে সকল ভয় গেল। চুটিয়াতে গাছের নিচে মোরা পিতা-পুরুষ, আদি দেবতা, ধরতি-আবা, সবার গান গেয়ে-গেয়ে নাচলাম কত! ওঃ, বুড়া ধানী খুব নাচ করাছে, লাফ মেরাছে বুড়া পায়ে, মোরা অমন পারি না। তা বাদে মন্দিরে ঢুকে মোরা সকল ঠাকুর নাশ করে দিয়াছি, তুলসী নিয়াছি, কিন্তু তামার পাটা পাই নাই খুঁজে।

—'পাস নাই?'

—'না।'

—'তা বাদে?'

—'তা বাদে মানুষজন এসে পড়ল। হল্লা উঠাল খুউ—ব। ভগবান বলল, মোদের

পিতা-পুরুষদের মন্দির, মোরা দখল নিলাম। দিকুদের ঠাকুর যত, স—ব অশুচ করা দিয়াছি। মূল-তুলসীগাছ উপড়ে নিয়া গেলাম।'

—'তা বাদে?'

—'মোরা চলে এলাম সিরুমটোলি। পথে ভগবান সকলরে বলে এল আর হেঁটনা হে। কাজ হয়া গিয়াছে। সিরুমটোলিতে মোরা ঘুমাই, তা পলুস প্রচারক বুঝি মিশনের কাজে গিয়াছিল। সে যেতে ভগবানরে উঠাল, জানি কি বলল। ভগবান মোদের জাগায়ে রাতের আঁধারে নিয়ে এল বোর্তোদি। বলল, চুটিয়া হতে পূজারী ঘোড় সেপাই পাঠায়ে রাঁচিতে খবর দিয়াছে। রাঁচিতে সাহেব বলাছে। সকাল হতে ঢোল পড়বে—ভগবান আবার মুণ্ডাদের খেপায়, দাঙ্গা করে, তারে যে ধরাবে, ইনাম পাবে। সবে এল, শুধা, চইতা, কাশী, রমাই মুণ্ডা আসে নাই, তারা মোদের সঙ্গে ছিল না।'

—'তারা ধরা পড়াছে?'

—'হ্যাঁ গো। সব কথা জেনে এলাম তাতেই তো একদিন দেরি হয়া গেল। কনু প্রচারক বলল চইতা, কাশী, রমাই বলাছে, মোরা কি করব? যা করছি, তা ভগবানের হুকুম! মোরা কোনো দাঙ্গা করি নাই। দারোগা নাকি হাঁকুড়ে বলাছে, মন্দিরে গিয়াছিলি কেন? ওরা বলাছে, গিয়াছি বলে তো সবে জানল এ-মন্দির মুণ্ডাদের পিতা-পুরুষের দেবথান।'

—'এখন ওরা?'

—'বোর্তোদি।'

—'সেথা পুলিস যাবে না?'

—'না জানবে না। আকালের সময় হতে ওধারে কোনো দারোগা যায় না হে! সব দশ মাইল দূরে থানায় বসে রিপোর্ট লিখা দেয়—যেয়ে দেখে এলাম সব ঠাণ্ডা আছে। ক'টা দারোগার ঘোড়া মেরে ফেলাল না ধানীরা? সে হতে ওরা ডর খায়'

কি ভেবে কর্‌মি বলল, 'পলুস প্রচারক। সে বিরসার ভাল চায় কবে হতে? এই উঠানে না সে পুলিশ সাথে এসে ঘিরাছিল?'

বীরসিং মুণ্ডা ও অন্যরা মৃদু ভর্ৎসনায় বলল, 'তুমি বড় বিস্মরণ হে। মনে মনে যা বল, মুখে "বিরসা" বল কেন?" এ ঠিক নয়,'

'ভুল হয়া যায় গো! মোর মাথা ঠিক থাকে না ওর চিন্তায়। কিন্তু মোর কথার জবাব দিলে না তুমি?'

বীরসিং মুণ্ডা শুকনো গলায় বলল, 'ওর জাতির কতজনা বিরসাইত আকালে মরল গত সনে। এখন সাহেবরা ভাবে ও মুখে দরদ দেখায়। মনে মনে মুণ্ডাদের সঙ্গে বিরসাইত হয়াছে। মুণ্ডারা ওরে একঘরা মত করে রাখে। তা বাদে পিটুনি খাজনা হতে মিশনের মুণ্ডারাও ছাড়ান পায় নাই। পলুস এখন কিছু অনিষ্ট করবে না।'

—'পরে করবে?'

—'এখন করবে না। ও হাওয়া বুঝে। হাওয়া ঘুরে গেলে কি করবে জানি না। মানে, যদি হাওয়া ঘুরত, উল্টা বইত, তবে কি করত জানি না। এখন কিছু করবে না।'

কর্‌মি মাথা নাড়ল! বলল, 'তুই কি করবি সুনারা?'

—'কাল ভোরে ফিরা যাব।'

—'কেন?'

—'জগন্নাথপুর হতে চন্দন আনব, নওরতনগড় হতে মাটি।'

—'এখন ওরা আসবে না?'

—'জানি না। নানক কিছু জানে? যা হুকুম সেইমত কাজ করে। তোমারে বুঝালাম কত!'

—'বুঝাস তো! আমি যে ভুলে যাই।'

বীরসিং মুণ্ডা বলল, 'ঠিক কাজ করাছে ভগবান। মোদের পিতা-পুরুষের যত ঠাঁই সব হতে আশীর্বাদ নিবে। কর্‌মি, তোমার বড় ভাগ্য হে।'

—'বড় ভাগ্য?'

অস্ফুটে বলে কর্‌মি ঘরে চলে গেল। কোম্‌তার বউ বলল, 'ভগবানের তরে মা রাতে চোরায়ে কাঁদে গো। তার ছোটবেলার কথা বলে আর কাঁদে কত। বলে শুধু ওর তরে মার বুক পুড়ে।'

—'অবুঝটা।'

সবাই একে একে চলে গেল।

জগন্নাথপুরে ওরা চলে গেল। তারপর খবর নেই, কোনো খবর নেই। বীরসিং মুণ্ডা আর অন্য পুরুষরাও চলে গেছে। কর্‌মি ঘর ছেড়ে যেতে পারে না, বিরসা তাকে বলেছে, 'মা! তুমি ঘর ধরে থাকো' কর্‌মির শুধু মনে হয় কি জানি কি বিপদ ঘটবে।

কাঁদতে পারে না, যদি অমঙ্গল হয়। সুগানাকে গাল দিলে আগে শান্তি হত, এখন হয় না। নাতনীদের চুল বেঁধে দিতে, গল্প বলতে মন চায় না। বউ বলল, 'মা, তুই কি উপাস করে শুখাবি? খাস না কেন?

—'দেহ ভাল নাই।'

—'বনে যাই? ওষুধ আনি? কি হয়াছে বল্‌?'

—'কিছু না রে!'

—'ঘুমাস না কেন?'

—'ঘুম নাই।'

—'তারা আসবে। ধরতি-আবার সঙ্গে গিয়াছে, তাতেই তো আমার মরদটা গিয়াছে। তবু মনে ভয় হয় না।'

সকালে উঠে কর্‌মি একটা খন্তা, একটা ঝুড়ি নিল। নাতনীদের বলল, 'চল্‌, বন হতে কন্দ আনি। খেয়ে দেখবি রাঁধলে কেমন হয়। চুল্‌, ঝুড়ি নে। কুল আনি, আমলকী শুকায়ে পড়ে আছে আনি। তা বাদে ঝর্ণায় চান করা আসব।'

ওরা বনে গেল। এ-বনে পলাশ, শিমুল, কেঁদ, পিয়াল, মহুয়া, পিয়াসাল, শাল গাছের মেলা। কোথাও-কোথাও পাহাড়ের ঢালে আমলকী ও বহেড়াগাছ। ফাঁকা জায়গায় বনফুলের ঝোপ।

খন্তা দিয়ে কন্দ তুলে কর্‌মি বলল, 'সবে সুলুক জানে না, তাই রয়াছে। নয়তো বন-বরা খুঁড়ে তুলত।

ঝর্ণার জলে ওরা স্নান করল। কর্‌মি বলল, 'তোরা ঘর যা।' আমি রোদে বসি খানিক। বুড়ো হাড়ে জাড় বেশি ধরে। হাড় কাঁপে।'

ওরা চলে গেল, রোদের ঝিম্‌ঝিমে তাতে পাকা চুল শুকালো কর্‌মি। আগে মুণ্ডারা যা যা করত এখন কিছুই তা করে না। হোলিতে 'জাপি' গান-নাচ হয় না, শিকার করতে যায় না মুণ্ডারা। পৌষ পূর্ণিমার 'মাগে' উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ির বাস্তুদেবতা, পিতৃপুরুষ, সকলকে অর্ঘ্য দেওয়া বন্ধ করতে কর্‌মি ভয় পেয়েছিল কিন্তু বিরসার ধর্মে 'মাগে' পরব নেই।

শালগাছে ফুল ফুটলে যৌবনে কর্‌মিরা 'বা-পরব' করেছে। মাথায় ফুল পরে মেয়ে-পুরুষে নেচেছে কত। বিরসা তাও তুলে দিল। যত পরবে বোঙা-বুঙির পুজো, বলিদান, হাড়িয়া পান, নাচ ছিল স—ব তুলে দিল বিরসা। 'করম' পুজোর নাচ, 'পাইকা' নাচ, সব বিরসা বন্ধ করে দিল। মেয়েদের ফুল পরা, পুরুষদের মাথায় কাঁকই গোঁজা, কানে গহনা পরা বন্ধ হয়ে গেল।

—'হা রে, তুই স—ব তুলে দিলি?'

বিরসা মাকে বলল, মুণ্ডার জীবনে শুধু দুঃখ। এত বোঙা-বুঙি পূজে, নেচে গেয়ে সে-দুঃখের আসান হয় কিছু? 'করম' তাদের পূজা নয়, হাড়িয়া তারা আদিতে খায় নাই। আমার নতুন ধর্ম যে অন্য রকম মা! আমি তাদের দুলাই না, ভুলাই না। তাদের বাঁচতে শিখাব, মরতে শিখাব। আবার মারতেও শিখাব। তবে নতুন রীত-করণ হবে না মোর ধর্মে?'

—'তুই-ই বল্‌।'

—'ও এমন ধর্ম নয় যে! বিরসাইত হতে হলে নূতন জন্ম নিতে হবে। পুরানো রীত-করণ ছাড়তে হবে। কষ্ট করতে হবে।'

শীতের রোদে, মৃদু ঠাণ্ডা বাতাসে, পাতার ঝরঝর-সরসর শুনতে শুনতে কর্‌মির মনে হল সেই কবেকার কথা। মা ওদের কোলের কাছে নিয়ে উঠোনে বসত। ছোলাশাক বাছতে বাছতে কবেকার গল্প করত পাথর-মা'র কথা।

কর্‌মির মা বেশ গল্প বলত। গাছ-লতা-ঘর-দাওয়া খুঁটি-বান ঢেঁকি-কুলো স—ব নিয়ে একেকটা গল্প বলতে পারত। পাথর-মা'র গল্প বলত, সেই কোন্‌ যুগে কোন্‌ মা'র কোন ছেলে বলেছিল, 'মা তুই ভাত রাঁধ, আমি ভাতের ফেন না জুড়াতে শিকার খেলে ফিরে আসব।' তখন পুরাকাল। সকল মুণ্ডা ভাত খেত।

কিন্তু তখন দেশে আড়াকাঠি এসেছিল। আড়াকাঠি সে-ছেলেকে নিয়ে চলে যায়। ছেলে আর আসেনি। ছেলের জন্যে বসে থেকে থেকে মা পাথর হয়ে গিয়েছিল।

কর্‌মি নড়ে-চড়ে উঠল। সে কেন এইসব অলক্ষুনে কথা ভাবছে?

সে কবেকার কথা? যখন কর্‌মির পিঠ সোজা ছিল, চুল কালো। মাথায় পোঁটলা নিয়ে স্বামী তার দেওরের সঙ্গে খেত-মজুরের কাজের খোঁজে কুরুম্‌দাতে এসেছিল? ক-বছরই

বা ছিল? বড় ছেলে কোম্‌তা, বড় মেয়ে দাস্‌কির জন্মাল। তখন কর্‌মি ভাবত এই তো বেশ জীবন। দিন আনি, ঘাটো খাই, বেশ আছি।

সেখান থেকে বাম্‌বা। চম্পা হল, বিরসা হল। বাঁশের ঘর, বেড়ার দেওয়াল, চাল খসে পড়ে। কর্‌মি ভাবত এই তো বেশ জীবন। দিন আনি, ঘাটো খাই, বেশ আছি। ছেলেমেয়ে, ওদের বাপ তো কাছে আছে।

সেখান থেকে চালকাড়! কেউ পৌঁছে না। কেউ জানে না ঘরে ভগবান জন্মেছে বলে। মেলাতে বেনের ছেলের গায়ে লাল জামা দেখে কর্‌মির কত সাধ হয়েছিল অমন লাল পিরান ছেলেদের পরায়।

ছেলেমেয়েদের খালি খিদে পেত। কর্‌মি কোলের ছেলে কনুকে পিঠে বেঁধে বলোয়া হাতে জঙ্গলে ঢুকে কুল-বেল-আমলকী-কচু-কন্দ শাক-খরা-শজারু, যা পেত তাই এনে ওদের খাওয়াত। কখনো বলেনি, 'না, ঘরে কিছু নাই।'

তখন সুখ ছিল না, এখন? এখন সবাই জানে, একডাকে চেনে। সবাই মান্য করে গাছের ফল, তরকারি, ছাগল-গাইয়ের পয়লা দুধ আগে কর্‌মিকে দেয়। তবে খায়। কোল-মরুনীর শাশুড়ী বউকে এনে কর্‌মিকে বলে, 'টুকে ছুঁয়ে দে গো। তোর একটা মরে নাই, 'জে'ওন্তী পোয়াতি' তায় ভগবানের মা।' বলে, 'কে জানে আশ্চর্য ছেলা হবে! আখারায় নাচাত, বাঁশি বাজাত। দেখ্ কেন ওর নাক উঁচা, কোনো অঙ্গটা মুণ্ডাদের মত নয়, তা নিয়া বলছি কত! ভাবতাম, বুঝি চুটিয়া-নাগুয়ার বংশধর, তাই! না রে! এখন বুঝি ভগবান হবে বলে অত রূপ হয়েছিল ওর!'

এখনই সুখ! কর্‌মি মাথা নাড়ল। আগে পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে একা বিরসা এমন করে বুক জুড়ে বসেনি। এখন বসেছে। চোখ মুছল ও। ভগবানের মাকে কাঁদতে নেই।

হঠাৎ কান খাড়া করল ও। নাগরা বাজছে। জয়-জয়ধ্বনি। কর্‌মি ছুটতে শুরু করল।

বিরসা এসেছে। নতুন ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়েছে, ধূলিধূসর পা। কর্‌মিকে দেখে বিরসা নেমে এল। বলল, 'কোথা গিয়েছিলি? তোকে দিই নাই, তাই চালকাড়ে আর কারেও জগন্নাথপুরের চন্দন দিই নাই। চন্দন পরবি বলে স্নান করাছিস?'

—'হ্যাঁ, তাই না! দে!'

হাত জোড় করে কর্‌মি চন্দন পরল কপালে। সকলেই কপালে ফোঁটা পরল।

বিরসা বলল, 'নতুন চাল, পয়সা নিয়ে জগন্নাথপুরে গেলাম। তিন'শ বছর আগে ঠাকুর আইনী শাহী মন্দির করাছিল মোদের দেবথানে। মুণ্ডা সে মন্দিরে কোনোদিন ঢুকে নাই, পাছে ঢুকে তাই গড়ের মত পাঁচিল ঘিরাছে। মন্দিরে ঢুকলাম, আমার হাতে যা ছিল, চারদিকে ছিটালাম। তা বাদে মন্দির হতে চন্দন নিয়ে সবারে পরালাম।'

—'এত দেরি করলি?'

—'সেথা হতে বোর্তোদি এলাম। তা বাদে ক-জনারে নিয়ে কোয়েল নদীর উপর নাগফেনী গেলাম। সেথা হতে পালকোট হয়ে এলাম। এখন বাকী নওরতনগড় হতে মাটি আনা। কিন্তু নওরতনগড় হতে মাটি আনলে পরে উলগুলান করতে আর দেরি করলে হবে না। তাই। মুণ্ডাসকল! এখন হতে কাজ শুরু হবে। সে-কাজ হবে বোর্তোদি হতে।

চালকাড় হতে বন্দ্গাঁও কাছে। এখানে সহজে আসা যায়। বোর্তোদি জঙ্গলের বুকে, পাহাড় ঘিরা। সেথা-ই আমার ঘাঁটি হবে।'

শুনে কর্‌মির বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ল।

বিরসা বলল, 'উলগুলান এসে গিয়াছে।'

কর্‌মি কানে হাত চাপা দিল। ও বুঝল চালকাড়ের জীবনে দাঁড়ি টেনে দিচ্ছে বিরসা। উলগুলানে নেমে পড়লে আর বিরসা ওর কাছে ওর ছেলে হয়ে ফিরবে না। যদি আসে, তবে ভগবান হয়ে, যোদ্ধা হয়ে আসবে।

কর্‌মি তবে পাথর-মা হয়ে যাবে? অপরূপ-অলৌকিক-আশ্চর্য কিছু তো আর ঘটবে না। অলৌকিকের জগৎকে যে বিরসা নির্বাসন দিয়েছে মুণ্ডাদের জীবন থেকে।

কর্‌মি তাই নিষ্প্রাণ পাথর হবে না। ফাটল-ধরা কালো পাথরের মতো রেখাঙ্কিত মুখে নিথর হয়ে বসে থাকবে। সবাই ওকে দেখিয়ে বলবে, 'ওর ছেলা মানুষ ছিল, ভগবান হয়ে গিয়াছে উলগুলান-খেপা ভগবান। তাতেই মা পাথরপারা হয়ে গিয়াছে।'

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল কর্‌মি। সকলে হাত জোড় করে গান করছে। কর্‌মিও হাত জোড় করল। গাইতে লাগল কান্নাভেজা গলায়।

'সিরমারে ফিরুন রাজা জয়।
ধরতির পুড়োই রাজা জয়।'

১৭

চালকাড় থেকে বর্তোদি।

কর্‌মি ভয়ে ভয়ে সুগানাকে জিগ্যেস করল, 'মোদের কি দোষ হয়া গেল কোনো?'

—'কেন? দোষ হবে কেন?'

সুগানা একটু অবাক হল। সুগানা আজকাল একটা আবিষ্ট আনন্দের নেশায় রাতদিন সুখে থাকে। এত সুখ হবে, তারই হবে, তা ও জীবনেও জানেনি। সে ছিল গরিব, হতভাগা। এখন ও ভগবানের বাপ, ওর ঘরে চাল থাকে, লবণ থাকে। ও পরিষ্কার কাপড় পরে, গ্রামের পাঁচজন ওকে মান্য দেয়। এত সুখ, এতে নেশা ধরে যায়। কোনো মহুয়া-তাড়ি-হাড়িয়াতে এত নেশা হয় না। সে-নেশা রাত পোহাতে কেটে যায়। এ-নেশা কাটে না। কর্‌মি সুখে নেই দেখে সুগানা অবাক হল।

সুগানা অবাক হল। ওদের সমাজ পুরুষশাসিত নয়। ওরা স্ত্রী-পুরুষ সমান খাটে, সমান আয় করে, সমান সমান পায়। মায়ের সম্মান মুণ্ডা সমাজে খুব উঁচুতে। কর্‌মি চিরকাল সে-সম্মান পেয়েছে। গর্বে মাথা তুলে কর্‌মি ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

কিন্তু কর্‌মি এত দীন ও করুণ কেন? এমন ভয়ে ভয়ে সে বিরসার কথা বলে কেন?

সুগানা আবার বলল, 'দোষের কথা কি বলিস্?'

—'সে চালকাড় হতে ডেরা উঠায়ে বোর্তোদি যায় কেন? তাই শুধাই, দোষ করেছি কিছু?

—'না না।'

—'তবে? সেথা ডোন্‌কা মুণ্ডার ঘর তার ঘাঁটি হয়া গেল কেন?'

—'তুই বুঝিস্ না।'

—'বুঝি। ডোন্‌কার বউ সালীকে দেখাছ?'

'দেখাছি। দলমলা মেয়া।'

—'খু—ব দলমলা। নদীর মত মেয়া। আষাঢ়ী নদী।'

—'তাই।'

—'বিরসারে দেখলে নদীতে বান ডাকে।'

—'ছিঃ কি? তার মুখে বাতি জ্বলে।'

—'ছিঃ!'

—'আমার ছেলারে আমি জানি। কিন্তুক—তারে ঠাঁই দিলে বিপদ। জেহেল-ফাটক হতে পারে। মোরা বাপ-মা, মোরা বিপদ মাথায় নিতে পারে। সে বিপদ নেয় কেন?

—'তারা বিরসাইত হয়াছে।'

—'তোমার ওই ছেলা আগুন জ্বালায়ে দিবে। তার মুখের হাসি দেখার তরে মুণ্ডা মেয়েরা যেয়ে আগুনে হাত পুড়াচ্ছে। আমি জানি সব।'

—'বলিস্ না ও-কথা।'

—'সে ত পাষাণ! লয় ত আরান্দি করত একটা দলমলা মেয়া। ঘর করত কোম্‌তা কনুর মত।'

বড় ছেলে কোম্‌তা হেসে বলল, 'মা! তুই আবুঝ হলি কেন? যত চাঁদ পার করলে মানুষ আবুঝা হয়, তত চাঁদ ত পার করিস্ নাই তুই?'

—'দেখ্ কোম্‌তা! রাগাস্ না মোরে।'

—'রাগ করলি তুই?'

—'করলাম।'

—'কেন?'

—'একটা কথা শুধালাম, জবাব পেলাম না। বিরসাইতের ধর্মে আছে, সকলেরে সকল কথা বুঝাতে হবে। এ দেওঁরা-পহানের ধর্ম নয়। তারা কোন কথা বুঝায় না। তারা হুকুম করে, মুণ্ডা হুকুম মানে। তোরা কেন বুঝাবি না? বল্ কোম্‌তা?'

—'যাঃ, আমি অত কথা জানি না।'

—'কি কাজে যাস্?'

—'ঘরে ঝাঁপ বাঁধব।'

—'এখন কি?'

—'কবে যেতে হবে বোর্তোদি। তখন সময় পাব না কি? সময় দিবে ভগবান?

করমি নাক কুঁচকে বলল, 'তোরা ঝাঁপ বাঁধবি? তুই বাঁধিস্, কনু বাঁধে, ঝাঁপ খুলে যায়। সে ঝাঁপ বাঁধত, কোনদিন খুলে নাই।'

কোম্‌তা একটু ক্ষুণ্ণ হল। বলল, 'মা! তার দুস্কে তোর বুদ্ধি হরা গিছে! সে ঝাঁপ বেঁধাছে কবে? সংসারে কোন্ কাজটা করাছে? কাজ করাছি আমি, কাজ করাছে কনুটা।'

সুগানা বুঝল বড় দুঃখে কর্‌মি উল্‌টা-পাল্‌টা কথা বলছে। সে বলল, 'আয় হেথা, কথা শুন্‌, কাছে বস্‌।'

—'হেই! হাত ধর না। বিরসাইত হয়াছ।'

'না না, নিষেধ ভুলি নাই। বস্‌ হেথা।'

—'এই বসলাম।'

—'দেখ্‌, চালকাড়ের নাম এখন সরকারের খাতায় উঠে গিয়াছে।'

—'কেন?'

—'তার ডেরা বলে।'

কোম্‌তার বড় মেয়ে বলল, 'গান শুনিস্‌ নাই ত। চালকাড় লয়ে কত গান।'

—'কিরকম?'

"কোন দেশেতে নূতন রাজার জন্ম হল হে?
হা তুই মুখ তুলে দেখ আকাশে ওই ধূমকেতু।
চালকাড়েতে নূতন রাজার জন্ম হে।
পশ্চিমে ওই ধূমকেতু।
মুণ্ডারাজ ফিরাবে তাই নূতন রাজার জন্ম হে!
ধরতিটারে শুদ্ধ করে দিবে যে ওই ধূমকেতু!"

—'বলিস্‌ কি? চালকাড় লয়ে গান?'

—'ক—ত!'

"বনের মাঝে চালকাড় গ্রাম ধরতি-আবার জন্ম হে!"—আবার, "সূর্য-পারা চালকাড়েতে উদয় হলে বিরসা!"—আবার "দিনে রাতে ধরতি-আবা গান করে। পাহাড়বনের কোলে—চালকাড় যাই চলে—সেথা ধরতি-আবা গান করে।"

কর্‌মি বলল, 'তার জন্ম ত হেথা নয়?'

—'তা কে জানে? বাম্‌বায় জন্ম তা কে জানে? সবাই জানে হেথাই জন্ম।'

—'কি কাণ্ড, মা? তার জন্ম লয়ে এত গান, কই তা ত জানি না?'

সুগানা বলল, 'তবে দেখ্‌। চালকাড়ের নাম জানাজানি হয়া গিছে। রাঁচি হতে, বন্দ্‌গাঁও হতে, চালকাড়ে নিমেষে আসা চলে। পুলিশ নিমেষে চলে এসে তারে ধরতে পারে!'

—'তা পারে।'

—'বোর্তোদিতে পুলিশ যেতে পারে না। অনেক দূর। জঙ্গলের পথ খুব কঠিন। বোর্তোদির কাছে ডোম্‌বারি পাহাড়। ওই ডোম্‌বারি পাহাড়ের তরে বোর্তোদি ঘাঁটি করাছে। ডোম্‌বারি ত তুই দেখিস নাই।'

—'শুনাছি সে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘিরা।'

—'অ—নেক পাহাড়! সেল্‌ রাকাব্‌! কেরাওরা, বিচাবুরু, তিরিলকুটি কুরু! একটা দিক একটু খুলা, সেথা দিয়া ডোম্‌বারি ইলাকায় ঢুকা যায়। সে-মুখটা পাথর গড়ায়ে বন্ধ করে দিলে পুলিশ ঢুকতে নারবে।'

—'তোমরা সেথা যাবে?'

—'উলগুলান হবে যখন, পালায়ে থাকবার ডেরা চাই। হোথা পাহাড়ে জঙ্গলে পালাবার সুবিধা খুব। বোর্তোদি হতে সেসকল ঠাঁই কাছে হবে, তাই বোর্তোদি গিয়াছে। তোর আমার দোষে চালকাড় ছাড়ে নাই।'

—'তাই হোথা গিয়াছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ডো—ম্—বা—রি!'

—'ডোম্বারি।'

দুর্গম, দুরধিগম্য পাহাড়ে পাহাড়ে আকীর্ণ ডোম্বারির উপত্যকা। এখানে জঙ্গল ভীষণ ও দুর্ভেদ্য। কোনোদিন এ জঙ্গলে কোনো ঠিকাদার গাছ কাটেনি। কোনো গাছের গায়ে কুড়ালের কোপ পড়েনি।

—প্রাচীন শাল—পিয়াসাল—কেঁদ—বহেড়া—তেঁতুল—ছাতিম—পলাশ—সিধ—শিশম্—কুসুম—শিমুলগাছের বন। বাঁশগাছের ঝাড়, কন্টিকারী আলকুশির ঝোপ। কোথাও গোয়ালকেঁড়ে লতার জালে বনপথ ঢাকা। শরতে এ-বনে বনশিউলি ফুটে আলো হয়ে থাকে। বর্ষায় জন্মায় কুণ্ডীর বুকে অলনজি লতা। সে লতার ফুলে আশ্চর্য সুবাস।

এ বনে কোনো জনবসতি নেই। গাছের নিচের মাটি পচা পাতায় উর্বর ও সরস। সে মাটির বুকে সযত্নে ধরে রাখা সুমিষ্ট কন্দ ও মূল সংগ্রহ করে না কোনো মুণ্ডা মেয়ে। আমলকী আর পাকা কুল পাখিরা খায়। বাঁশের কোঁড়গুলিও এমনি বড় হয়।

শুধু মাঝে মাঝে চোখে পড়ে পাথরের চাঁই, পর পর সাজানো, বোঝা যায় কোনোদিন এখানে মুণ্ডাদের গ্রাম ছিল। এগুলি সমাধির ওপরের পাথর। তারপর তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে থাকবে।

এ-জঙ্গলে বাঘ-ভালুক-চিতাবাঘ-বুনো শুওর-হরিণ-নেকড়ে-হায়েনা নির্ভয়ে ফেরে। শিকার উৎসবের দিনে কোনো মুণ্ডা যুবক তাদের তীর বা বর্শায় বেঁধে না। পাহাড়ের খাদ দিয়ে নদী বয়ে যায় গভীর গর্জনে। সে নদীর জলে খেলা করে রুপোলি মাছ।

এ-জঙ্গলে ঢোকার পথ বলতে সুঁড়ি পথ। জানোয়ার চলার পথ দিয়ে মুণ্ডারা চলতে পারে, দিকুরা পারে না। দিকুরা খোঁজে সেই সব জায়গা, যার কাছাকাছি হাট-বাজার-থানা-ডাকঘর আছে। তারা খোঁজে সেইসব জায়গা, যেখানে কাছাকাছি ভাল রাস্তা আছে।

এ-জঙ্গল আজও মুণ্ডাদের। পাহাড়ের কোলে, জঙ্গলের বুকে, জলধারার কাছাকাছি বোর্তোদির যত ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে সেসব গ্রাম পাথরের চাঁই আর ফণিমনসার বেড়ায় ঘেরা। দুর্গের মতো সুরক্ষিত।

ডোম্বারি পাহাড়ের নিচে জাগরী মুণ্ডার বাড়িতে বিরসাইতরা প্রথম সভা করল। ফেব্রুয়ারি মাস। প্রচণ্ড শীত। জাগরী মুণ্ডার ঘর নিকিয়ে পরিষ্কার করা হল।

উঠোনে জ্বলল ধর্মচুলো। সকল বিরসাইত চাল-ডাল-চীনাদানা-গোটা মসুর—জংলী বরবটি-শিমের দানা—যারা যেমন সাধ্য এনেছিল। সব একটা কড়াইয়ে সেদ্ধ হল, সবাই একসঙ্গে বসে খেল।

তারপর সবাই ঘরে এসে বসল।

বিরসা বলল, 'দেখ! খুলাখুলি বলি। কি করতে চলাছি, তা সকলে জেনে নাও। চক্ষু বন্ধ করে তোমরা উলগুলানে নাম, সে মোর ইচ্ছা নয়।'

'বল হে ভগবান।'

'পথ দুইটা আছে।'

'কিরকম?'

'একটা পথ, শান্তির পথ।'

তিবাই মুণ্ডা প্রাচীন দিনের সর্দার। বহুবার সে আন্দোলনে শামিল হয়েছে। তিবাই লোকটা রগচটা খিটখিটে। ও বলল, 'শান্তির পথে তুমি মুণ্ডার হাতে মুণ্ডারীরাজ এনে দিবে?'

'পথ যখন আছে, বলতে আমাকে হবে।'

'বল তবে, শুনা যাক্।'

'শান্তির পথে গেলে কতদিনে ফল পাব তা জানি না। সে-পথে গেলে ইষ্ট পেতে সময় লাগে।'

'কি সে-পথ?'

'তিবাই! তুমি বুড়ো সর্দার, তোমাকে আমি কি বলে দিব? তোমরা, সর্দাররা, সেই পথেই যেয়েছ এতকাল। সে হল আর্জি পাঠাও আইনের পথে লড়।'

'অনেক লড়েছি। যত কাগজে সর্দাররা আর্জি লিখায়েছে, কাগজ বিছায়ে দিলে ছোটনাগপুর ঢেকে যায়। যে-কালি লেগাচে, সে-কালি এক সাথে করলে নদীতে হড়পা বানে তত জল হয় না।'

জাগরী মুণ্ডা বলল, 'শুনতে দাওনা হে! তিবাই, বড় কথা কও তুমি!'

ডোন্‌কা বলল, 'বল হে ভগবান!'

বিরসা বলল, 'বন কেটে জমি হাসিল কর না, তবে ঘরের ছামুতে সবজি আবাদ কর। আম কাঁঠালগাছে বেড় দেও, ফলপাকড় বেচ। মহাজন ডাকলে বেঠবেগারী দাও। তীর-বলোয়া-বল্লম-বর্শা-কুড়াল উঠায়ে রাখ। আইনের পথে হকের জন্য লড়। এ হল শান্তির পথ। দিকুদের ভিতর, মিশনের সাহেবদের ভিতর, রাঁচি চাইবাসার বাবুদের ভিতর অনেক আছে, যারা মুণ্ডাদের কথা ভাবে আর মুণ্ডাদের দুঃখ কিভাবে ঘুচবে তাই ভাবতে যেয়ে টেবিলে-চৌকিতে বসে চা-দুধ খেতে খেতে দুঃখ করে। তোমরা শান্তির পথে চললে তারা খুশি হবে, ভেবে দেখ।'

জাগরী মুণ্ডা বলল, 'শান্তির পথে বড় কাঁটা হে ভগবান। আইনের পথে যেয়ে আমরা ঠকে এসেছি।'

তিবাই মুণ্ডা বলল, 'অন্য পথটা কি?'

বিরসা হাসল। হাসলে ওর ভেতর থেকে আলো জ্বলে ওঠে। মুখের হাসি মুছে গেলেও চোখ দুটি অনেকক্ষণ ধরে হাসিতে ঝলমল করে। হেসে, মধুর ও প্রসন্ন গলায় বিরসা বলল, 'কেন? লড়ায়ের পথ?'

—'সে-পথে কাঁটা নেই?'

—'নিশ্চয় আছে!'

—'তবে?'

বিরসা বলল, 'লড়ায়ের পথে কাঁটা অনেক, দুঃখ আরও বেশি। হয়ত বা সংসার ছাড়তে হবে, উপোসে মরতে হবে, জেহেলে রইতে হবে। কিছু আন পথ নাই।'

—'সত্যিই নাই।'

তিবাই বলল, 'তবে তুমি যে সে-পথে নিয়া যেতে চাও?'

—'কেন নিব না?'

—'কেন নিবে ভগবান?'

—'আমি যে তোমাদের ভগবান। আমি কারেও দুলাব না কোলে তুলে। ভুলাব না। আমার তরে তোমরা বসেছিলে, আমারে পেয়েছ। আমি তোমাদের কাঁদাব, দুঃখ দিব, তোমাদের হাসাব, সুখ দিব।'

—'কেমন সুখ?'

—'স্বাধীন মুণ্ডারীরাজে স্বাধীন হয়া বাঁচার সুখ।'

তিবাই থেমে বলল, 'স্বা—ধী—ন মুণ্ডা—রী—রা—জ স্বা—ধী—ন হ—য়া—বাঁ—চা?'

—'হ্যাঁ হে তিবাই!'

বিরসা চুল্লীতে কাঠ ফেলল। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। আগুনের আঁচে শরীরে ওম্ লাগে। আগুনই মুণ্ডার শীতবস্ত্র। মুণ্ডা অন্য শীতবস্ত্র জানে না।

তিবাই যেন অভিভূত হয়ে গেল। বলল, 'আমার বয়স অ্যানেক হল। অ্যানেক চাঁদ পার করা দিলাম এমন কুন দিনের কথা মনে পড়ে না, মুণ্ডার অধিকারের জন্য লড়ি না। কিন্তুক একবারের জন্যও কুন বস্তুটা পেয়াছি বলে মনে পড়ে না। মোরে লাও ভগবান, তুমার পথে লাও।'

সকলের দিকে চাইল তিবাই, বলল, 'তুমরা কি বলবে জানি না। আমি বলি লড়ায়ের পথ। দেখ! যখন কচি গেঁদাটা, তখন হতে সবার মুখে শুনাছি একদিন মুণ্ডাদের ভগবান মুণ্ডা-ঘরে জন্ম লিবে। সি যিশু লয়, কিষ্ঞ লয়, সি মুণ্ডা। বিরসা মোদের সি ভগবান। চল ভগবান। তুর পথে যাব। ই দেহটা অ্যানেক কষ্ট করাছে, অ্যানেক ভোগ করাছে সুখ, তুর কাজে লাগুক এবার।'

বিরসা বলল, 'তোমরা কি বল?'

—'লড়ায়ের পথে যাব।'

—'হ্যাঁ ভগবান, লড়ায়ের পথে গেলে আর সেবক-পাট্টা লিখাবে না, জন্ম-দাস বানাবে না, বেঠবেগারী দিতে লয়ে যাবে না?'

গোত্না মুণ্ডা বয়সে কিশোর, তিবাইয়ের নাতি। সে বলল, 'ওঃ, ভগবানের রাজ হলে হরিনাম বেনিয়াটারে মারব খুব। বেটা মোরে দাঁড় করায়ে রেখে সকলরে সওদা দেয়। তু ত মুণ্ডা। তিন পয়সার সওদা করিস্।'

বিরসা বলল, 'দিকে দিকে সভা করতে হবে। দিকে দিকে সবার মত নিব। এবার সভা হবে সিম্বুয়া পাহাড়ে, হোলির দিনে।'

সিম্‌বুয়া পাহাড় সারোয়াড়া মিশনের মুখোমুখি। হোলির রাতে সে-পাহাড়ে আগুন জ্বলল। তাতে মিশনারীরা কিছু অবাক হলেন না। হোলিতে মুণ্ডারা আগুন জ্বালে, আগুন ঘিরে নাচে ও গান গায়। এবার আগুন জ্বলল, গান হল। কিন্তু এবার আর উৎসবের গান নয়। তিনশো মুণ্ডা তীরধনুক নিয়ে হাজির হল।

এবার হোলির গান শুরু হল মুণ্ডা জাতির দুই বীর দুখন সাই, রোতন সাইয়ের গান দিয়ে।

দুন্‌দিগারার দুখন কারেও ডরে না হে
রামগারার রোতন সাই কারেও ডরে না হে।।

তারপর মুণ্ডারা গাইল কোল বিদ্রোহের গান—

খুদা পিঁপড়া যেমন যায়, তেমন সার বেঁধে
কাঁদে হাতিয়ার নিয়ে ওরা কোথায় যায়?
কোথায় তীর ছোঁড়ে
বড় পিঁপড়ার মত সার বেঁধে, হাতিয়ার কাঁধে?
আগো ঃ এরা লড়ে বুন্‌দুতে
আগো! ওরা তীর ছোঁড়ে তামারে যেয়ে।।

বিরসা বলল, 'ইংরাজরাণীর প্রতিমা ওই কলাগাছটা। হোলিতে আমরা ওই মন্দোদরীর মাথা কাটব, বারণের রাজ খতম করব।'

জগাই মুণ্ডা এক কোপে কলাগাছ কাটল। বিরসা বলল, 'অমন করে রাজাদের আর হাকিমদের কাটতে হবে। এখন চল। নাগারা বাজিয়ে নাচি।'

কিন্তু হোলির আগুনের পক্ষে বড় বেশি সময় ধরে জ্বলেছিল আগুন। পরে পুলিশ এসে তদন্ত করে গেল। কিছুই বুঝল না।

তারপরের সভা হবে ডোম্‌বারি পাহাড়ে। বিরসা আবার বলল, 'দুইটা পথের কথা আবার বলছি। কোন্ পথে যাবে? তোমরা বল।'

নানকরা বলল, 'লড়াইয়ের পথে। যারা রাজ নিয়াছে, তারা ছাড়বে কেন? ছিনে নিব মোরা।'

—'এ-কথাও শেষ কথা নয়। ডোম্‌বারি পাহাড়ে সভা হবে। দিকে দিকে সভার প্রচার দিব। তবে তার আগে নওরতনগড়ে যেয়ে মাটি আনব। ডোম্‌বারির সভার আগে মনিহাতুতে সভা ফেল। সেধারে বিরসাইতদের সঙ্গে আমার মুখচিনা হয় নাই।'

মনিহাতুর সভার মানি পহানী বলল, 'মোদের কথা আছে, ভগবান!'

—'বল।'

—'মোরাও তোমার ভক্ত হে। লড়াই হলে মোরাও লড়ব। তুমি মোদের কোনো কাজে নিলা না, যেতে দিলা না কোথাও, এতে মোদের মনে দুঃখ উঠে গিয়াছে!'

—'নওরতনে তোমরাও যাবে।'

—'যাব?'

—'সবাই যাবে। সকল বুড়া, মেয়ে-ছেলে, সবাই যাবে। আমি বলে দিব। মোর

পিতা-পুরুষ নওরতনে প্রথম গড় বেঁধেছিল।'

—'জানি।'

—'বাদে স—ব দিকুরা দখল নিল।'

সরকার নিশ্চল হয়ে বসে ছিল না। কিন্তু এবার সরকারী চাকা এত ধীরে ঘুরছিল কেন তা অমূল্যবাবু বুঝতে পারছিল না। সাত-পাঁচ ভেবে অমূল্যবাবু ডেপুটি মুখার্জির বাড়ি গেল। মুখার্জি বললেন, 'বদলী হয়ে যাচ্ছি বলে দেখা করতে এসেছ অমূল্যবাবু?

—'হ্যাঁ। আপনি চক্রধরপুর চললেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আগে কলকাতা যাবেন?'

—'তাই তো ইচ্ছে।'

—'আমার একটা উপকার করবেন?'

—'বল। তুমি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, হাতে পইতে নিয়ে বলেছিলাম সাধ্যে যা থাকে, বললে করব।'

—'একটা খাম কলকাতায় গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিতে হবে। আর—'

—'আর কি?'

—'এ-কথা কাউকে বলবেন না।'

—'বেশ। তবে দেখো আমার যেন বিপদ না হয়।'

—'বিপদের কি আছে? তবে সরকারী কাজ করলে কোনো-কোনো বিষয়ে গোপনতা রেখে চলতে হয়।'

অমূল্যবাবু ওঁর চোখের দিকে চাইল। মুখার্জি চোখ নামালেন একবার মুণ্ডাদের জরিমানার টাকা নিজে লুকিয়ে দিয়ে তিনি দুজনকে খালাস করেন। সরকারী কাজে গোপনতা রেখে চলতে তো হয়ই।

বললেন, 'ঠিক আছে, চিঠি কই?'

—'কাল এনে দেব। কথা পেলাম এখন লিখব।'

—'জেকবকে চিঠি লিখছ?'

—'আপনি বুঝলেন কি করে?'

—'বুঝি রে ভাই, বুঝি। তোমার চেয়ে বিশ বছর বয়স বেশি। বুঝি না কি আর? আমিও অনেক ভেবেছি মুণ্ডাদের কেস নিয়ে। করবে কি। ও বেটারা আদালতে কি হয় এক বর্ণ বোঝে না। আইন করতে হবে, যে মুণ্ডারী জানে এমন উকিল কেস হাতে নেবে। মুণ্ডারী জানে এমন লোক বিচার করবে। ওরা কি বোঝে বল?'

'সে আইন কি কোনোদিন হবে?'

—'হওয়া উচিত। আসলে ওদের হয়ে বলবার কেউ নেই। ওদের কপাল এমন। বিরসা মুণ্ডা লেখাপড়া শিখেছিল। আরও শিখলে ওদের কথা বলবার উপযুক্ত মানুষ হত একটা। যেমন বুদ্ধি, তেমনি ঠাণ্ডা মাথা। আর ব্যবহার খুবই ভাল কিন্তু সে হয়ে বসল ভগবান।

অমূল্যবাবু হাসল, বেরিয়ে এল। জেলে, নিজের বাসায় ফিরে এসে ও লিখল 'বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল বিরসার কোনো খোঁজ নেই। চুটিয়া ও জগন্নাথপুর দু-জায়গায় যাবার পর সে উধাও হয়ে গেছে। রাঁচি ও সিংভূমের পুলিশ একজোটে বিরসাকে খুঁজছে। বন্দ্গাঁওতে পুলিশ-চৌকি বসেছে। সিংভূমের ডি এস পি বন্দ্গাঁও গিয়ে জমিদার জগমোহন সিং-এর সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। মান্‌কিদের ওপর হুকুমজারি হয়েছে। বিরসাকে ধরিয়ে দিলে বখশিশ মিলবে। এ-কথা তারা চাউর করে দেয়। শোনা যাচ্ছে মীআর্স বন্দ্গাও যাচ্ছেন। তিনিই আগেরবার বিরসাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।'

মীআর্স বন্দ্গাঁও গেলেন। চারদিকে পুলিশ পাঠালেন। গিডিয়ুন, মারকুস, প্রভুদয়াল, তিনজনকে ধরে পুলিশ ফিরে এল। সিংভূমের পুলিশ সুপারকে মীআর্স জিগ্যেস করলেন, 'তিনটি বুড়ো সর্দারকে ধরলেই হয়ে যাবে?'

সুপার বললেন, 'বেকার ছুটোছুটি করে কি হবে?'

—'দ্যাট্ বিরসা ইজ এ পোটেনশিয়াল ডেন্‌জার।'

সুপার বললেন, 'ওকে ধরলে বখশিশ মিলবে, সে-কথা তো জানানো হয়েছে হাটে-হাটে।'

—'তাতেই কি কাজ হবে?'

—'এখন ওকে ধরা যাবে না। এ অঞ্চলে জঙ্গল বিস্তর, জনবসতি নেই। জঙ্গলে এ-সময়ে খাবার প্রচুর মিলবে। গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাইলে এই সময়েই তো সুবিধে।'

—'হুম্।'

মীআর্স ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইলেন। সুপার বললেন, 'সরকারী কাজে ঢিলেমি করেছে খুন্‌টি থানার দারোগা মৃত্যুঞ্জয়নাথ লাল। তাকে জিগ্যেস করুন না।'

মৃত্যুঞ্জয় দারোগা বলল, কি ঢিলেমি করেছি সাহেব?'

—'বিরসা পাহাড়ে লোক জমায়েত করে নাচ গান করবে, খবর পাওনি? খোঁজিয়ালকে বলনি, পাহাড়ের উপর নাচছে, নাচুক যখন আইন ভাঙবে তখন ধরব?'

দারোগা সভয়ে হাত জোড় করে বলল, 'গোস্তাকি মাপ হয় হুজুর। এই খোঁজিয়াল বলে, হেথা বিরসাকে দেখা যাচ্ছে। দৌড়লাম বুন্দু। অজগর জঙ্গল হুজুর, দিনমানে বাঘ ফিরে। সেথা এক বেটা বুড়ো গাই চরাচ্ছে, তার নামও বিরসা। ও বেটারা বিষ্যুতে জন্মালে 'বিরসা' ডাকে। সেথা হতে ফিরতে বাঘের ডাক শুনে ঘোড়া ভয় খেল। জঙ্গলে মেরে ফেলে দিত আর কি। আবারও খোঁজিয়াল বলে বিরসা রোগোতো হাটে ঘুরে। খুব ছুটোছুটি করেছি হুজুর। তাতেই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।'

—'জগমোহন সিংহের ব্যাপারটা কি?'

ভয়ে দারোগা পা ঘষল। মুখ নিচু করে বললেন, 'ওরে আমি ডরাই হুজুর।'

—'তোমার ভয় কি? সরকারী নৌকর?'

—'আমি কিছু জানি না।' ভরত সিং বলুক। ভরত ওর জ্ঞাতি হয়। তারে জগমোহন কিছু বলবে না।'

ভরত সিং বলল, জগমোহন ভয় পাচ্ছে বিরসা ওর ওপর সাক্ষী দেবার শোধ তুলবে।

তাই, বিরসাকে ধরা করবার জন্য বন্দ্‌গাঁওয়ে পি. ডবলু. বাংলোয় টানাপাখা ছিঁড়ে দুটো পেয়ালা পিরিচ ভেঙে ও শোর তুলল বিরসা যেয়ে দাঙ্গা করেছে। কেস দাঁড়াল না হুজুর।'

—'হাউ সিলি!' সুপার বললেন।

মীআর্স চটে গেলেন। বললেন, 'বিরসাকে ধরার ব্যাপারটাও সিংভূম-পুলিশ যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না। খবর এসেছে প্রমাণাভাবে প্রভুদয়াল মুণ্ডাদের তিনজনই খালাস পেয়ে গেছে।'

সুপার বললেন, 'রাঁচি-পুলিশই বা কি সহযোগিতা করছে?'

মীআর্স বললেন, 'খোঁজ চলুক।'

সুপার ফিরে গেলেন চক্রধরপুর। মীআর্স ফিরে এলেন রাঁচি। কয়েকদিন বাদে কন্‌স্টেব্‌লরা সবাই ফিরে এল।

মীআর্স বললেন, 'আর বলার কিছু নেই। কেন ফিরে এসেছ?'

—'শুধু কন্‌স্টেব্‌লদের অসুখ হচ্ছে। ওদের ভয়-বিশ্বাস, ওদের শাপ লেগে গেছে হুজুর। তাই অসুখ হচ্ছে।'

—'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

—'বিরসা শাপ দিচ্ছে হুজুর।'

মীআর্স তেতে উঠলেন। বললেন, 'বিরসা পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি লম্বা একটা সাধারণ মুণ্ডা। ছিটোফোঁটা ইংরেজি শিখে ভড়ংবাজি করছে। তাকেই ভয়!'

কন্‌স্টেব্‌লরা চুপ করে রইল।

রোমান ক্যাথলিক মিশনের রেবারেন্ড হফ্‌ম্যান মুণ্ডারী ভাষা জানেন, সে-ভাষায় অভিধান লিখেছেন রোমান হরফে। তাঁকে মুণ্ডাদের বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করে সরকার।

হফ্‌ম্যান রিপোর্ট লিখলেন। আশ্চর্য, ভরত সিং তাঁর রিপোর্টের কথা না জেনেই সে রিপোর্টের মর্মার্থ প্রতিধ্বনি করল। প্রবল প্রতাপশালী জমিদার জগমোহন সিং-এর কাছারিতে একদিন গেল টাট্টু চেপে। দারোগাও বটে, আত্মীয়ও বটে। ঠিক দুপুরবেলা, জগমোহন সিং জিরিয়ে যেতে বলল।

জগমোহন সিং-এর বাড়ি গড়ের মতো উঁচু পাঁচিল ঘেরা। দোতলা মাটির ঘর। মোটা দেওয়াল, গজাল-উঁচানো দরজা। খাপরার চাল। দেওয়ালে পোঁচড়া টেনে অসম্ভব আকারের হাতি, ঘোড়া, রাম ও মহাবীর আঁকা। উঠোনে ধান, গম, বাজরা, অড়হরের টাল। একটা ঘরে জনাইয়ের স্তূপ। লঙ্কার পাহাড়। বাগানে অনেক মোষ। বাইরে কয়েকটা টাট্টু ঘোড়া বাঁধা। বড় বড় পেতলের জের বোঝাই তেল ও ঘি। মাটির জালায় গুড়, ছাতুর বস্তা অনেক।

রুটি বাথুয়ার শাক, অড়হর ডাল, টক দই ও গুড় দিয়ে ভরত সিং খেল। তারপর জগমোহনের কাছে এসে বসল। বলল, অনেকদিন কিছু হুকুম হয়নি।'

—'আর হুকুম! তোমাদের থানাকে চেনা হয়ে গেছে আমার। বিরসাকে ধরলে না। এখন আমার জানটা চলে যায়। জান, আমি ভয়ে মহলে বেরোই না?'

—'কাকে ভয়? বিরসা কোথায়?'

—'আমি জানি? সদাই মনে হয় বুঝি সব জানছে। এবার দিবে তীর মেরে।'

—'দু-বছর আকাল গেল। তোমরা কখনো দুটো বাঁশকোঁড়ের জন্যে, কখনো এক মুঠো ভুট্টার জন্যে মুণ্ডাদের মামলায় ঝুলাবে। ধান থাকতে সরকার খরা-খয়রাতি চাইলেও দিবে না এক খুঁচি। সরকারকে তোমরা দেখছ যে সরকার তোমাদের দেখবে?'

—'খয়রাতি সরকারের কাজ, আমার-কাজ!'

—'খুব বদনাম তুলে দিয়েছ নিজের নামে। তোমার আড়াং করে মুণ্ডারা পুড়াচ্ছে শুনলাম?'

—'জানি। ভয়ে আমি দরজা খুলি না।'

—'ভয় আমাদের আছে। আরে বাবা, সরকারের ভয় আছে। নয় তো? ধরতে চাইলে সরকারকে— যে ধরত তাকে! তাহলে রাঁচি-সিংভূমের পুলিশ একসঙ্গে জোট বেঁধে কাজ করত। তা করেছে? যার চোখ-নাক-কান আছে সেই বুঝবে চালকাড় তোমার থানায়। সিংভূম হতে চক্রধরপুর থানা, রাঁচি আর চাইবাসা, দুয়ো জায়গায় বিরসা ঘুরছে। এ তো বোকাতেও বুঝে। আমি কে বল? আমরা দেখলাম সায়েবে-সায়েবে বনল না। কেউ কারো কাছে রিপোর্ট নিল না, কারও রিপোর্ট দিল না। আমরা বুঝে নিলাম, হয় সরকারের ডর ধরেছে, নয় সরকার ওরে ধরতে চায় না। নয়তো সরকার কাজকর্ম করতে ভুলে গেছে। ভাবলাম, তবে আমরা কেন লাফালাফি করে মরি?'

—'তোমরা সরকারের লোক।'

—'তা বলে তাকে ধরতে জঙ্গল পিটাই, তা বাদে দিক একটা তীর মেরে।'

—'তোমাদের বন্দুক আছে।'

—'বন্দুক তো তোমারও আছে! সেদিন বন্দ্‌গাঁওয়ে পি. ডবল্যু. বাংলো নিয়ে যে কাণ্ড করেছ, সাহেব রেগে আগুন হয়ে আছে। বুঝেছ? খুব রেগেছে।'

—'রাগলে কি হবে?' সরকার জানে এই রাঁচি-চাইবাসায় সরকারের খুঁটি হলাম আমরা—আরা, ছাপরা, দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুরে, মুঙ্গেরের জমিদাররা।'

—'বাবা! যে গরুটা দুধ দেয়, তারে দুটো ঘাস, একটু জল দিতে হয়। তোমরা মুণ্ডাদের জমি, বেগারী, সুদের টাকা নিবে, আকালে এক মুঠি চাল দিবে না। এ কি ভাল করেছ? এ আমায় সবে বলছে!'

জগমোহন সিং একটুকুও চটল না। বলল, 'কি করি বল দেখি? ভয় ঢুকে গেল খুব।'

—'দু-দিনে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একবার নয় তীর্থে চলে যাও। ঘুরে-ঘেরে এস।'

—'তা পারব না। ঘরে—'

—'কেন, রেকড করিয়েছ ধান নাই বলে?'

—'রেকর্ড তো দশ টাকা দিলেই হয়।'

—'তবে পাহারা দাও।'

—'দিলে মুণ্ডারা মানবে?'

—'কি জানি! আগে ওদের বুঝতাম। এখন বুঝি না। আগে ওরা কথা বলত, এখন বলে না। তবে এটা বুঝি সরকার বোকামি করে ফেলল। হবে হাঙ্গামার মতো হাঙ্গামা।

রাঁচি হতে সাহেব এল, চক্রধরপুর হতে সাহেব এল, তারা হেরে ফিরে গেল। আমি বলে যাচ্ছি, মুখে কিছু বলব না, কিন্তু সিপাই নামিয়ে না দিলে আমরা জঙ্গল ঠেঙিয়ে বিরসাকে ধরতে যাব না। জঙ্গলে বসে ওদের সঙ্গে বিবাদ করা চলে, যদি আগেপাছে সিপাই ফিরে।'

—'তবে বুঝ। তোমরাও ভয় খেয়েছ।'

—'তোমার মতো কুটুম থাকতে ভয় না খেয়ে উপায় আছে? থানার সকলে তোমার উপর খেপে আছে।'

—'কেন?'

—'কেন তা জান না। বিরসারে যাতে পুলিশ ধরে তার জন্যে বাংলো হানা দিলে, কিছু হল না। এবার পুলিশ-চৌকি বসল। সদর হতে তিরিশটা কন্‌স্টেব্‌ল এল। দিলে জলে গো-বহেড়া মিশায়ে। ভাবলে ওদের অসুখ হবে। সরকার ভাবে এ বিরসাইতদের কাজ, আরও পুলিশ পাঠাবে। লাভের মধ্যে সবাই ভেগে গেল। নিজের বুদ্ধিতে চল। কারেও শুধাও না। এখন সামলাও না। থানা হতে কেউ তোমার নিমন্ত্রণ নিবে না বলেছে।'

—'যা ভাবলাম তা হল না, খারাপ করে ফেললাম।'

—'মুণ্ডারা যখন জানবে তাদের নামে দোষ চাপাতে এই কাজ করেছ, তারা খুব খুশি হবে।'

জগমোহন সিংকে ভয় ধরিয়ে দিয়ে ভরত সিং খুব খুশি হয়ে বেরিয়ে এল। আসার সময় বলে এল, মুণ্ডারা কি তেমন বোকা আছে? তারা শুনবে কন্‌স্টেব্‌লরা তোমার প্রচারী কথা বলছে, এ বিরসার শাপে হয়েছে।'

জগমোহন সিং বলল, 'কি আর করব বল? আরও দুটো বন্দুক আনাব সদর হতে।'

—'বাবা! সরকার সবার উপরে। তার সঙ্গে ঠকাঠকি কাজ করতে যাও। ছোটনাগপুরের রাজাও করে না।'

বিরসাকে সরকার ধরতে পারছিল না। রাঁচি ও চাইবাসায় জঙ্গলের কাছাকাছি যে-সব থানা, সে-সব জায়গার পুলিশও ধরতে চাইছিল না, ভয় পাচ্ছিল। বিরসা ওর ভক্তদের বললে, 'মনে কর না সরকার চুপ করে আছে।'

—'তবে ধরছে না কেন?'

—'সময়ে ধরতে আসবে।'

—'কখন।'

—'যখন সময় হবে।'

—'তবে?'

—'ওদের সময় দিব না।'

—'দিবে না?'

—'না। তার আগেই আগুন জ্বলে যাবে।'

নওরতনগড়ে যাবার জন্যে মেয়েরা দলে-দলে এসে এখানে রয়েছে। তারা উঠোনে গোল হয়ে বসে কথা বলছে, সালীর ছেলে পরিবার অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করছে। ওদের খেলা দেখতে দেখতে বিরসা বলল, 'আগুন জ্বলে যাবে।'

পরদিন রাত হলে ওরা বেরলো। নানকরা, তরুণী মেয়েরা, প্রচারকরা, বৃদ্ধারা, সবার শেষে পুরাণকরা। মেয়েদের মাথায় ছোট-ছোট নতুন ভাঁড়। সেই ভাঁড়ে নওরতনদের ঝর্ণা থেকে পবিত্র জল 'বীর-দা' আনবে তারা।

বিশাল লম্বা মিছিল। নিঃশব্দ, সতর্ক, দ্রুত পদক্ষেপ। অন্ধকারে যেতে হবে, নইলে লোকের নজরে পড়বে। ওরা চলেছে। একদিন মুণ্ডাদের আদিপুরুষ ও তার ছেলেরা এই নওরতনগড় গড়েছিল। ভোর হয়ে গেল, তখন ওরা হাঁটছে আর হাঁটছে। সূর্য যখন বেশ ওপরে উঠে গেছে, বিরসা তখন হাত তুলল।

সামনেই 'সর্না'। জরিয়া গ্রামের 'সর্না' অতি বিখ্যাত। সর্না হল পবিত্র বন। সে-বনে মুণ্ডারা বিশেষ বিশেষ দিনে এসে রুষ্ট দেবতার উদ্দেশে বলি দেয়। অন্য সময়ে এ বনে কেউ ঢোকে না। এখন অগ্রহায়ণ। এই ঘন ভীষণ নির্জন বনে বিরসাইতরা আশ্রয় নিল। কেউ কথা বলছে না, সবাই নিশ্চুপ। বনের ভেতরে একটি গভীর কুণ্ডী। সেখানে সবাই বিশ্রাম করল, আঁচলে বাঁধা ছাতু ও লবণ খেল।

সুনারা গাছের মাথায় উঠে নজর রাখছিল। হঠাৎ ও নেমে এল। বলল, 'লোক আসছে।'

একজন বৃদ্ধ, সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ। বৃদ্ধটি এগিয়ে এসে বলল,

—'কোথা? বিরসা ভগবান কোথা?'

—'এই যে!'

বিরসা এগিয়ে এল।

—'কোথায়?'

—'এই যে!'

বৃদ্ধ বলল, 'কাছে এস। আমার চক্ষু নাই।'

বিরসা কাছে এগিয়ে এল।

বিরসা বলল, 'তুমি এসেছ, মোরা জারিয়া গ্রাম হতে এসেছি। আমি মান্‌কি হে সে গ্রামে। তোমরা হেথা থাক, কোনো ভাবনা নাই। যখনি চুটিয়া গিয়াছ, জগন্নাথপুর গিয়াছ, তখনি জানি, নওরতনে আসবে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, এখনি সুবিধা। তাই মোরা আজ ততদিন পথ চেয়ে থাকি—মাসে মাসে কৃষ্ণপক্ষে। আজ তুমি এলে।'

—'তোমরা বিরসাইত হও নাই?

'না। তবে যে হয়াছে, যে হয় নাই, তুমি সকলের ভগবান হে। সকল মুণ্ডার।'

বিরসা ওর দু-হাত ধরল।

বৃদ্ধ বিরসার গায়ে হাত বোলাল। বলল, 'ফিরতে কালে জারিয়াতে বিশ্রাম করে যাবে। তুমি এমন সময়ে এলে ভগবান। উলগুলানের কথা বললে? এখন আমার চক্ষু নাই। মুণ্ডাদের রাজ হবে, দিকু চলে যাবে। সকল জঙ্গল মোদের হবে, স—ব হবে, কিন্তু আমি কিছু দেখতে পাব না।'

বৃদ্ধ হাত তুলে পেছনে সরে গেল, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। ওর সঙ্গীরা প্রণাম করল। তারপর বৃদ্ধ কাপড়ের খোঁট থেকে কিছু গুড়ের ডেলা, যবের ছাতুর মণ্ড বের করে

পাথরের ওপর রাখল। বলল, 'মোরা যাই। জারিয়া হতে কোনো ভয় নাই। মোরা মোটে তিরিশ ঘর।'

বিরসা হাত তুলে ওদের বিদায় জানাল। ওর চোখ বিষণ্ণ, দুর্বোধ্য। যারা ওর ধর্মে দীক্ষিত, যারা দীক্ষিত নয়, সকল মুণ্ডা ওকে ভগবান বলে মানে। আজ কতদিন হল এই বিশ্বাস ওর রক্ষাকবচ হয়ে আছে। যে পহান্, যে দেওঁরাদের বিরসা অস্বীকার করেছে, তারাও ত সিম্বুয়া পাহাড়ের সভার পর ওকে গোপনে বলে গেছে সিং-বোঙা ও বিরসাতে পরে যদি বিরোধ হয় সে দুই দেবতায় বুঝবে। উলগুলানের কাছে পহান্ ও দেওঁরাও শামিল হতে চাই। কেননা তারা মুণ্ডা! মুণ্ডারাজ হবে, সে রাজের কাজে তারাও হাত লাগাতে চায়।

বিরসা বলেছে, সকলের সাহায্য লাগবে হে।

এখন একা পাথরের ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে জল নাড়তে নাড়তে বিরসা বাবে মুণ্ডাদের সে এখনও স্বাধীনতা দিতে পারেনি। কিন্তু তাদের জীবন থেকে কতকগুলো নাগপাশ তো খুলে নিয়েছে। সেই অসুর পুজো, দেওঁরা ও পহানের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস, সহস্র সংস্কার, সে বন্ধনগুলো তো খুলে দিয়েছে।

একা বিরসা জানে কি কঠিন ব্রত নিয়েছে ও। প্রাচীন জড়তা, অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুণ্ডাদের মুক্ত করেও আজকের পৃথিবীতে, বর্তমান সময়ে নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু এমন এক 'বর্তমান' রচনা করতে চায় সে, যে 'বর্তমানে' ইংরেজের তৈরি সমাজ বা শাসন থাকবে না। বিরসা মুণ্ডাদের লক্ষ লক্ষ বছরের অন্ধকার পেরিয়ে আধুনিক সময়ে আনতে চায়। কিন্তু এ 'আধুনিক সময়ে' পৌঁছে মুণ্ডারা যেন তাদের আদিম সরলতা, ন্যায়বোধ সাম্যনীতি অটুট রাখতে পারে, এক নতুন মানবধর্মে আশ্রয় পায়।

বড় প্রাচীন মুণ্ডারক্ত। যেদিন ভারতে শ্বেতজাতি ঢোকে নি, সেই কৃষ্ণ ভারতের সন্তান মুণ্ডারা। বিরসা এক দুঃসাধ্য ব্রত নিয়েছে। যেন নদীর উৎসে ফিরে যেতে চাইছে ও। বহিরাগতদের কাছ থেকে নেওয়া 'করম পূজা' ও অন্যান্য রীতিনীতি, প্রাচীন অসুর ধর্মের জাদু-প্রক্রিয়া ও রক্তোৎসব, সব বাদ দিতে চাইছে। ধর্মের অসার জাদু-রীতিনীতির বোঝা বুকে চেপে থাকলে মুণ্ডারা মাথা তুলতে পারবে না। তাই এক সহজ, সুন্দর, নির্ভার ধর্ম চাই। তাই বিরসা ভগবান হয়ে ধর্মে বিপ্লব এনেছে।

মুণ্ডাদের অরণ্যে অধিকার চাই, সেই আদিম যুগের মতো। খুটকাট্টি গ্রাম ব্যবস্থা চাই, বাঁচার মতো করে বাঁচার উপায় চাই। অথচ এক বিষণ্ণ মুণ্ডা তার প্রার্থিত লক্ষ্যের মাঝামাঝি সারি সারি দেওয়াল—জমিদার-মহাজন-বেনে-আড়কাঠি-সাহেব। ইংরেজের প্রশ্রয়েই এই দেওয়ালগুলো ক্রমে উঁচু হয়ে উঠেছে। তাই বিরসা ভগবান হয়ে ওদের বিপ্লবে নামিয়েছে।

বিরসা ওদের বলেছে সফল ওরা হবেই। তীর-ধনুক-বর্শা-বল্লম নিয়ে বন্দুকের সঙ্গে লড়া কঠিন তা বিরসা জানে। কিন্তু এও জানে যে অস্ত্র-শস্ত্রের সকল অভাব ঘুচিয়ে দিতে পারে মুণ্ডারী ঐক্য।

মুণ্ডারা নিজেরা 'মুণ্ডা' বলে গৌরব করতে ভুলে গেছে। ওদের আত্মবিশ্বাস ফেরাতে

হবে। আবার নিজেদের 'মুণ্ডা' বলে পরিচয় দিতে গর্ব হবে, বিরসার কাছে সেটা একটা বিরাট, বিশাল লাভ।

বিরসা এইজন্যই ভগবান হয়েছে।

জল থেকে উঠে এল বিরসা। পাথরে হেলান দিয়ে শুল কাত হয়ে। মেয়েরা গোল হয়ে বসেছে। কথা বলছে নিচু গলায়। ওরা এ-ওর চুল বেঁধে দিচ্চে। কেউ শুয়ে পড়েছে আরেকজনের কোলে মাথা রেখে।

দেখতে দেখতে বিরসার চোখ কুয়াশায় ঢেকে গেল। ভগবান হতে হলে অনেক বড় দাম দিতে হয়। সে-জীবনে কোনো বরযাত্রা নেই, বাজনা বাজিয়ে মেয়েরা আমপাতায় জল ছিটিয়ে বরকে নামিয়ে নিয়ে 'চুমান্' স্ত্রী-আচার করে না। বিরসাকে তেল-হলুদে স্নান করিয়ে কোনো কনের বাপ কোলে বসায় না। পাঁচ 'পঞ্চেশ' এসে বিয়ে দেয় না। কোনো বধূর সঙ্গে তিলক ও 'জনেও' বিনিময় করে না বিরসা—জল, আগুন, ধান, দুধ, তরোয়াল, তীর ও ধনুক, সাতটি জিনিসের সামনে দাঁড়িয়ে একে একে অঙ্গীকার করে না।

সে-জীবনে শুধু রাতের অন্ধকারে মাইলের পর মাইল হেঁটে ঘুরে বেড়ানো। সভার পর সভা ডেকে মুণ্ডাদের উলগুলানের মন্ত্র শোনানো। 'মানুষ' বিরসার যা যা ভাল লাগত, সব ভুলে থাকা। সে যে ভগবান!

বিরসা চোখ বুজল।

পরদিন সকালে নওরতনগড়ে গিয়ে পরিত্যক্ত জংলা গড় থেকে বিরসা সেখানকার মাটি নিল। মেয়েরা নতুন ভাঁড়ে পবিত্র ঝরণার জল ভরে নিয়ে ফিরে এল। ফেরার পথে জারিয়ায় বিশ্রাম করে তবে ওরা বোর্তোদি ফিরল। বিরসা বলল, 'কাল সকল মুণ্ডা ডোম্বারি পাহাড়ে আসবে। যত জনায় পার আসবে। এখন অঘ্রান মাস। পৌষ পড়তে এখনো বিশ দিন বাকি। পৌষ না পড়তে আরও ষোতো আঠারোটা সভা করতে আছে।'

সোম বলল, 'কালই?'

—'সময় কোথা? সময় নাই।'

কোম্তা মাটিতে পা ঘষে বলল, 'ঘরে মা খুব্ব শোযাচ্ছে চিন্তায়। একবার গেলে দেখে আসতাম?

—'তাই যাও, আর ফির না। পিছের টান থাকলে এ-কাজে এস না। আগে বলে দিয়াছি।'

বিরসার কথা শুনে কোম্তা খুবই আহত হল। বলল, 'ভগবান! দোষ বলে দিয়াছ।'

কোম্তার ক্ষুণ্ণ গলা শুনে সবাই এ-ওর দিকে চাইল। বিরসা বলল, 'আমার মা বলে আমি তার তরে বেশি করে ভাবব? না তুমি ভাববে? যদি ভাব, তবে জানব, ওই যে ভাবলে, ওই চিন্তার পথে তোমার মনে 'দিমক', উইপোকা ঢুকে গেল। যেমন দিন যাবে চিন্তার 'দিমক' তোমায় খেয়ে ঝাঝরা করে দিবে। তখন তোমারে নিয়ে উলগুলানের কাজ হবে না।'

ডোম্বারি পাহাড়ের চূড়া বলে কিছু নেই। ওপরটি প্রশস্ত উঁচু প্রায় তিনশো ফুট। পাথরের খাঁজে পা রেখে, শুকনো ঘাসের চাপড়া ধরে ওপরে উঠতে হয়।

ডোম্‌বারির ওপরে, শতাধিক মুণ্ডার সমাবেশে বিরসা একটি সাদা নিশান তুলল। পূবদিকে পাথরের খাঁজে বসাল। একটি লাল নিশান বসাল পশ্চিম দিকে। বলল, 'ধলা নিশানটি মুণ্ডারা। লাল নিশানটি হল দিকুদের জুলুমবাজি। লাল নিশান আমি কেটে ফেলে দিলাম। এখন তোমরা লড়াই করতে চলাছ, ডোম্‌বারির পাথর এখন লাল হয়ে যাবে হে রক্তে। এখন তোমরা কোন্ পথে চলাছ?'

—'উলগুলান! উলগুলান!'

—'এখন জান, সকল বিরসাইতদের ঘর যে গড় হবে, তা বলে দিয়াছি! আরও জান! ডোম্‌বারির পিছনে সেল্‌রাকাব পাহাড় তোমরা দেখাছ সে পাহাড় যেমন চড়াই, যেমন খাড়াই, বাঘ তাড়লে হরিণের পা পিছলায় কিন্তু মুণ্ডারা যে-পাহাড়ে উঠে পা পিছলায় না। সে-পাহাড় কেমন হয়াছিল?

—'সঙ্গেল-দা! সেঙ্গেল-দা!'

—'সেঙ্গেল-দা! আগুন বৃষ্টি নামছিল হড়হড়ায়ে, যন্ত্রণায় ধরতির গা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সেই কাঁপন হতেই এত সব পাহাড় হয়াছে। এখন সেই পাহাড়ের গুহায় তোমরা চলে যাবে। সকল বিরসাইতদের ঘর গড় হবে, সে-ঘরে আজ হতে, এখানে যারা আছে তারা শুধু বলোয়া-টাঙ্গি-তীর-ধনুক জড়ো করবে। নানকরা করবে। কেন করবে?

—'উলগুলান! উলগুলান!'

—'প্রচারকরা মেয়েদের সাহায্য নিবে। তোমরা রোগোতো, বোর্তোদি, দিকে দিকে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে যাবে। গহীনে, জঙ্গলের পেটে ঢুকে ঘর বানাবে। এমন ঘর হবে, মাচার উপর ঘর। চার মানুষ উঁচা মাচা, মই রবে, মাচার উপর ঘর। দরকারে সে-ঘরে পলায়ে থাকতে পারবে। কেন ঘর বাঁধবে?'

—'উলগুলান! উলগুলান!'

—'পুরাণকরা গুটুহাতু, সাইকো, দউদি, আরও চারদিক হতে হাতিয়ার, কাপড়, গুবার ঘর, জলের কলস, চাল-ছাতু-যব-চিনাদানা-লবণ যত পার, যা পার, সেল্‌রাকাবের গুহায় কাঁদোরে জমা করবে, মশাল বানাবে। কেন করবে?

—'উলগুলান! উলগুলান!'

—'তোমাদের এই কাজ। মোরে তোমরা সকল সময়ে আর দেখবে না। এখন বাসিয়া, সিসাই, কোলেরিয়া, বানো, লোহারডাগা, তোরপা, করা, খুন্‌টি, মূরহু, তামার, বুন্‌দু, সোনা-হাতু, জোরহাট, জিলিং-সেরেৎ, ক্রোনতেয়া, চারারি, মনিসাই, বিরতা, কোটাম, সোনপুরগড়, তাউ, তিলাই মারচা, নাগফেণী, পালকোট, তিরলা, মনিহাতু, চাত্‌রাদি, কুসুমটোলি, দিমবুকেল, কামরা, শিপি, দোর্‌মা, গোরাইদি, বিচাকুটি, কারিক, কোটগরা, যত জায়গায় মুণ্ডা আছে, স—ব ঠাঁইয়ে আমি যাব, একই কথা বলব। কেন যাব... কে হাত তুলাছ? কি বলবে?

—'আমি! এতকেদির গয়া মুণ্ডা!'

—'কি বলবে?'

—'ভগবান! সকল মুণ্ডারা তোমার ধর্ম নেয় নাই। তারা উলগুলানে নামবে?'

—'তুমি নওরতনে যাও নাই। গেলেও জারিয়া গ্রামের মান্‌কি এক অন্ধ মুণ্ডা তোমার চোখ ফুটায় দিত। মুণ্ডারাজ যখন হবে সে একা বিরসাইত নিয়া হবে? মোদের সবার পিতা-পুরুষ যখন মুণ্ডা সমাজে মুণ্ডারাজে ছিল, তারা লবণ পেলেও ভাগ করত সমানে সমান, সোনা পেলেও ভাগ করত সমানে সমান। মুণ্ডারাজ আনতে হলে সকল মুণ্ডারে শামিল করতে হবে, বুঝছ?'

—'শামিল হবে?'

—'হবে, হতে হবে। দিকুর হাতে সকল মুণ্ডা সমানে মরে, সমান কষ্ট পায়। আমি সবারে ডাকব হে! সে আমার কাজ।'

—'বুঝাছি!'

—'তোমাদের যেমন ভাগে ভাগে কাজ দিয়াছি, তারাও তাই করবে হে! বুঝ তবে। রাঁচি জেলায় উলগুলান চলবে, উলগুলান চলবে চাইবাসায়। কত সিপাই নামাবে তারা? কত 'বন্দুক' ছুঁড়বে?'

—'তুমি একা কতদিকে যাবে?'

—'আমি একা! তোমরা নাই?'

—'আছি হে-এ-এ-এ-এ-এ-এ ভগবান?'

—'তবে শুন! আজ অঘ্রাণের দশ তারিখে বলি। পৌষের দশ তারিখে সাহেবদের বড়দিন। সেদিন হতে উলগুলান শুরু হবে। সাত তারিখ হতে দিকে দিকে পাহাড়ে বনে আগুন জ্বলবে, সেই হবে নিশানা। আর!'

—'বল হে!'

—'সকল মুণ্ডা-এলাকা ঘুরে এসে উলগুলানের আগে আমি আবার ডোম্‌বারিতে তোমাদের সাথে মিলব। কেন মিলব?'

—'উলগুলান! উলগুলান! উলগুলান!'

—'সে বোলোপে-বোলোপে গান গাও হে! রাত দেখ না তোমার আমার গায়ের পারা কালো, তারাগুলো গান শুনবে বলে নামুতে এসে দেখতেছে, জঙ্গলে বাতাস বহে যায়, জঙ্গল জেগে উঠাছে, ঝিমঝিমা পাতার শব্দ শুন!'

—'বোলোপে বোলোপে হেগা মিসি হোন্ কো'—কালো রাত, কালো পাথর, কালো শরীর। কালো কালো হাত হাতে ধরে তিনটি দল বিরসাকে ঘিরে গান গাইতে লাগল, ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল। মন্ত্রের মতো গান রক্ত থেকে উঠে আসতে লাগল। রাত বাড়ছে। আকাশে তারা ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকল। বাতাসে হিম। জঙ্গলের কালো গা দিয়ে কুয়াশা ভেসে যাচ্ছে।

১৮

চুটিয়া ও ভগন্নাথপুরের মন্দির দখল করে দখল না রেখেই চলে গেছে বিরসা। না গেল তাকে ধরা, না পাওয়া গেল তার সাড়া শব্দ। চিরুনি দিয়ে চুল যেমন করে আঁচড়ায়, তেমনি করে জঙ্গল আর পাহাড় খুঁজল পুলিশ।

এই যে কোনো খবর মিলছে না, এতে মীআর্স উদ্বিগ্ন হলেন। যত উদ্বেগ সব তাঁর, ওপরঅলাকে বোঝাতে পারেন না কিছু। কেন তাঁর মনে হচ্ছে মুণ্ডা-অঞ্চল এখন অগ্নিগর্ভ। যেকোনদিন যেকোনো সময়ে আগুন জ্বলবে।

—কিন্তু মুণ্ডারা কোথায়?

মুণ্ডারা জঙ্গলে ও পাহাড়ে লুকিয়ে থাকছিল। পুলিশের ঘোরাফেরা দেখে ওরা নিঃশব্দ হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল। পুলিশ চলে গেলে ওরা গান করছিল। ওদের রক্তে নেশা ধরে গিয়েছিল। এমন নেশা কোনো মদে হয় না। উলগুলান বা সমগ্র বিদ্রোহের নেশায় মুণ্ডারা খেপে উঠেছিল।

সব জায়গায় বিরসা স্বশরীরে হাজির নেই। তবু সব গানই বিরসাকে নিয়ে।

ওরা গাইছিল—

বিরসা ভগবান ডাকল, ও ভাই চল যাই
চুটিয়া মন্দিরে
সে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বলল
চল যাই জগন্নাথপুরের মন্দিরে
আমরা গেলাম তিন রাত থাকলাম
দেবতাকে জানালাম প্রণাম
চুটিয়া উঠল কেঁপে
রাঁচি আর ডুরাণ্ডা দেখ কাঁপছে।।

কোথা থেকে যেন অসম্ভব জোর পেয়েছিল ওরা মনের ভেতর, খুব বিশ্বাস জ্বলে উঠেছিল রক্তে।

ওরা গাইছিল—

জমিদারের অত্যাচারের যন্ত্রণায়
মানুষের দুঃখে দেশ আজ উত্তাল
চল, তুলে নাও ধনুক, তীর ও বলোয়া
আজ বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল
বিরসা ভগবান আমাদের নেতা
আমাদের জন্যেই সে এসেছে এখানে
আজ বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল
চল তৈরি হই তূণ তীর তরোয়াল নিয়ে
ডোম্‌বারি পাহাড়ে জড়ো হব সবাই
ধরতি-আবা কথা কইবে সেখানে
বাঁদরের কিচকিচিকে ভয় পাই না আমরা।
কিছুতে ছেড়ে দেব না জমিদার, মহাজন, বেনে—বিদেশীদের
তারাই ত ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের দেশ
খুটকাটি অধিকার ছেড়ে দেব না

চিতাবাঘের দাঁত, সাপের ছোবল থেকে হাসিল করেছিলাম দেশটা
এই সুন্দর দেশ কেড়ে নিয়েছে ওরা।।

গানটা শুনে বিরসার বুকও কেঁপে উঠেছিল বার বার। এ কি বলছে মুণ্ডারা? বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল? কে বাঁধল এ গান? কে সুর দিল?

কেউ বলতে পারেনি। বিরসা বুঝেছিল এ-গানের রচয়িতা হল সময়, সুরও সময়ের দেওয়া।

কেননা সময় বড় বিস্ফোরক, অস্থির, ব্যগ্র। সময়ের হাতে তীর, হৃদয়ে জ্বালা, চোখে একাগ্র লক্ষ্য। বিরসা বুঝতে পারছিল সুগানা বা কর্‌মি উপলক্ষ্য মাত্র, ওকে সৃষ্টি করেছে সময়। মুণ্ডাদের জীবনে হোলির আগুন বছর বছর জ্বলে। উলগুলানের আগুন বিরসা ছাড়া কেউ জ্বালাতে পারত না। এখন দরকার বহ্ন্যুৎসব, সময় তাই বিরসাকে এনেছে।

বিরসা ভাবছিল, পাঁচ বছর হতে চলল, ১৮৯৫ সাল অব্দি মুণ্ডারা ভেবেছে—যা সর্দাররা তাদের ভাবিয়েছে, তাই ভেবেছে।

মুণ্ডারা ভেবেছে লড়ব তো নিশ্চয়। কিন্তু লড়াই মানে কি? কি তার মানে?

—'না, জমিদারকে খাজনা দিব নাই।

—নিষ্কর জমি চাই।

—জঙ্গলে আদি-অধিকার চাই আবার।

হ্যাঁ, বিরসা বড় কৃতজ্ঞ সর্দারের কাছে। আন্দোলনকে তারা জীইয়ে রেখেছিল বলে মুণ্ডাদের রক্তে এ-কথাগুলো চেনা হয়ে গিয়েছিল, অচেনা ছিল না। বিরসার কাজ তাতে অনেক সহজ হয়।

বিরসা নিজেকে প্রশ্ন করেছিল। বিরসা তো ভগবান হতে চেয়েছে, তার কাছে এসে তাকে মেনে নিয়েছে মুণ্ডারা?

সর্দাররা তাকে কেন চেয়েছে? তাদের লড়াই করবার মন আছে, নেতা নেই বলে?

তাদের পথ আইনের পথ, বিরসার পথ যুদ্ধের পথ। দুটো পথ মিলল কেমন করে?

আজ তো বিরসা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে চলেছে মুণ্ডা জাতিকে নিয়ে। সর্দাররা তবু তার সঙ্গে শামিল আছে কেন?

বিরসা কি চাইছিল? কেন গেল প্রাচীন মন্দিরে? বিরসা জানে, কেন গিয়েছিল। আদিম মুণ্ডা ধর্ম আদিম সরলতা হারিয়েছে। মুণ্ডাদের মনে নিজেদের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনা দরকার ছিল।

মুণ্ডাদের জীবন থেকে সব বাইরের আগাছা উপড়ে ফেলা দরকার। জাতির যারা শত্রু, কি অর্থনীতিতে, কি ধর্মে, তাদের বহিষ্কার করা দরকার।

আর কোনো পথ নেই। কেননা বিরসার আদিম আরণ্যক জননী ধর্ষিতা, অশুদ্ধ, অশুচি, 'মোরে শুচি কর্‌ বাপ' সে কাঁদছিল। মুণ্ডাদের সংগঠিত করে, হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রতি মুহূর্তে বিরসা বুঝতে পারছিল ওর দেহটা ছোটনাগপুরের মাটি, ওর রক্তে তাজ্‌নে ও কাঞ্চী নদীর স্রোত, সে-নদীর তীরে ওর অরণ্যক জননী কাঁদছিল।

সেজন্যেই তো চার পাঁচ বছরেই বিরসা নিজে বুঝেছে, মুণ্ডাদের বিশ্বাস করাতে পেরেছে, ওরা যা চায় তা হল—

যারা আদিবাসী নয় তারা জবর দখলদার, তাদের উৎখাত—

মুণ্ডারা জমির আসল মালিক...

আর এই স্বর্গকে হাতের মুঠোয় পেতে হলে চাই এক মুণ্ডা অধিকৃত মুণ্ডারী দেশ, যে দেশে সাহেব-সরকারী কর্মচারী ও মিশনারী নেই। মুণ্ডার কাছে সবচেয়ে প্রার্থিত ধন হল বিরসার রাজ। বিরসার রাজ মানে বিরসার ধর্ম। বিরসার ধর্ম মানে বিরসার রাজ। এই স্বর্গ পেতে হলে রক্ত নিতে হবে, রক্ত দিতে হবে।

প্রতিটি সভায় তো বিরসা একই কথা বলেছে। ডোম্‌বারিতে অঘ্রান মাসে যে সভাটা হল?

ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল, হিমহিম রাতে, চাঁদ উঠেছিল রাত বারোটার পরে। ডোম্‌বারি পাহাড়ের ওপরে চ্যাটাল পাথরে বসেছিলাম আমি। একে একে সত্তর-আশিজন জমেছিল, কুড়া গ্রামের রতন মুণ্ডারা এল সবার পরে।

আমি শুধালাম, 'বল, তোমাদের বলার কি আছে?'

কুড়্‌ডার জগাইরা তিন চারজনে একসঙ্গে বলল, 'জমিদার-জাগীরদার-ঠিকাদারের অত্যাচার।'

আমি বললাম, 'তবে তীর-ধনুক-বলোয়া তৈরি রাখ।'

ওরা বলল, 'রাখব।'

আমি বললাম, 'হাতিয়ার কি কাজে লাগাবে?'

ওরা বলল, 'তুমি বলে দাও।'

আমি বললাম, 'হাতিয়ার দিয়া তোমরা ঠিকাদার-জাগীরদার-রাজা-হাকিম-ক্রীশ্চানদের মারবে হে।'

ওরা বলল, 'রাজা-হাকিম-ক্রিশ্চানরা বন্দুক দিয়া আমাদেরকে মারে যদি?'

আমি বললাম, 'ওদের বন্দুক-গুলি জমা হয়ে যাবে। দেখ, চৌদ্দ দিন বাদে আমি আবার তোমাদের সঙ্গে মিলব। সেদিন ক্রীশ্চানদের বড়দিন। তোমরা হাতিয়ার মজুদ রেখ।'

কথা বলতে বলতে ভোর হয়ে গেল।

সভা-সভা-সভা! সভার পর সভা! কত পথ হেঁটেছিল বিরসা? ১৮৯৯ সালে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাঁচি আর চাইবাসার কত জায়গায় গিয়েছিল বিরসা?

চালকাড়ে বসে কর্‌মি কাঁদত, 'বিরসা! বিরসা! বিরসা!'

কর্‌মি জানত না বিরসা মানে ছোটনাগপুর, বিরসার রক্ত ছোটনাগপুরের বর্ষার নদী। কর্‌মি জানত না, বিরসার রক্তে বসে কাঁদে এক নগ্নিকা জননী অরণ্যকা। সে কর্‌মির মতো নয়, সালীর মতো নয়, সকলকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে সে সম্পূর্ণ। সেই জননীর কান্না শুনত বলে বিরসা অত পথ হাঁটতে পেরেছিল।

সেই জননীর কান্না শুনত বলে বিরসা মুণ্ডাদের বিশ্বাস করাতে পেরেছিল বিরসাইত

মুণ্ডারা এক আলাদা জাতি।

তারা সকল মুণ্ডাদের জন্যে মরতে পারে। তাদের কাছে এখন বাঁচার চেয়ে মরা অনেক প্রিয়। তাদের পথ রক্তের পথ।

কিন্তু বিরসাইত মুণ্ডা, বিরসাইত না হলে বাপ-মা-ভাই-বোন কারো হাতে খায় না, কারো ঘরে থাকে না।

বিরসা তাদের মনে এই গর্ব এনে দিয়েছে। এখন বিরসাইত হলে পরে সেই অহংকারে মাথা উঁচু করে চলা যায়। ধানী মুণ্ডা বুড়োটা, পাগল খ্যাপাটা, সব চেয়ে বেসুর গলায় গান গাইত আর হাত তুলে নেচে নেচে বলত, 'মুণ্ডা হয়া জন্মেছি, সেজন্য এত গরব রক্তে গর্জাবে তা আগে জানি নাই। এই যে জানালি ভগবান, এই আমি হাতে চাঁদ পেয়াছি। আর কিছু না পেলেও তোরে কব না কিছু।'

রাতে পাহাড় ও জঙ্গল দিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হাঁটতে বিরসা বলত, আর কেন্দ্যো না মা মোর। তু মোর রক্তে ছিলি তাই টুইলা-বাঁশি বাজায়ে আখারায় নেচে মন উঠে নাই। সর্বদা মনে হত আমার আরও কিছু করার আছে। ই কাজ করতে আমি ভোবনে আসি নাই।

মন উঠল না মা আমার, মিশনে যেয়্যে, বন্দ্‌গাঁওয়ে থেকে। মন উঠল না মা—নয়ত সালীর মত, পরমির মত কুন মেয়ারে আরান্দি করে—গাঁও পহানের শাসন মেন্যে—করমি-সুগানার বংশ রেখে জীবন কাটাতে পারতাম। কিসে মোরে দংশাত তখন জানি নাই। শুধা মনে হত আন কাজ করতে ভোবনে এসাছি। এখন জানি তোর দুঃখ মোর রক্তে আগুন ছিটাত।

খুটকাটি গ্রাম হতে উচ্ছেদ হতে হতে, সকল অধিকার হতে বঞ্চিত হতে হতে, মুণ্ডাদের শিরদাঁড়ায় জোর ছিল না কুন।

তাই আমি এত কঠোর হয়াছি মা। যা নিয়া মুণ্ডারা সব ভুলা থাকত, সব বাদ দিয়া দিছি। হ্যাঁ আমি তোমাদের ভগবান।

আর নাচ-গান—করম-হোলি-সোহরাই পরবে মাতামাতি নয়।

মাথায় ফুল—চুলে ফুল—হাড়িয়া তাড়ির মাতন আর নয়।

সব ভুলে এক মন, এক লক্ষ্য হও।

এমনি করে মুণ্ডাদের এক বিশ্বাসের বাঁধনে বেঁধেছি। তাদের মরতে শিখায়েছি।

যা শিখায়েছি তা তারা শিখল কি না তার পরীক্ষা নিব ২৪শে ডিসেম্বর

২৪শে ডিসেম্বর—২৪শে ডিসেম্বর—২৪ ডিসেম্বর—মুণ্ডারা মনে মনে জপছিল।

—সাহেবরা কিছু জানেনি।

—সাহেবরা কি করছিল।

রাঁচির ইউরোপীয়ান ক্লাবে বিলিয়ার্ড টেবিলটি অসামান্য। যেমন পালিশ, তেমনি নিখুঁত কারিগরি তার। ডেপুটি কমিশনারের বিলিয়ার্ড খেলাটি বড় পছন্দ। বিলিয়ার্ডের ক্যিউ হাতে নিয়ে সাদা বলগুলি গড়িয়ে পকেটে পাঠালে তাঁর উত্তেজিত নার্ভ ঠাণ্ডা হয়। রাঁচির শ্বেতাঙ্গসমাজ ডি. সি.-র আড়ালে তাঁর বিলিয়ার্ড প্রীতির একটা ব্যাখ্যা বের

করেছেন।

রাঁচির মত জংলী জায়গায় পড়ে থাকতে মিসেস ডি. সি. খুশি নন। কি আছে এখানে? পাহাড়? জঙ্গল? সুন্দর আবহাওয়া? কেন তিনি সেজন্যে এখানে পড়ে থাকবেন? ডি. সি. পুরুষমানুষ। তিনি শিকার করে-টরে খুশি থাকতে পারেন। মিসেসের ভাল লাগবে কেন?

ডি. সি. মেমসাহেবকে বোঝাতে পারেন না, প্রমোশন না হলে তাঁর পক্ষে রাঁচি থেকে বদলী হওয়া অসম্ভব। ভারতে থাকার মত শহর এই পূর্বভারতে, কলকাতা। কলকাতা যেতে কে না চায়? কিন্তু লালফিতের ফাঁস বড় ভীষণ। কেটে বেরোন দায়

মেমসাহেবের সঙ্গে নিয়ত তর্কে তর্কে ডি. সি-র নার্ভ অশান্ত হয়। তখন তিনি বিলিয়ার্ড খেলতে শুরু করেন আর খেলে চলেন।

এবারও তিনি খেলছিলেন, যেমন খেলেন। পুলিশ সুপার দেখছিলেন, যেমন দেখেন। ভীষণ শীত, রাঁচিতে যেমন পড়ে। বেয়ারা পানীয় দিয়ে যাচ্ছিল ঠিকমত।

ডি. সি. সুপারকে বললেন, 'দ্যাট বোগিম্যান, দ্যাট বিরসা? মরে গেল না কি?'

—'মরার শামিল।'

—'কেন?'

—'একেবারে চুপচাপ। শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছি ত? বুঝেছে আর ট্যাঁ ফোঁ করে লাভ নেই।'

—'মীআর্স কি বলে?'

—'মীআস? বিরসার বিষয়ে যত গুজব ছড়ায় সব বিশ্বাস করাই ওর কাজ।'

—'মীআর্স ফালতু লোক নয় হে।'

—'সেবারে আহা, ১৮৯৮ সালের মে মাসে সিংভূম পুলিশের সঙ্গে কি খিটিমিটি বাধাল না মীআর্স?'

সেও ত বিরসাকে ধরা নিয়েই। সিংভূম পুলিস খেপে গেল বিরসা রাঁচিতে লুকিয়ে আছে, গিডিয়ুন আর প্রভুদয়ালকে ধরার জন্যে রাঁচির সরকার পুরস্কার দিল না বলে। রাঁচি পুলিশকে তাতিয়ে দিল রেভারেন্ড হফ্‌ম্যান। বলল, বিরসা আমার থানার চালকাড় ছেড়ে চক্রধরপুর থানার উত্তর দিকের পাহাড়ে ঘাঁটি করেছে, অথচ সিংভূম পুলিশ কিছু করছে না।'

আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে বিরসা রাঁচি আর সিংভূম, দু-জায়গায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে? তা যদি হয়?'

—'সুপারম্যান ত নয়?'

—'মুণ্ডারা ওকে সুপারম্যানই ভাবে।'

—'হফ্‌ম্যান কি বলছে?'

—'বললে ত বাঁচা যেত। লিখছে, সমানে চিঠি লিখছে। ওর মাথায় চেপেছে বিরসার ভূত। চারদিকে ও বিরসার প্রভাব দেখছে। মিশনের যত মুণ্ডা, সব নাকি বিরসাইত হয়ে চলে যাচ্ছে।

—'যাচ্ছে না কি, খোঁজ নিয়েছ?'

—'কি জানি। মুণ্ডারা এবার বেজায় চুপচাপ। হোলির পর শিকার অব্দি খেলেনি।'

—লক্ষণ ভাল নয়।'

—'শীতের সময়। এসময়ে ওদের কষ্ট বাড়ে খুব। মিশনে যায় দলে দলে।'

—'মিশনে-মিশনে বলেছি এবার বড়দিনে বেশি করে কম্বল আর জামা দিও।'

—'তা দিক গে। মিশন কি করছে তা দেখতে গেলে পুলিশের চলে? ধর্ম নিয়ে খোঁচাতে যাবে কে? তুমিও যাবে না নিশ্চয়। ছোটনাগপুর রেন্ট-ল নিয়ে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তাতে হফ্‌ম্যানের এই চিঠির পর চিঠি।'

—'হফ্‌ম্যানও ফালতু লোক নয়।'

—'সে তোমাদের কাছে। ও 'এনসাইক্লোপিডিয়া মুণ্ডারিকা' লিখেছে বলে সব জানে নাকি?'

—'হফ্‌ম্যান মুণ্ডাদের সমাজ, অবস্থা, সব খুব ভালই বোঝে, বুঝেছ? ও যদি ভয় পায়, তাহলে অবস্থা সিরিয়াস। দুটো দুর্ভিক্ষ হয়ে গেল, দেশের অবস্থা এমনিতেই খুব খারাপ হয়ে আছে।'

—'না খেয়ে মুণ্ডারা মরবে না। খেতে পায় কবে, যে না খেয়ে মরবে? জন্মায়ও ত শুওরের মত পালে পালে। দেখনি?'

—'না। বিরসা একটা কাজের মত কাজ করেছে। মুণ্ডাদের কি বুঝিয়েছে কে জানে! সন্তান ওদের ঘরে কিন্তু তেমন জন্মাচ্ছে না।'

—'আরে বাবা! বড়দিন সামনে! ডিনার-নাচ-ফেট-শিকার' এসব কথা ভাবতে পার না? তুমিও যে হফ্‌ম্যানের মত কথা বলছ?'

হফ্‌ম্যান ক্যাথলিক মিশনের রেভারেন্ড হফ্‌ম্যান, মিশন হাউসে বসে হাত মোচড়ালেন, কপাল ঘষলেন। একটা দুর্যোগের আভাস পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু ডি. সি.-কে বোঝাতে পারছেন না। হফ্‌ম্যান ডি. সি.-কে লিখছেন, 'মুণ্ডাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ইংরেজ বা অন্য হিন্দু, বিদেশীদের ওপর ওদের অন্ধ রাগ। দু-বছর ধরে ওদের বোঝাচ্ছি। এ সরকার তোমরা বদলাতে পারবে না। টাকা দিয়ে সামু মুণ্ডা ও অন্য বিরসাইতদের সাহায্য করেছি। এখন শুনছি, সাহেব বলে ওরা আমাকে ও ফাদার ক্যারবেরিকে খুন করবে। যারা জেলে গিয়েছিল তাদের ক-জনের পরিবারকেও সাহায্য করে দেখেছি, কোনো লাভ হয়নি...'

হফ্‌ম্যান জানেন, রাঁচিতে সবাই তাঁকে পাগল ভাবে। তবু তিনি চিঠি লিখলেন, ডি. সি.-কে।

আশ্চর্য ডি. সি. এবার হফ্‌ম্যানকে একেবারে উড়িয়ে দিলেন না। মুণ্ডারী জানে, এমন একটি দারোগা ও কনস্টেবলকে তদন্ত করতে পাঠালেন। নিজেও ট্যুরে বেরোলেন।

কিছুই জানা গেল না। শুধু ঘোরাই সার হল। রাঁচি ফিরে ডি. সি. সুপারকে বললেন, 'আলেয়া! আলেয়ার পেছনে ছুটে বেড়ানো অসম্ভব।'

—'কি শুনে এলে?'

—'শুনলাম বিরসা এতদিন নির্জনে বসে তপস্যা করছে। এবার নাকি আত্মপ্রকাশ

করবে।'

—'কবে?'

—'কবে জানি না। তবে শুনলাম বিরসাকে নাকি শতশত মাইল এলাকা জুড়ে দেখা যাবে।'

—'তার মানে?'

—'জানি না।'

ডি. সি. ও সুপার যখন কথা বললেন, তখনি ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৯৯ সাল—বিরসা মুণ্ডাদের জানিয়ে দিল, উলগুলানের দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে আগুন জ্বালিয়ে তীর ছুঁড়ে ক্রিশ্চানদের ভয় দেখাতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুরু হবে সশস্ত্র সংগ্রাম।

২৪শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ঈভ্। ইউরোপীয়ান ক্লাব আলোয় ঝলমল করছে। সাহেব ও মেমরা নাচছে, ব্যান্ড বাজছে। কাচের গেলাস ও বোতল ট্রে-তে সাজিয়ে বেয়ারারা ঘুরছে। রঙিন কাগজের শেকল ঝুলছে, মালা দুলছে। সুসজ্জিত ক্রিস্‌মাস-ট্রি ঘিরে দাঁড়িয়ে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা গল্প করছেন।

হঠাৎ বাইরে হট্টগোল শোনা গেল।

নাচ থেমে গেল। বাজনাও। সবাই এ-ওর দিকে তাকালেন। ছুটতে ছুটতে, হাঁফাতে হাঁফাতে ভেতরে এল খানসামা। ডি. সি.-কে বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি হুজুর। বিরসাইতরা শহরে তীর চালাচ্ছে। সাহেবদিগের খুঁজছে।

সুপার ধমকে বললেন, 'মিথ্যে কথা। শহরে বিরসাইত নেই।'

—'হুজুর, খাবার নিতে যারা এসেছিল, এখানে-ওখানে বসেছিল তারাই তো বিরসাইত। জার্মান মিশনে তীর ছুঁড়ল। ছেদী মিস্ত্রিটা তীর লেগে মরে গেল হুজুর।'

—'মিথ্যে কথা।'

—'আপনার বাংলোর সামনে তীর চলছে। আপনার গার্ড জখম হয়েছে। আমরা পালাব হুজুর। এখন এখানে থাকলে ওরা মেরে ফেলবে।'

হঠাৎ জেলে পাগলাঘণ্টি বাজতে শুরু করল। কি হল সেখানে?

ডি. সি. বললেন, 'সুপার, জেলে যান। আমি পুলিশ-ব্যারাকে যাচ্ছি। সেখান থেকে অফিস।'

ডি. সি.-র হাত কামড়াতে ইচ্ছে হল। বড়দিন। সমস্ত আপিসের লোকজনের ছুটি। সরকারী দপ্তর বন্ধ। কেমন করে খবর পাবেন, ব্যবস্থা করবেন?

—'ঘোড়া আনতে বল!'

তাঁর ডেপুটি বললেন, 'কাকে বলবে? নেটিভরা সবাই পালিয়েছে।'

—'রিয়ালি! ফুল্‌স্। কোনো মানে হয়?'

ডি. সি. বেরোলেন। পুলিশ-ব্যারাকে এলেন। বললেন, 'শহরে রাউন্ড দাও। অবস্থা দেখ। গণ্ডগোল দেখলে, বাধ্য না হলে গুলি করবে না। আমি দপ্তরে যাচ্ছি।'

বাড়ির লাগওয়া দপ্তর। ডি. সি.-র স্ত্রী কলকাতায়। দেখলেন, বাড়ির আলো নিবিয়ে চাকর-খানসামা-বেয়ারা-ভিস্তি-জমাদার মালী-সহিস-বাবুর্চি সবাই বসবার ঘরে বসে

আছে। বললেন, 'কাছারি ঘরে বিছানা দিয়ে যাও। দরজা খোলা থাক্। আমি বন্ধ করব।'

—'হুজুর।'

—'কি?'

—'আমরা...'

—'ভয়ের কিছু নেই।'

—'কিন্তু...'

—'চব্বিশ ঘণ্টায় সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

রাত কাটল। সকাল থেকে খবর আসতে লাগল। না, শহরে গুলি চালাবার কোনো দরকারই হয়নি। কেননা কোনো তীরসন্ধানী মুণ্ডাকে দেখা যায়নি। বিরসার নাম যেমন আলেয়ার মতো জ্বলে, বিভ্রান্ত করে, মিলিয়ে যায়, মুণ্ডাদের ভাবলেশহীন মুখের অন্ধকার নিরুত্তরে বিরসাইতরা তেমনি করেই মিলিয়ে গেছে, নিরুত্তর অন্ধকার হয়ে গেছে আবার। রাঁচি শহরে কোথাও তারা নেই।

ডেপুটি জেল-সুপার অমূল্যবাবু দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে, দেখল হাটিয়ারের পথ ধরে নিচু হয়ে, শরীর দুমড়ে চলে যাচ্ছে মুণ্ডারা। দেখে সে জেলে ফিরে এল। আজ রাতে জেল-কর্তৃপক্ষের তৈরি থাকার হুকুম ছিল। জেলে বন্দী আসতে পারে। সুপার বললেন, 'না, আজ কোয়ার্টারে ফিরব না।'

সকাল থেকে খবর আসতে লাগল। সারাদিন ধরে রাঁচিতে ঘোড়সওয়ার এল আর এল। ডি.সি. ও পুলিশ-সুপার খবর নিতে লাগলেন। সিংভূম জেলার চক্রধরপুরের অধীনে প্রতিটি থানায় খবর এসেছে তীর ছুটছে, আগুন জ্বলছে।

মীআর্স বললেন, 'আমি জানতাম।'

'—কি জানতে? ক্রিস্‌মাস ঈভে মুণ্ডারা বিদ্রোহ করবে?'

—'না, জানতাম যেটাকে আমরা শান্ত অবস্থা মনে করছি, সেটা প্রলয় ঝড়ের আগের নিস্তব্ধতা।'

ডি. সি. জানেন তাঁকে সবাই—শ্বেতাঙ্গ অফিসাররা, মিশনারীরা, জমিদাররা, মুণ্ডাদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার দোষে দোষী করে মনে মনে। তিনি বললেন, 'কি করতে পারতাম আমি?'

—'আমি সে-কথা বলার অধিকারী নই।'

—'পিটুনি ট্যাক্স ধরিনি, গ্রামওয়ারী?'

—'প্রত্যাহারও করেছিলেন।'

—'সরকারী কাজে কতকগুলো নিয়মকানুন মানতে হয়। পিটুনি ট্যাক্স অনির্দিষ্ট কাল চাপিয়ে রাখা চলে না।'

—'তখন থেকেই অবস্থা কিন্তু বিস্ফোরক হয়ে আছে।'

ডি. সি. আঙুল দিয়ে চুল টানলেন। রুক্ষ গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। দু-বছরের খরা দুর্ভিক্ষ-শস্যহানি-জমিদার ও মহাজনের দুর্বার লোভ—ছোটনাগপুরে রেন্‌ট-ল—সবকিছুই ইন্ধন জুগিয়েছে।

—'কিন্তু এখন...?'

—'বিরসা কথা দিয়েছিল'।

ডি. সি. কিছুতে বলতে পারলেন না এখন তিনি দরকার হলে মিলিটারি নামিয়ে দিয়ে, বিদ্রোহ দমন করবেন। তবু, তবু বিরসার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা হচ্ছে। ছেলেটা গরিব মুণ্ডা হয়ে আশ্চর্য ধোঁকা দিয়েছে একটা বিশাল প্রতিপত্তিশালী পরাক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে। হ্যাঁ, শ্রদ্ধা হচ্ছে। দিনান্তে এক খুঁচি চিনাঘাসের দানার ঘাটো যার খাদ্য, পরনে যার লেংটি, হাতিয়ার যার তীর ও ধনুক, কাঁধে যার চক্রবৃদ্ধি সুদের ভার, সেই মুণ্ডাজাতিকে বিরসা ব্রিটিশসিংহের উদ্যত থাবার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। অথচ কি শান্ত, নম্র, নিরীহ মনে হয়েছিল ওকে...

মনে পড়ল চালকাড় থেকে চলে আসার আগে ঘোড়ার পিঠে বসে উনি বলছেন, সরকারকে কথা দিয়েছ গন্ডগোল করবে না, মনে রেখ। কথা ভাঙলে শাস্তি পাবে।

ডিসেম্বর মাস। ফসল ঘরে উঠেছে জমিদারের। মুণ্ডাদের উঠোনে পোকা-খাওয়া ধান, যব, বাজরা। মেয়েরা গোল হয়ে বসে শস্য বাছছে। শীতের বাতাস, রুক্ষ, তীব্র। বিরসার গায়ে চাদর, পা খালি। বিরসা ওঁর ঘোড়ার গায়ে হাত বোলাচ্ছে।

উনি বললেন, 'মনে রেখ।'

বিরসা চোখ তুলল। হাসিতে ঝলমল করছে দুচোখ। বলল, 'মনে আছে।' তারপর, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে ও গ্রামের সীমান্ত অব্দি এল। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়ি সবাই দাঁড়িয়ে ওঁকে দেখছে। বিরসা দাঁড়িয়ে রইল, উনি চলে এলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, তেঁতুলগাছের নিচে ও দাঁড়িয়ে আছে হাত তুলে। আর ওকে দেখেননি। আর দেখবেন বলেও ভাবেননি।

মীআর্স বলেছিল, 'জেলেও বিরসার দাঁড়ানো, কথা বলা, সব-কিছুর মধ্যে একটা ড্যাম্‌ড আত্মপ্রত্যয়ের ভাব দেখা যেত। যেন রাজা, এমনি ভাবখানা।'

কিন্তু রাজার মতো সহজ, স্বাভাবিক আভিজাত্য, চলাফেরায়, কথা-বার্তায়, বিরসার কেন, ভরমি, সোনা, ডোন্‌কা, অনেকের মধ্যেই দেখেছেন স্ট্রীটফিল্‌ড্‌। প্রত্যেকবার তাঁর নতুন করে অবাক লেগেছে। নিঃস্ব, দীন, হতভাগ্য মুণ্ডার ভেতরে এই সহজ স্বাভাবিক আভিজাত্য কোথা থেকে আসে? প্রাচীন সভ্যতার ধারাবাহী ওরা? সেইজন্য? কিন্তু ওদের আবার সভ্যতা কি! ওরা তো বর্বর অসভ্য...

ডি. সি. আবার মাথা নাড়লেন। যেন এখনি বুঝতে পারবেন সব, বিরসার বিষয়ে বুঝে ফেলবেন, সব, কেন ওকে মানে মুণ্ডারা—কেন ও বিদ্রোহ ঘটাচ্ছে—কিন্তু কিছুতেই জানা যাচ্ছে না। পারা যেমন পিছলে বেরিয়ে যায়, তেমনি করে, ওঁর হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে আসল সত্য...

কিন্তু তিনি ডি. সি.। বিরসা বিদ্রোহী। সাক্ষ্য প্রমাণ পেলে, কেস দাঁড় করাতে পারলে ওকে উনি চরম শাস্তি নিশ্চয় দেবেন। ছোটনাগপুর রেন্ট-ল-তে মুণ্ডাদের কোনো স্বার্থই সংরক্ষিত হয়নি। সে-আইন সংশোধন করতে তো উনিও চেষ্টা করছেন। আইন সংশোধন করতে দু-পাঁচ বছর লাগে। দু-পাঁচ বছর অপেক্ষা করলে কি হত? জমিদারকে সহায়তা

করছে সরকার? জমিদার-সরকার দু-পক্ষই মুণ্ডাদের শোষণ করছে? তাতে ধৈর্য হারাবার কি আছে? কবে মুণ্ডাদের শোষণ করা হয়নি? কবে তারা ভরপেট খেয়েছে? সুবিচার পেয়েছে?...

ডি. সি. শুকনো গলায় বললেন, 'রিপোর্ট পড়।'

—'তামার থানার দু'জায়গায় ক্রিশ্চানদের ওপর আক্রমণ ঘটেছে। বিরসার আদিবসতি উলিহাতুতে গ্রামের চার্চে তীর ছোঁড়া হয়েছে। তোরপাতে ক্রিশ্চানদের ওপর তীর ছোঁড়া হয়েছে। মারচা গ্রামে জন প্রহান্ অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচেছে। বাসিয়াতে জার্মান মিশন চার্চে তীর চলেছে, কাজারাতেও। রামটোলিয়াতে একটি ক্রিশ্চান ছেলে জখম হয়েছে।

—'আরও আছে?'

—'খুন্‌টি থানায় বহু গ্রামে আগুন দেওয়া হয়েছে।'

—'মুণ্ডারী গ্রামে?'

—'না। মুরহুতে অ্যাংলিকান্ স্কুলে রেভারেন্ড লাস্‌টিকে তীর ছোঁড়া হয়। জখম হয়নি।'

—'লাস্‌টি বিরসাকে প্রথমবার গ্রেপ্তার করার সময়ে চালকাড় গিয়েছিল। ...জখম হয়নি।'

—'না। দিস্ আই ডোন্ট্ কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড্।'

—'আই ডু।'

—'কি?'

—'মেরে ফেলা বা গুরুতর জখম করা এখন ওদের প্রোগ্রাম নয়। সেরকমটা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু সমস্ত প্রোগ্রামটা এখন এই অবস্থায়, এখনো অন্যরকম।'

—'তাহলে?'

—'দে আর ইজ মোর টু ফলো। রিপোর্ট পড়।'

—'সরোয়াড়া মিশনের গুদামঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়, রেভারেন্ড হফ্‌ম্যান ও রেভারেন্ড ক্যারবেরিকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়া হয়। দ্বিতীয় জন বুকে আঘাত পেয়েছেন। চন্দাগুটুর প্রচারকও তীরের আঘাতে জখম হয়েছেন। হফ্‌ম্যান, ক্যারবেরি ও অন্যরা মিশনে ইঁট ও পাথর জড়ো করে বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন।'

—'প্রত্যেক জায়গায় পুলিশ পাঠাও।...তারপর?'

—'সিংভূমের ঘটনাগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কুনদগুটুর জার্মান মিশনচার্চ জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। লাগরাতে একজন কনস্টেবল নিহত হয়েছে। চক্রধরপুরে জার্মান চার্চে একজন চৌকিদার নিহত হয়েছে। সোমপুর অঞ্চলে একজন জার্মান ব্যবসায়ী নিহত। বিরসাইতরা স্লোগান দিচ্ছে, "হেন্দে রান্‌ব্রা কেচে কেচে। পুন্‌ডি রান্‌ব্রা কেচে কেচে।' এর মানে কি?

—'কালো ক্রিশ্চানদের কেটে ফেল। সাদা ক্রিশ্চানদের কেটে ফেল। তারপর?'

—'এখন পর্যন্ত এই খবর।'

—'ডুরান্ডায় খবর দাও।'

—'কোথায় ?'

—'আর্মি অফিসে। কমান্ডিং অফিসারকে বলে, ছোটনাগপুরের ডি. সি.-র স্পেশাল রিকুইজিশান······হাঁ মুখেই রিকুইজিশান করছি, লিখে করছি না······ক্যাপ্টেন রোশ্‌কে ছুটি থেকে ডেকে পাঠানো হোক। আমি রোশ্‌কে নিয়ে সিক্সথ জাঠ রাইফেলস্ নিয়ে উপদ্রুত অঞ্চলে যাব।'

—'হ্যাঁ সার। কিন্তু ··'

—'মুখে আর্মির সাহায্য তলব করা ইরেগুলার এই তো ? কিন্তু আর্মি ছোটনাগপুরে আছে কেন ! বিদ্রোহ ঘটলে দমন করবার জন্যেই তো ? আমি মনে করি এটা মুণ্ডা বিদ্রোহ, বীরসা এর নেতা। কমান্ডিং অফিসার আর্মি-দপ্তরের সঙ্গে বুঝে নেবেন। এখন তাঁকে জানাও, আমি সিক্সথ্ জাঠ রাইফেলস্ চাই।'

—'ইয়েস স্যর।

এইসব কথাবার্তা হল ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

২৯শে ডিসেম্বর একটি ডেসপ্যাচ* গেল ডুরান্ডার কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে অ্যাডজুটেণ্ট জেনারেল ইন ইণ্ডিয়া / হোম ডিপার্টমেণ্টে :

"ছোটনাগপুরের কমিশনারের মৌখিক তলবে ডুরান্ডার কমান্ডিং অফিসার আজ সকালে (২৯।১২।১৮৯৯) ক্যাপ্টেন রোশ্‌-এর নেতৃত্বে সিক্সথ্ জাঠ রাইফেলস্-এর আশি জন সৈনকে ডুরান্ডা হইতে আনুমানিক কুড়ি মাইল দক্ষিণে চাইবাসা রোডে অবস্থিত খুন্টিতে প্রেরণ করিয়াছেন, কেননা উক্ত অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ আশঙ্কা করা যাইতেছে। রেগুলেশন মতে পার্টি গোলা-বারুদ লইয়াছে···"

২৯শে ডিসেম্বর স্ট্রীটফিল্ড ও ক্যাপ্টেন রোশ্ সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন, বিদ্রোহের বিস্তার দমন।

---

* টেলিগ্রাম নং ৩৫০ তারিখ—২৯।১২।১৮৯৯ প্রোগ্রেস নং ৩২৬। দ্রষ্টব্য হোম ডিপার্টমেণ্ট, মেমো নং ৪৫৩—ক্যাম্প। তারিখ—৩০।১২।১৮৯৯

এই মর্মে স্ট্রীটফিল্ড লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উদ্দেশে একটি নোট পাঠান। তার খসড়ায় লেখেন—"বন্দগাঁও এবং সিংভুম জেলায় অন্তত্র তদন্তে প্রকাশ, বীরসাইত সংগঠন এতদঞ্চলে অতীব শক্তিশালী। সিংভুম জেলার ১৫০ বর্গমাইল এলাকা, খুন্টি ও তামার থানার ৩০০ বর্গমাইল এলাকা এবং রাঁচি জেলার বাসিয়া থানার ১০৯ বর্গমাইল এলাকায় অবিলম্বে পুলিসবাহিনী মোতায়েন করা হইবে। পুলিস উল্লিখিত এলাকাগুলির সকল গ্রামে টইল দিবে ও গ্রামবাসিগণ এই বিশাল পুলিসবাহিনীর অবস্থিতিজনিত ব্যয়ভার বহনে বাধ্য থাকিবে। দুই জেলার মধ্য সীমান্তে অবস্থিত বন্দগাঁও এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কেন্দ্র হইবে। খবরে জানা গেল, দুমকা ও চুঁচুড়া হইতে মিলিটারি-পুলিসবাহিনী রাঁচির উদ্দেশে রওনা হইয়াছে।"

এই সময়ে রাঁচির জনৈক বাসিন্দা উকিল লছমন প্রসাদের উদ্দেশে এস. আই. হাজারীপ্রসাদ একটি চিঠি দেন: "যথাবিহিত সম্মান নিবেদনান্তে ও হাজার প্রণাম জ্ঞাপনান্তে কাকাজী। আমাকে বদলীর জন্য আপনি দপ্তরে যেভাবে পারেন চেষ্টা করিবেন। আমার প্রাণ চলিয়া গেলে চাকুরি লইয়া কি করিব। আপনার যে টাকা লইয়াছি, শ্বশুরের জমি বেচিয়া তাহা শোধ করিব। যে বিপদে পড়িয়াছি মহাবীরজীও তাহা হইতে উদ্ধার করেন এমন আশা দেখি না।

কাকাজী! কমিশনার সাহেব খেপিয়া গিয়াছেন, বীরসাকে ধরিবেন। আমার সকল জমিজমা শ্বশুর যাহা দিয়াছেন, সব আপনার কৃপায় খুটকাট্টি গ্রাম উচ্ছেদ করিয়া লব্ধ। বীরসাইতরা আগেই আমার আড়াং পুড়াইয়াছে। এখন আমার আড়াংয়ে তীর ফুঁড়িয়া শ্বশুরের কাছারিতে রাখিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় এই অঞ্চলে টইল কায় করা মানে আত্মহত্যা করা। বড় বিপদে সকল কথা বলিতেছি।

চৌঠা হইতে ছউই জানুয়ারী অবধি বীরসার খোঁজে আমরা যমকোপাই, ডোম্বোয়তো এবং সব গ্রাম ঘুরিলাম। যমকোপাই হইতে রাতের আঁধারে রিজার্ভ ফরেস্টএর নালার কিনারা ধরিয়া কিছুদূর গিয়া গাইডরা পলাইল। বীরসার ভয়ে উহারা ইচ্ছা করিয়া পথ ভুলাইয়াছে। সঙ্করা গ্রামে গিয়া দেখি সকল বাড়ি জনশূন্য, খাঁ খাঁ

করিতেছে। বুঝা গেল, গাইডরা খবর দিয়াছে তল্লাসী হইবে। সবাই পলাইয়াছে। গাছের উপরে বসিয়া বালক বীরসাইতরা দেখিয়াছে, সাবধান করিয়াছে। বড় বাহিনী লইয়া আলো জ্বালিয়া সোর তুলিয়া তল্লাসী করিলে বীরসাকে ধরা যাইবে না, বুঝা গেল। আমি কি করি! রোগোতো গ্রামও জনশূন্য। মালগো মুন্দার ঘর হইতে বীরসার ব্যবহৃত তিনটি চারপাই ও একটি ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করিয়া আনিয়াছি। কিন্তু মুণ্ডারা মারিবে ভয়ে আমি মারিতেছি। অধিক কি! জমাদার ঈশ্বর সিং রাঁচিতে ডাক লইয়া যাইতেছে, তাহার হস্তে এই চিঠি দিলাম।'

ক্যাপ্টেন রোশের ডায়েরির একটি পাতা :

'যেখানে মুণ্ডাদের ধরা গেছে, সেখানে জেরা করে যা জানা যাচ্ছে, তা অবিশ্বাস্য। জেরার অবিকল বর্ণনা দিলাম

ডি. সি., 'কেন তুমি মিশনে আগুন দিতে চেয়েছিলে?'

—'বীরসা বলেছিল, ভগবান বলেছিল।'

—'বীরসা ভয় দেখিয়ে বলেছিল?'

—'না। ভয় দেখাবে কেন?

—'তুমি নিজে শুনেছ, নিজ কানে?'

—'না। আমি তাকে চোখে দেখিনি। আমার বাড়ি অনেক দূর।'

—'ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলের পথে আসছিলে কেন?'

—'মিশনে আগুন দেব বলে। আমি কি জানি সব হয়া চুকে গিয়াছে?'

এই সময়ে স্ট্রীটফিল্ড লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উদ্দেশে একটি চিঠিতে লেখেন—'শুধু সন্ত্রাসমূলক কাজ দিয়ে ভয় দেখিয়েই যদি বীরসা জনসাধারণের বৃহত্তর অংশকে সপক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হত, তবে আক্রমণমূলক কাজকর্ম বেড়েই চলত, এই আন্দোলন এক ব্যাপক বিদ্রোহে পরিণত হওয়া পর্যন্ত বেড়েই চলত, তাতে আমার নিজের কোনো সন্দেহ নেই।'

পোরাহাটের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে স্ট্রীটফিল্ড বীরসার খোঁজে ফিরতেই লাগলেন। বীরসা

এখন একটা চ্যালেঞ্জ, একটা বিরাট অপমান তাঁর প্রতি। স্ট্রীট্‌ফিলড্‌-এর এখন মনে হতে লাগল, বিরসা সব জানছে, মুখ লুকিয়ে হাসছে।

রোশ্‌ একটু গরম হয়েই বললেন, 'যদি গুলিই চালাতে না দেন, হোআই কল দি আর্মি? হোআই?'

স্ট্রীট্‌ফিল্‌ড্‌ বললেন, 'না।'

—'কেন?'

—'গুলি চালাবেন কার ওপর? বুড়ী, বুড়ো, বাচ্চাদের ওপর?'

—'বাট দিস্‌ ইজ রেবেলিয়ন।'

—'ইজ ইট? আপনি কি ডিকশনারি পড়েন?'

—'না।'

—'ডিকশনারিতে বলছে, প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে, সঙ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র বিরোধিতার নাম রেবেলিয়ন। এখনো সেরকম কিছু ঘটেনি। ব্যাপকভাবে আক্রমণমূলক, অগ্নিসংযোগমূলক কাজ হয়েছে। কিন্তু তা ক্রিশ্চান ও সাহেবদের বিরুদ্ধে। প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতা তাকে বলে না।'

—'তার কি দেরি আছে?'

—'না। আমি যতটুকু বুঝছি, দেরি নেই।'

—'খবর পেয়েছেন কোনো?'

—'না। দুয়ে দুয়ে যোগ করে দেখছি চার হচ্ছে!'

'রোশ্‌ মাথা নাড়লেন। সিভিল প্রশাসন তিনি বোঝেন না। ছোটনাগপুরের পক্ষে বর্তমান ডি. সি. বোধহয় খুব যোগ্য নন।

কিন্তু ডি. সি. বুঝতে খুব ভুল করেননি। পাঁচই জানুয়ারি পর্যন্ত ডি. সি. ঘুরতে লাগলেন, ডি. সি.-র শত শত পুলিশ ও গোয়েন্দাদের এক বৃহৎ অংশ খুন্‌টিতে আহোরাত্র বিরসাকে খুঁজতে লাগল।

সেই খুন্‌টি থেকেই ২৭শে ডিসেম্বর বিরসার আহ্বান ছড়িয়ে পড়ল,

—'বড়দিনের পর দু-দিন কেটেছে। সরকার এখনি মুণ্ডাদের, বিদ্রোহী মুণ্ডাদের দমনে তৎপর হয়ে উঠেছে। এবার আমরা ক্রিশ্চান মুণ্ডাদের ওপর তীর ছুঁড়েছি বটে, কিন্তু এখন থেকে বিরসাইতরা আর কোনো মুণ্ডার ক্ষতি করবে না। তাদের শত্রু দিকুরা এবং সরকার, বিশেষ করে সরকার। সাহেব ও সরকার আমাদের শত্রু। মুণ্ডা, সে ক্রিশ্চান হোক বা না হোক, তার কোনো ভয় নেই।

বুরজু মিশনের রেভারেন্ড পাট্‌সিং ডি. সি.-কে বললেন, ডি. সি. মুণ্ডাদের টিকিও দেখতে পাচ্ছেন না, এ বড় আশ্চর্য। তিনি খবর পেয়েছেন, জঙ্গলে মুণ্ডারা জমায়েত হচ্ছে উদ্দেশ্য পুলিস ও মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধ। ৬ই জানুয়ারি বুরজু মিশনের কাছে জঙ্গলে কাঠের কন্ট্রাক্টর জিয়েস্‌ সাহেব ও তাঁর চাকরের তীরবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

জিউরার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে দিনমানে মুণ্ডারা ঢুকত না। জিউরার জঙ্গলে, আশ্চর্য, মাইলের পর মাইল প্রতিটি গাছ প্রায় সমোচ্চ। সব গাছই দেখতে এক রকম। কোনো

জলাশয় নেই, তাই জীবজন্তু বেশি দেখা যায় না। তাছাড়া লোকে বলে ও জঙ্গল অরণ্যরক্ষয়িত্রী পরীদের লীলাভূমি। জীবিত মানুষ দেখলেই তারা হাতছানি দিয়ে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে চুলের ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলে।

রাতে জিউরার জঙ্গলে বিরসাইতরা সমবেত হল। চাঁদের আলো জঙ্গলে ঢোকেনি। তবে অন্ধকার সামান্য স্বচ্ছ হয়েছে মাত্র।

বিরসা বলল, 'এরপর সাহেব, সাদা চামড়ার সাহেব ও সরকারের সঙ্গে লড়াই। যত কথা আগে বলাছি, স্মরণ রেখাছ হে তোমরা, সরকার ধরতে পারে নাই কারেও। মোদের হাতিয়ার হতে ওদের হাতিয়ার অনেক সেরা। ওরা তারে খবর পাঠায়, রেলে সিপাই আনায়, অনে—ক বন্দুক, অনে—ক টাকা, অনে—ক সিপাই ওদের। কিন্তু মোদের জাহান চলে যায়! ওদের জাহানের কথা নাই। সিপাই মাইনা নিয়ে লড়ে! হ্যাঁ! সরকার সহজে ছাড়বে না ছোটনাগপুর মোদের হাতে! কিন্তু মোরা কখনো ভাবি নাই, আমি তোমাদের বলি নাই, এ সহজ লড়াই হবে। উলগুলান সহজে হবার নয়।'

মুণ্ডারা নিশ্চুপ।

—'এতকেদিতে গয়া মুণ্ডার ঘরে যাট জন বিরসাইত যাবে। সেখান হতে সভা করে লড়াইয়ের কথা প্রচার দিবে যাট জন যাট দিকে যেয়ে।'

—'ভগবান!'

—'বল গয়া!'

—'আমি পুরানো সর্দার, তায় বিরসাইত হয়াছি। মোরা সভা করতে না করতে সিপাই আসে যদি?'

—'যেমন অবস্থায় পড়বে, তেমন নিজের জ্ঞানে লড়বে হে গয়া। সকল বিরসাইতদের সঙ্গে আমি সকল সময়ে শরীরে হাজির নাই, মনে হাজির আছি।

বাস্, সভা খতম্! যেমন নিশ্চুপ এসাছ, তেমনি নিশ্চুপে চলে যাও।'

গয়া বলল, 'যারা সভা করে না, মোদের সাথে কথা বলে কাজ করে না, তারা, সে-সকল মুণ্ডাও, 'মোরা ভগবানের পথে উলগুলান করি' বলে চেতে ওঠে পুলিশের নজরটা এতকেদি পানে ফিরাতেছে। মোদের তীর ছুঁড়া, আগুন দিবার কাজ হল একদিনে। মোরা থামলাম। কিন্তু হেথা সেথা, সাইকোতে কতকগুলো মুণ্ডা অধিক চেতে বিপদ ঘটায়েছে তীর ছুঁড়ে, আগুন জ্বেলে যখন-তখন।'

বিরসা বলল, 'উপায় নাই! এ রকমটা হবে হে।'

খুন্টির হেড কনস্টেবল এতকেদিকে পৌঁছয় ৪ঠা জানুয়ারি।

এতকেদি থেকে কিছুদূরে তাঁবু ফেলল। সামনে তাজ্না নদী। নদীর জল বড়-বড় পাথরের বাঁধে আটকে সুন্দর একটি কুণ্ড হয়েছে। সাইকোও এতকেদি গ্রামের লোকের এই নদীই বছরভোর ভরসা।

সন্ধ্যায় মেয়েরা নদীতে জল নিতে এল। বলল, 'ঘোড়া সরাও হে, ঘোড়া লাথি মেরে কলসি ভেঙে দিবে।'

—'ঘোড়া, কোথায়, তোরা কোথা?'

—'মোরা ডর খাই। কানাত ফেলাছ কেন?'

—'খেলা দেখাব। কা'ল দেখবি।'

দান্তু মুণ্ডার বুড়ী-মা চিরকাল কটুভাষী, বেপরোয়া বদরাগী। সে বলল, 'দু-বছরে তোদের খেলা দেখে-দেখে মোদের আর মন নাই রে। খেলা দেখালে খেলা দেখবি।'

—'কি করবি?'

—'তোদের কানাতে বোলতার চাক ভেঙে দিব। গাছের ডালে চাক ঝুলে, ডাল কেটে আনব।'

—'অ'রে! মোরা সরকারী কাজে এসেছি।'

রাত না হতে গয়া মুণ্ডা সব জানল। বীরসাইতরা ততক্ষণে এসে গিয়েছে। গয়া বলল, 'ভগবান বলাছে যেমন অবস্থা, তেমন ব্যবস্থা করবে। দেখি সকালে কি অবস্থা হয়। তখন বুঝা যাবে।'

গোপী বলল, 'মোরা আছি, দেখা যাবে।'

সকালে খবর এল, হেড কন্‌স্টব্‌ল তাঁবুতে বসে আছে। দুজন কন্‌স্টব্‌ল ও তিন জন চৌকিদার গ্রামে আসবে বলে নদীর চড়ায় নেমেছে।

চড়ার বালি ও পাথর ভাঙতে ভাঙতে কন্‌স্টেব্‌লরা মুখ তুলল। ওরা নিচে। উপরে, পাড়ের উঁচুতে, পাথরের ওপর সারি-সারি মুণ্ডা। হাতে বলোয়া, তীর-ধনুক।

গয়া হাত তুলে বলল, 'সামারে হিজুলেনাকো মার গোয়েকোপে। সম্বর হরিণ এসেছে, মার ওদের।'

কন্‌স্টব্‌ল ও চৌকিদাররা দু-দিক থেকে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল। কন্‌স্টব্‌লদের হাতে বন্দুক। ওপর থেকে জলোচ্ছ্বাসের মত নেমে এল মুণ্ডারা। গয়া বলল, 'জয়রামকে আমি মারব হে! ও আমার ধানের টাল ভেঙে জমিদারের হাতি ঢুকায়ে খাওয়ায়ে দিয়াছিল!'

—'মোরে মারিস না গয়া'—জয়রামের কথা শেষ হতে পেল না। বলোয়ায় রোদ ঝলকাচ্ছে···ইস্পাত জ্বলছে···জ্বলন্ত ইস্পাত নেমে এল···উঠল···আবার নেমে এল···উঠল···

তারপর মুণ্ডারা ফিরে গেল। কন্‌স্টব্‌লদের দেহ পড়ে রইল।

দুপুরে হেড কন্‌স্টব্‌ল দেখল সমস্ত নির্জন। 'কিছু রাখে নাই হে!' বিতৃষ্ণায় বলে, জয়রাম ও বুধুর দেহ বস্তায় পুরে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ওরা ঘুরপথে রাঁচি রওনা হল। সিধে পথে বীরসাইতরা ছিল।

মুণ্ডারা গ্রামে ফিরে এল। ওদের রক্তে নাগারা বাজছে, ঢোল, মাদল। এ সেই হোলির পর শিকারের সুখ। প্রাচীন ধর্মের রক্তোৎসবের আনন্দ।

মেয়েরা পুরুষদের পায়ে জল ঢেলে দিল। গান গাইতে লাগল মেয়ে ও পুরুষ।

বন্দ্‌গাঁওতে তাঁবুতে বসে রোশ স্ট্রীট্‌ফিল্‌ডকে বললেন, 'এখন?'

ডি. সি. বললেন, 'রেবেলিয়ন।'

—'তবে?'

—'হ্যাজ টু বি ক্রাশ্‌ড্‌।'

—'কে যাবে?'

—'আমি!'

—'কমিশনার ফর্ব্‌স?'

—'আমি যাব।'

হাজার হলেও, সরকারী প্রশাসনে এই নিয়মই চলে। বিপদের মুখে আগে যায় কন্‌স্টব্‌ল, তারপর হেড-কন্‌স্টব্‌ল, তারপর ছোট দারোগা, তারপর বড় দারোগা, তারপর ক্রমে-ক্রমে ওপর মহলের অফিসার। এই সিঁড়িভাঙা অঙ্কে আগে ডি. সি. পরে কমিশনার।

ওদিকে এতকেদিতে গয়া মুণ্ডার বউ মাকি কোমরে হাত দিয়ে গয়াকে বকে তুলো ধুনে দিতে লাগল।

—'হা রে! তোর কোনোদিন বুদ্ধি নাই, আছে শুধু গোঁ। পুলিস মারা করলি। সাহেব তোরে ছাড়বে? ঘরে বসে বলোয়া শান দিয়ে উলগুলান করছিস কি রে। জঙ্গলে পলা।'

—'হা তোর পলানের মাথায় ঝাড়ু। ভগবান মোরে এতকেদি ধরে থাকতে বলাছে।'

—'আরে বোকাটা। গিধ্‌ধড়টা! আরে গোঁয়ার! ভগবান বলে নাই অবস্থা বুঝে বেবস্থা? এখন কখন তারা এসে পড়ে। তবু

এতকেদি ধরে থাকবি ? পুরুষগুলোকে মায়া করবি ?'

—'তোদের ছেড়ে যাব ?'

মাকি বলল, 'পাথর ছুঁড়ে পা ভেঙে দিব। মোদের ছেড়ে যাবি না। কতদিন ঘরে থাকতিস তুই ? মুলকি লড়াই হতে আজ অবধি ঘর কার উপর থাকত ? আমার উপর। আমার উপর এখন ভরসা নাই ?'

গয়া মুণ্ডা অবিচল। বাইরে গিয়ে ওর ছেলে সাম্‌রেকে বলল, 'তোর মা খেপে গিয়াছে খুব।'

—'তুঁমও খেপাও। মার কথার জবাব করতে নাই। কাল মোরে জঙ্গলে যাবার তরে মারতে উঠাছিল।'

—'তেজ খুব রে ! নয়তো বাঘ মোর পা ধরাছিল, তুই ওর পিঠে বাঁধা গেঁদাটা। বলোয়া দিয়ে বাঘের মুখ কোপায়ে মোরে টেনে আনছিল।'

ডি. সি. বন্দ্‌গাঁও-ক্যাম্প থেকে চলে এলেন। মুণ্ডাদের ডেকে বললেন, 'তোমরা আত্মসমর্পণ কর। আমি ডেপুটি কমিশনার বলছি।'

ভেতর থেকে গয়া হেঁকে বলল, 'ডি. সি. আছ, ডি. সি. থাকগা। মোর বাড়িতে ঢুকবার কোন অধিকার নাই হে তোমার, কোনো অধিকার নাই।'

—'আত্মসমর্পণ কর।'

—'সকাল এখন। কাজ আছে মোদের, তুমি যাও।'

এই ঘটনার* যে রিপোর্ট ডি. সি. কমিশনারকে দিয়েছিলেন তা হল :

'যথাসাধ্য বোঝালাম আমি, বললাম, আমি কে, কোনো ফল হল না। অবশেষে সাব ইন্‌স্‌পেক্টর ইল্‌তাফ হুসেন, ঘরের ভেতর যারা ছিল তাদের বুঝিয়ে বলবার জন্যে ঘর ও বারান্দার মাঝের মাটির দেওয়ালের কাছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী কুড়াল ইল্‌তাফের মাথা লক্ষ করে ছুটে এল। কাঠের বরগায় ঘা খেয়ে কুড়ালটার আঘাতটা সরে গেল, নইলে ইল্‌তাফ মরত। ইলতাফের পাগড়িতে চোট লাগল, ও বারান্দায় ছিটকে পড়ল...'

ইল্‌তাফ চেঁচাল, 'সাহেব, গুলি মারুন!'

'গড! ঘর বোঝাই মেয়েছেলে যে!'

ডি. সি. ছাতের বরগায় গুলি ছুঁড়লেন। মাকি চেঁচিয়ে বলল, 'মোরা বারাব না, তুই এলে মেরে দিব!'

গয়ার হাতে তরোয়াল! গয়া বলল, 'আয়, কেমন সাহেব দেখি। মার গুলি!'

ডি. সি. গয়ার হাত লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লেন। ও যদি তরোয়ালটা ফেলে দেয়! গুলি ফসকে গেল।

—'ঘর জ্বালিয়ে দেব গয়া।' ডি. সি. দেশলাই দেখালেন।

—'দে! দুশো বিরসাইত চলে আসবে।'

ডি. সি. দেশলাই জ্বালালেন, ঘরের চালে ছুঁড়লেন। হু-হু করে জ্বলে উঠল খড়। পশ্চিমের বাতাস।

ঘর থেকে শোনা গেল, 'হাঁ তোর সাহেব মরদ রে!—কাদের ডরাছিলি দেখ্‌।'

ওরা বেরিয়ে এল! গয়ার হাতে তরোয়াল, মাকির হাতে বড় লাঠি, ওদের ছোট ছেলের হাতে বলোয়া, চৌদ্দ বছরের নাতি রামুর হাতে তীর-ধনুক, দুই পুত্রবধূর হাতে দাউলি ও টাঙি, তিন মেয়ে থিগি, নাগি ও লেম্বুর হাতে লাঠি, তরোয়াল ও টাঙি। গয়া বলল, 'চলে আয় সামনে!'

ডি. সি. রিভলবার ছুঁড়লেন। গয়ার ডান কাঁধে গুলি বিঁধল। ডি. সি. জানেন এবার গয়া পড়ে যাবে, টলে পড়বে। কিন্তু না গয়া ছুটে তরোয়াল ফেলে ওঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পেছন থেকে গয়ার স্ত্রী মাকি ডি. সি.'র মাথায় লাঠি মারতে লাগল। এখন পুলিস উন্মত্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েদের, বালকদের উপর। গয়ার পুত্রবধূদের পিঠে কঁচি ছেলে বাঁধা। ওদের হাতে লাঠি, টাঙি, তরোয়াল! পুলিসের হাতে সঙিন ছিল। ধু-ধু করে ঘর জ্বলছিল। পশ্চিম থেকে বাতাস বইছিল।

এখন গ্রাম থেকে যে নিরস্ত্র মুণ্ডারা ছুটে এল, তারা কেউ বিরসাইত নয়। আরও পুলিস ছুটে এল। সঙিন চলছে। দু-ঘণ্টা লড়াই চলবার পর তবে সঙিনের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত গয়া, মাকি, মেয়েদের, বউদের, বালকদের বন্দী করা গেল। অন্য মুণ্ডাদেরও।

চার মাস পরে, মে মাসে রাঁচি আদালতে ব্যারিস্টার জেকব প্রশ্ন করেছিলেন, 'মেয়ে ও শিশুরা আছে জেনেও দুটি গুলি ছোঁড়ার সপক্ষে ডি. সি.-র কি বলবার আছে? কোন্‌ যুক্তিতে তিনি নিজেকে সমর্থন করেন?'

ডি. সি. বললেন, 'গয়াকে হত্যাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সবচেয়ে কম রক্তপাত ঘটিয়ে

অবস্থাটি আয়ত্তে আনবার জন্যে আমি গুলি ছুঁড়ি।'

বাংলা প্রদেশের শাসক লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছোটলাট ডি. সি.-কে সমর্থন করেন। জেকবের সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা নিষ্ফল করে দেন।

রাঁচি ফিরে এসে ডি. সি. জানালেন, গয়ার সাহস ও যুদ্ধ, মেয়েদের প্রতিরোধ, সবই তাঁর কাছে বিস্ময়ের মতো বোধ হচ্ছে। বিরসাইতরা এবার নিশ্চয় মিশন আক্রমণ করবে।

কিন্তু বিরসার সৈন্যরা খুন্টি থানার দিকে ৭ই জানুয়ারিই এগিয়েছিল। ডি. সি. তা জানতেন না। গয়া মেঝেতে থুথু ফেলে বলেছিল, 'ডি. সি.-রে আটকা রখা করাছি। ভগবান তাই বলাছিল। নয়তো খুন্টিতে লড়াই হত।'

বিরসাইতদের পরনে ধপধপে ধুতি, হেঁটো ধুতি, মাথায় পাগড়ি। তীর ও ধনুক, ঢাল ও তরোয়াল, বর্শা ও বলোয়া সূর্যের দিকে তুলে ধরে ওরা নেচে নেচে আসছিল, মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছিল। ডোন্‌কা ও মাঝিয়া মুণ্ডা ছিল সামনে ও পেছনে। ওরা গাইছিল।

'জিলিবা জিলিবা
জোলোবা জোলোবা
পানতিয়াকানালে বিরসা হে!
তিরোদা সেন্‌দেরা
লেংগা তিরিয়া
জোম তিরেসার
পানতিয়াকানালে বিরসা হে!
(মোদের হাতিয়ার জ্বলছে হাতে
ও বিরসা! আমরা চলেছি সার বেঁধে।
বাঁ হাতে ধনুক ডান হাতে তীর
মোদের হাতিয়ার জ্বলছে হাতে
ও বিরসা! আমরা চলেছি সার বেঁধে!')

মাঝে-মাঝে ডোন্‌কা গানের ফাঁকে-ফাঁকে বলছিল, 'মুণ্ডা এলাকায় এ খুন্টি থানাটা সরকার হয়ে বসা আছে হে!'

বলছিল, 'চেঁচিয়ে চল হে মুণ্ডারা! হাতিয়ার নিয়া চল! খুন্টিতে অড়হর পেকেছে, কাটবে চল হে!' মোরা তামার থানা হাগাদা থানা হতে এসেছি, চল হে!'

ছটুবদাগ, পাতরা, গৌরমারা সব জায়গা থেকে মুণ্ডরা এসে শামিল হচ্ছিল, মুণ্ডাদের মিছিল লম্বা হচ্ছিল, আকাশে সূর্য জ্বলছিল, ওদের হাতে হাতিয়ার।

খুন্টিতে মাত্র পাঁচজন কনস্টেবল ছিল, দুজন সহিস, দুটো বন্দুক। খুন্টির লোকরা বলছিল, "কেউ নাই হে! সবাই বিরসাইতদের ধরতে দিকে দিকে গিয়াছে।' এ-কথা শুনে মুণ্ডারা যুদ্ধের ডাক 'কুলকুলি' দিচ্ছিল, সূর্যের দিকে হাতিয়ার তুলে ধরে লাফ মারছিল। ওদের চিৎকার শুনেই কনস্টেবল ও সহিসরা থানা ছেড়ে পালায়, কিন্তু কনস্টেবল রঘুনিরাম পালাতে পারেনি, পড়ে গিয়ে ও প্রাণভিক্ষা চাইছিল। ডোন্‌কা বলে, 'তুই কবে

মুণ্ডাদের উপর দয়া দেখাচ্ছিস রে? দয়া গাছে ফলে যে পেড়ে এনে দিব?'
ডোন্‌কা ও মাঝিয়ার হাত উঠছিল, নামছিল, উঠছিল, নামছিল। তারপর রঘুনিরামের রক্তমাংস পথে বিছিয়ে গেলে বীরসাইতরা উল্লাসে নেচে, 'এই সেই থানা! এখান হতে মুণ্ডা মারতে পুলিস বারায়!' বলে খড়ের মুটি তীরের আগায় বেঁধে তাতে আগুন জ্বেলে থানার চালে ছুঁড়ছিল। আগুন জ্বলে উঠল হুহু করে।

থানায় মাইনের টাকা ছিল। অনেক টাকা। বীরসাইতরা সে টাকা ছোঁয় নি। আবার ওরা ফিরে চলছিল মহুয়াটলির দিকে। গ্রামের একটি বাড়িতেও ওরা ঢোকেনি, জিনিস লুঠ করে নি, ওরা গান গাইছিল, মাঝে-মাঝে সূর্যের দিকে হাতিয়া'র তুলে লাফিয়ে উঠছিল।

১২ই জানুআরি সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে বড়লাট টেলিগ্রাম করলেন—'গণ বিদ্রোহ ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে।'

॥ ১৯ ॥

সব কিছু ঘটে যাবার অনেক, অনেক পরে—রেভারেণ্ড হফ্‌ম্যানের কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ার জন্যে সুপার হাত কামড়ে ছিলেন।

২৪শে ডিসেম্বরের ঘটনা ঘটে গেলে পরে হফ্‌ম্যান লিখেছিলেন, 'সিমবুয়া গ্রামের এক নতুন বীরসাইতকে তার ভাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করেছে। তার কাছে শুনলাম, ২৪শে ডিসেম্বরের আগে পরপর তিন রবিবারে তিনটি পঞ্চায়েতে ক্রীশ্চানদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা বলা হয়। প্রথম পঞ্চায়েতে হাজির ছিল শুধু পুরাণকরা।

সেখানেই তারিখ ঠিক করা হয়। তিন বা চারজন বীরসাইতের বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ২৪শে ডিসেম্বর ক্রীশ্চানদের ঘরে আগুন দিতে ও তীর ছুঁড়তে নির্দেশ দেয় তারা। শেষ পঞ্চায়েতে নানক বা নব-দীক্ষিত বীরসাইতরা এ কথা জানে। 'আমি যার কথা বলছি, সে সেদিনই তার ভাইয়ের কাছে যায় ও বলে আজ থেকে তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হল।'

কিন্তু হফ্‌ম্যানকে কোন সময়েই রাঁচি-সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি।

ছোটনাগপুরের ইভানজেলিকাল মিশনের পাক্ষিক পত্রিকা 'ঘরবন্ধু'। তার ১৫ই জানুআরি, ১৯০০ সংখ্যায় এক সংবাদ প্রকাশিত হল. ৮ই জানুআরি বীরসাইতরা রাঁচি আক্রমণ করবে ভেবে শহরে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। স্বেচ্ছাসেবী, পুলিস-কন্‌স্টব্‌ল ও অফিসাররা বন্দুক কাঁধে চব্বিশ ঘণ্টা শহরে ঢুকবার পথগুলি পাহারা দিচ্ছেন।

খুন্‌টি থানা আক্রমণের খবর জানা যেতেই রাঁচির নিরাপত্তার জন্যে চারশো সৈন্য আনা হয়। অন্ধকার না হতে পথ নির্জন। 'দ্য ইংলিশম্যান' লিখল, নাগরিকদের ভয়, ঝোপের আড়াল থেকে বীরসাইতরা বিষাক্ত তীর ছুঁড়বে ১৭ই জানুআরির মধ্যে প্রতি ব্রিটিশ অফিসারের বাংলোর সামনে সশস্ত্র পাহারা বসল। রাঁচিতে পুলিস ও সিপাই রোঁদ দিতে থাকল। সিক্‌সথ্‌ জাঠ ডুরান্‌ডা সেনা-ছাউনি পাহারা দিতে থাকল···

বীরসা কিন্তু অন্য কথা ভাবছিল।

ডুরান্‌ডার কমান্‌ডিং অফিসার সিক্‌সথ্‌ জাঠ-এর দেড়শো রাইফেলধারী সৈন্য নিয়ে খুন্‌টি চলে এলেন। কমিশনার ফর্ব্‌স স্বয়ং এলেন রাঁচি থেকে। পথে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন সেনাবিভাগের কর্নেল ওয়েস্‌ট্‌মোরল্যান্‌ড। খুন্‌টিতে 'ঝটিকা তদন্ত' হল। এস. আই. রামবৃক্ষ্‌ সিং দশজন সিপাই নিয়ে বিদ্রোহীদের খোঁজে বেরিয়ে গেল। ফর্ব্‌স ও কর্নেল চলে এলেন বুরজু, স্ট্রীটফিল্‌ডের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ফর্ব্‌স বললেন, 'ডক্‌টর নট্‌রট আগেই বলেছিলেন—হ্যাঁ, মিশনের নট্‌রট্‌···মুণ্ডারা গণবিদ্রোহ করবেই।···বুরজু থেকে ছ-মাইল দূরে সাইকোতে ওরা জমায়েত হবে বলে ওঁর ধারণা।'

—'কিন্তু—'

—'না ডি সি.। প্রত্যেকের ধারণা নস্যাৎ করে নিজের ধারণামত চলার ফল খুব ভালো হয়নি।'

—'হুম্‌'

—'এখন আমি চার্জে। দিনকালের অবস্থা ভালো নয়। দেখ, প্লেগ হল যখন দু'বছর আগে, কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেল। যদিও দূরে, তবু মহারাষ্ট্রে টেররিজ্‌ম চলেছে। চাপেকার ব্রাদার্সের ফাঁসি অব্দি হল। গভর্নর জেনারেল কার্জন সিরিয়াসলি প্রদেশগুলো ভেঙে

ছোট করার কথা ভাবছেন। কলকাতায় নেটিভ প্রেসেও প্রচুর বিক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে।'

—'সে তো শিক্ষিত লোকের প্রতিবাদ।'

'ডিয়ার ডি. সি.! শিক্ষিত লোক হাজারটি প্রতিবাদ করুক, কিন্তু তার চেয়েও ডেস্‌পারেট অবস্থা জানবে যখন কয়েকটা বর্বর আদিবাসী স্থায়ী সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানায়।'

—'তবে?'

—'পাঞ্চের কার্টুনটা মনে আছে? বারুদের পিপের ওপর বসে দুটো ব্রিটিশ অফিসার পাইপ টানছে, আগুন ঝেড়ে ফেলছে, পিপে থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু...'

—'তুমি আর আমি সেই লোক দুটো। ছোটনাগপুর হল বারুদের পিপে। এখন লীভ এভরিথিং টু মি! হাজার হলেও লেফটেনান্ট গভর্নরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকেই, তোমাকে নয়।'

—'বেশ।'

—'রাঁচি রিজার্ভ পুলিস সাইকোতে চলে যাক। আমি বন্দ্‌গাঁও যাচ্ছি। সেখানে সিংভূমের ডি. সি. টমসন আসছে। সিংভূমের বন্দ্‌গাঁও বেবিং, কুন্‌দ্রুগুটু, লাগরা, সাংরা, গিরগা ও ডোরকা গ্রাম থেকে বীরসাইতদের উচ্ছেদ করতে হবে। আর্মির আটটা ডিটাচ-মেন্‌ট গ্রামে গ্রামে মোতায়েন থাকবে। বাকি সিপাই নিয়ে এস. পি. ঘুরে ঘুরে ডিটাচমেণ্টের কাছ থেকে খবর নেবে, সদরে পাঠাবে, হাতিয়ার বাজেয়াপ্ত করবে তারপর দেখা যাবে।'

—'আমি কি রাঁচি ফিরে যাব?'

—'তুমি, ক্যাপটেন রোশের সঙ্গে রিজার্ভ পুলিস আর জাঠ-রাইফেলের চাল্লশজনকে

নিয়ে সাইকো চলে যাও।'

—'আচ্ছা। তাহলে এখন থেকে...'

—'জাস্ট ওবে মি!'

স্ট্রীটফিল্ড সন্ধ্যা সাতটায় সাইকো পৌঁছলেন। পরদিন, ৯ই জানুআরি সকাল আটটায় এস. আই. রামবৃক্ষ সি ক্যাম্পে এল। শুকনো গলায় বলল, 'হুজুর সৈলরাকাব পাহাড় বিরসাইতে ভরে গেছে।'

—'নিজে দেখেছ?'

—'রাতে গাছে চড়ে বসেছিলুম হুজুর। সারারাত ওরা গিয়েছে, পাতার ওপর পায়ের শব্দ পেয়েছি। মেয়েরা বুঝি আছে হুজুর! দূর থেকে ছোটছেলের কান্না আসছিল।'

—'কমিশনারকে জানাতে হবে।'

—'জানেন। আসছেন।'

স্ট্রীট্‌ফিল্ড রোশ্‌কে বললেন, 'সাইকোর পর দাউদি, ডানদিকে ডোম্‌বারি-বুরু।'

—'হোয়াট?'

—'বুরু। ছোট পাহাড়। ডোম্‌বারি-বুরুর উত্তর-পুবে বোর্তোদি, একটা গ্রাম। সৈলরাকাবের দক্ষিণ-পুবে বিচা-বুরু, উত্তরে কুরুম্‌বা-বুরু গুটুহাটু গ্রাম, পশ্চিমে তিরিলকুটি-বুরু, কেরাওরা-বুরু।

—'হোআই টেল্ মি অল্ দিস্?'

—'সৈলরাকাবের চারদিকে পাহাড়, বিদ্রোহীদের গ্রাম, জঙ্গল।'

—'সো?'

'এবার গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পাবে।'

—'তোমার মতো বন্ধ ঘরে মেয়েদের ছুঁড়ব না।'

—'দেখা যাক।'

পশ্চিমে খুনটি থেকে সৈন্যরা এল। দক্ষিণে সাইকো থেকে পুলিশবাহিনী এল। মাথায় ইস্পাতের জাল দেওয়া টুপি, কাঁধে বেয়নেট, বন্দুক। কমিশনার ডি. সি., পুলিশ-সুপার, আর্মি কর্নেল, ক্যাপটেন, সবাই একসঙ্গে পা মিলিয়ে চললেন। আধ মাইল এগোতেই দূরে, সৈলরাকাবের গায়ে মানুষের নড়াচড়া বোঝা গেল।

সরকারবাহিনী জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। নালা ধরে এগোতে থাকল। জোজোহাটুর মাগন মুণ্ডা শালগাছের মাথায় বসে ওদের দেখতে-দেখতে নিচু শিস দিল। কিছু দূরে আর একটি শালগাছের মাথা থেকে আরেকজন নানক সে শিস শুনে শিস দিল। গাছের মাথায়-মাথায় শিসের সংকেত চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। সৈলরাকাব থেকে শিসের আওয়াজ এল। তারপর সব চুপ।

পাহাড়ের দক্ষিণে। গায়ে বিরাট ফাটল। সেই ফাটলে দাঁড়িয়ে বিরসা দেখতে লাগল, এগোচ্ছে ওরা, এগোচ্ছে। পুলিশবাহিনী এগিয়ে এসে পাহাড় ঘিরে ফেলেছে। পালাবার পথ বন্ধ করছে।

—'কি বুঝ?' ধানী জিগ্যেস করল।

—'আসল দল রুখা খাড়ায়ে গিয়াছে। পুলিশরে ঘিরা করতে সময় দেয়।'

—'আগালে বলবে।'

—'এখন আগায়। কোনোদিকে উঁঠার পথ নাই। ওই কমিশনার পশ্চিমে তিরিলকুটি-বরুতে উঠে গুলি ছুঁড়বে।'

—'মাঝে নালা আছে।'

—'ওদের বন্দুক আছে।'

—'এর আগে ওরা গুলি ছুঁড়াছে ক—ত। তোমার নামে সে-গুলি জল হয়া গিয়াছে। কে—উ মরে নাই।'

—'এখন আমি নিজে হাজির আছি। ডোন্‌কা কোথা?'

—' ডোন্‌কা গুটুহাটুর হাথিরাম, হরি, সামনে।'

—'বরতোলীর বিরসাইতরা?'

—'সবাই পুবে আছে।'

—'জিউরির মুণ্ডানীরা কোথা?'

—'হেথা।'

জিউরির বঙ্কান মুণ্ডা, মনঝিয়া মুণ্ডা, দুডাং মুণ্ডার বউরা বলল, 'হেথা!' ওদের কাজ পাথর গড়িয়ে ফেলা। ওদের কেউ নিরস্ত করতে পারেনি। 'হা তোমাদের কোলে ছেলা আছে।' এ-কথা বলেও ওদের কেউ নিরস্ত করতে পারেনি।

'মোরা বিরসাইত হয়াছি শুধা ছেলে দেখব বলে? ভগবান সঙ্গে রবে, মরলে মোরা স্বর্গে যাব।'

বিরসা কপাল ও চোখ মুছল। শরীরে রক্তের কানায়-কানায় চঞ্চলতা। ২৫শে ডিসেম্বর থেকে সৈলরাকাবে বিরসাইতরা আসছে আর আসছে, গুহায়-গুহায় ঢুকে যাচ্ছে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে। পাহাড় ঘিরে মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট বুরুজ গড়তে হয়েছে পাথর টেনে এনে। বুরুজের পেছনে ভারী পাথর জড়ো করা হয়েছে। বলোয়া-তীর-ধনুক-গুলতি। স—ব করতে হয়েছে।

বিরসা জানে বন্দুক কি ক্ষমতা ধরে। কিন্তু সে তো ভগবান! তার কথাতেই মুণ্ডারা মরতে অথবা জিততে এসেছে। তারা জানে বিরসা ওদের কুচিলা-তীরকে জিতেয়ে দিয়ে শত্রুর গুলি ব্যর্থ করে দেবে। কিন্তু বিরসা জানে, কুচিলা-তীরের চেয়ে বন্দুকের গুলির ক্ষমতা অনেক বেশি! কিন্তু বিরসা এও জানে, শুধু উন্নত হাতিয়ার নিয়ে সব যুদ্ধে জেতা যায় না। বিরসা জানে, হারজিত সফলতা ব্যর্থতা দিয়ে সব যুদ্ধের বিচার করা যায় না। সাঁওতালরা জেতেনি, হলে, কোলরা জেতেনি সাতান্ন বছর আগে। সর্দাররা জেতে নি। খেরোয়াররা জেতে নি। সব সময়ে সাহেবরা জিতেছে। সব সময়ে, সব যুদ্ধে।

সাহেবরা জেতেনি, সব সময়ে, সব যুদ্ধে।

সাঁওতাল-কোল খেরোয়ার-সর্দাররা জিতেছে, কেননা প্রতিটি পরাজয় প্রমাণ করে দিয়েছে বিজেতার নাম রেকর্ডে থাকে, বিজিতের নাম মানুষের রক্তে-বঞ্চনায়-খিদেয়-

-দারিদ্র্যে-শোষণে ধান চারার মত বোনা থাকে, সে নাম বেঁচে থাকে কালো মানুষের গানে-গানে, স্মৃতিতে, ঘাটোর বিস্বাদে, উলঙ্গ মুণ্ডা শিশুর বিবর্ণ চামড়ায়, মুণ্ডা-জননীর স্ফীত উদর ও মহাজনের ধান-বস্তা একসঙ্গে বইবার পরিশ্রমে···

বীরসা চোখ মুছল। চোখে আলোর বিন্দু নাচছে—বেয়নেটের ফলায় সূর্য চমকাচ্ছে। কে ওকে বলল, 'তুজন সাহেব আগায় কেন ?'

বীরসা পাশ ফিরে দেখল, সুনারা—সেই কিশোর ছেলেটি। ওর ঠোঁট সাদা। চোখে বিস্ময়।

ছেলেটা মুরগী কাটতে দেখলে ভয় পেত। ওকে দিয়ে একটা সেবকপাট্টা লিখিয়ে নিয়েছিল এক দিকু। সেই দিকু ওর মহাজন। ওর ইহজীবন, পরজীবনের মালিক। মুণ্ডাকে দিয়ে সেবকপাট্টা লেখানো বড় সোজা। বুড়ো আঙুলে টিপছাপ দিলেই সে মহাজন বা জমিদার বা জোতদারের দাস হয়ে গেল। দাসব্যবসায় চলে না, বলে লাভ নেই। কোর্টে কোনো মুণ্ডা কেস করতে যাবে না। কেন না পাট্টার মালিক সব অস্বীকার করবে। মুণ্ডারা জানে, দিকুর থাবা বাঘের থাবার চেয়েও ভয়ঙ্কর। সে থাবা মুণ্ডার ইহকাল-পরকালের ওপর উদ্যত।

এ ছেলেটা সেইসব তুচ্ছ করে এসেছে। সৈলরাকাব পাহাড়ে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে, বীরসার দিকে চেয়ে বলছে, 'তুন সাহেব আগায় কেন !'

বীরসা জানাল, সে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। সে ঈশ্বর। এখন, এক অণুমুহূর্তে ওর মনে হল—আমি ভগবান হে! মিশনে জেনাছি যিশু একখান রুটি হতে অগণন মানুষরে খাওয়াছিল, আনন্দ পাঁড়ে শিখায়েছে প্রহ্লাদের ভক্তিতে থাম ফেটে নরসিং হয়ে বিষ্ণু বার হয়াছিল। হা দেখ, আমি তাদের তুল্য হে, আমি ভগবান। লেংটাপারা, দাসের দাস, হতদরিদ্র মুণ্ডাদের হাতে বাঁশের ধনুক, কুচিলা তীর দিয়া আমি আধাজগতের মালিকের সৈন্যের সামনে দাঁড় করায়েছি। ভয় মুছা দিয়াছি ওদের মন হতে। হা, আমি ভগবান হে। আমি ভগবান····

…মুণ্ডাটা হে আমি! মিশনে শিখাল ইংরাজীর মত ভাষা নাই, সে ভাষায় হাজার-লক্ষ শব্দ। দিকুদের ভাষায় হাজার-লক্ষ শব্দ! আমার মুণ্ডারীতে অত শব্দ নাই হে! লিখবার অক্ষর নাই! যত শব্দ দেখ, সব মোদের আঁত ছিঁড়া, রক্তে ভিজায়ে সির্জানো! মোরা লিখি না, গান নির্জাই! লিখার অক্ষর যার নাই, সে নাকি বর্বর, অসভ্যটা। তেমন বর্বর-অসভ্য মুণ্ডারে আমি সাহেবদের সামনে দাঁড় করায়েছি গুলতি-নুড়ি হাতে। আমি ভগবান…

ভগবান হে আমি! যারা ওই গুড়ি মেরে আগায়, তাদের দেশে, হেথা মুণ্ডা দেশে তাদের ঘরে কত গালিচা-পাখা-খাট-বিছানা-কোচ-কেদারা—কাচের বাতি-- রুপোর থালা -- মদের বোতল-গাড়ি-জুড়ি-ঘোড়া-চাকর শতে-শতে। আমার মুণ্ডা ঘরে কিছু নাই, কিছু থাকে না! আকাল আসে, সকল জ্বলে যায় খরায়। মোর বাবা বলাছে, রেকডে মুণ্ডাদের 'চোর-বদমাস' ভিন্ন অন্য নামে লিখা নাই। মুণ্ডাদের প্রাণ মন নাই, তারা ঘর পুড়লে আগুন নিবায় না, চলা যায় ঘর ত্যেজে। যখন ঘর পুড়ে মুণ্ডার, তখন কি পুড়ে হে? হেথা মুণ্ডা দেশে মুণ্ডার ঘর বনের কাঠ-পাতা-লতা, ভুঁয়ের পাথর-মাটিতে তৈয়ার। সে ঘরে থাকে ঘাসে বুনা চাটি, মাটির হাঁড়ি, আর কি থাকে হে? যারা গুড়ি মেরে আগায়, আসল বড় দুশমন, দিকুগুলা ওদের নখের শামিল, মুণ্ডাদের রক্তে এ-কথা ঢুকায়ে দিয়াছি, আমি ভগবান হে! ভগবান!

বীরসা মুখ ফেরাল। সুনারার মাথায় হাত রাখল। বলল, 'ওরা কমিশনার, ডি. সি.। কথা বলবে।'

—'কেন?'

বীরসা হাসল। বলল, 'ওরা সাহেব যে! গয়াকে ধরা দিতে বলাছে, মোকেও বলাবে! এ ওদের আশ্চর্য নিয়ম। আগে দুটা কথা বলে দোষ খন্ডায়ে নিবে।'

-- 'তা বাদে?'

--'গুলি ছুঁড়বে। ছুঁড়বে, মোদের মারবে। কিন্তু রেকডে লিখাবে আগে মোরা ধর্মমতে মুণ্ডাদের ধরা দিতে বলাছিলাম। ধরা দেয় নাই, তাই গুলি করাছি।'

--'ধরা দিলে গুলি করবে না?'

--'করবে। তখন বলবে মোরা বলতে মুণ্ডারা রুখে তেড়ে এসাছিল, তাই গুলি করাছি। তখন সেই কথা রেকডে লিখাবে।'

--'ওটা কে?'

-- 'দুভাষী। সাহেবরা মুণ্ডারী জানে না।'

-- 'জানে না? দিকু বলে, সাহেব সকল জানে?'

-- 'না রে! মুণ্ডারী জানে না। মুণ্ডাদের বিচার করে। দুভাষী যা বুঝায়, তাই বুঝে।'

স্ট্রাটফিল্ড দাঁড়ালেন। হাত তুললেন। এখন ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন উনি, চোখে আলোর বিন্দু নাচছে। ওদের বলোয়ার ফলায় সূর্য জ্বলছে। ওরা হাত তুলে বলোয়া উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে। দুভাষীকে ইশারা করলেন, কি বলবেন। দুভাষী ওঁর হয়ে কথা বলতে লাগল।

-- 'তোমরা ধরা দাও, হাতিয়ার দিয়া দাও।'

বীরসাইতরা বলোয়া সূর্যের দিকে তুলল, চেঁচিয়ে বল, হাতিয়ার রেখে তোমরা চলে যাও হে!'

-- 'যারা সর্দার হয়াছ এ লড়াইয়ে, এস। কথা বল!'

-- 'মরা সক—ল মুণ্ডা এ লড়াইয়ে সর্দার!'

-- 'বীরসাকে আমাদের হাতে দাও।'

এবার নরসিংহ মুণ্ডা এগিয়ে এল, 'রাজটা কাদের? সাহেবদের?
মোদের রাজ! মোরা তাদের দেশে গিয়াছি রাজ করতে, ন তারা এসাছে হেথা? তবে হাতিয়ারটা কে দিবে? মোরা? সাহেবরা হাতিয়ার নামায়ে রেখে চলা যাও। মোরা হাতিয়ার দিব বলে হেথা এসাছি? রাজ নিব বলে এসাছি।'

কথা বলার আর কিছু ছিল না। কিছুই না। ফর্ব্স বললেন, 'পাহাড় ঘিরে ফেলেছি। এখন উত্তরদিক থেকে চড়াও হলে বিদ্রোহীরা ভয়ে নিরস্ত হতে পারে। তাহলে গুলি করার

দরকার হয় না, কিন্তু ক্যাপটেন রোশ্ বললেন, 'অত কাছে গেলে সিপাহীদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। পশ্চিমে তিরিলকুটি-বুরু থেকে গুলি ছোঁড়া যাক।'

তখনি তিনবার গুলি ছোঁড়া হল। কারো গায়ে লাগল না। মুণ্ডারা চেঁচিয়ে বলল, 'ভগবান! দুশ্মনের বন্দুক কাঠ করে দিয়াছ তুমি। গুলি জল হয়ে গিয়াছে। হা দেখ, সকল গুলি মিছা গেল। কেও পড়ে নাই, মরে নাই।'

কিন্তু মিলিটারি রেজিমেন্টের হাতে রাইফেল থাকলে কিছুক্ষণ হাত রাইফেল চালায়, তারপর রাইফেল হাত চালায়। হাতকে বাধ্য করে গুলির পর গুলি চেম্বারে ভরতে। আঙুলকে বাধ্য করে ট্রিগার টিপতে—ক্যাপটেন রোশের চোখের প্রশংসা, গলার—'বাক-আপ-বয়েজ!' চীৎকার নিষ্প্রাণ রাইফেলে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। তখন হৃদয় যদি বা বলে মুণ্ডারা প্রায় নিরস্ত্র, বুদ্ধি বলে রাইফেলের কথা শুনলে প্রোমোশন অনিবার্য।

তাই আবার গুলি ছুটে এল। বাতাসে বারুদের গন্ধ এখন। অসম্ভব শুকনো খট্-খট্-খট্ শব্দ। গুটুহাতুর হাথিরাম, বরতোলির সিংরাই পাথরের ওপর ঘুরে পড়ল। বিরসাকে বিরসাইতরা টেনে সরিয়ে নিচ্ছে পেছনে। লাল রক্ত কালো শরীর থেকে বেরিয়ে কালো পাথরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

—'মাংগাল মুণ্ডার হাথিরাম ছাড়াও ছেলা আছে হে!' লেংটি পরে ধনুক তুলে হাথিরামের ভাই হরি এগিয়ে এল। আরেক কিশোর বালক, 'হা তুই কে বটিস?' 'নানক বটি হে। 'বয়স কত?' 'বারো হয়াছে। 'তবে আয়, মুণ্ডা সকল বয়সে মরতে পারে।'...'হা ওরা মরল কেন?'...'পাথরের উপর উঠ, গুলতি উঠা!' 'গুলতির পাথর দূরে চলে না যেন। ওরা মরল কেন?'...'জানি না।'...'মোর কাছে থাক হে, একা মরতে বড় ভয় হয়।'...'কাছে আছি।'

গুলির শব্দ। বারুদের গন্ধ। গুলির শব্দ। বালকটি ধনুকের মতো বেঁকে ছিটকে নিচে পড়ল...হরি পাথরের উপর।

পুলিশ ও সেনাবাহিনী এগোচ্ছে। ফর্বসের গলা, 'স্টপ ফায়ারিং। এখন চারদিক থেকে পাহাড়ে ওঠো। গুলি করবে না, না, অর্ডার না-দেওয়া অবধি কেউ গুলি করবে না। নো মোর কিলিং।'

সঙিন এগিয়ে বন্দুক বাগিয়ে সৈন্য উঠছে, পুলিশ! গৌরী মুণ্ডানীর পিঠে ছেলে, হাতে পাথর। 'মনঝিয়ার মুণ্ডানী কোথা হে! বক্সনের মুণ্ডানী!' এখন গৌরী মুণ্ডানী ওর বাইশ বছরের নিটোল যৌবনের সবটুকু শক্তি ঢেলে দিয়ে দুহাতে মুখ তুলে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'জিউড়ি গাঁয়ের কে আছে হে। আগাও পাশে ফিরল, 'তুমি কে? বুড়াটা?' নামে কি হয় রে, আমি পুরাণক! ধর্ পাথর তুলা দিই হাতে!'

পাথর পড়ছে গড়গড় করে। সঙীন বন্দুক এগোচ্ছে। রেজিমেন্টের চীৎকার, ক্যাপ্টেন সাহাব। অর্ডার কি?' ক্যাপটেন রোশের জবাব, 'বাক্-আপ-বয়েজ!' 'ক্যাপ্টান সাহাব! অর্ডার কি?' ফর্বসের চীৎকার, 'ডোন্ট শুট!' ক্যাপটেন রোশের জবাব, 'ফায়ার!' সিপাহীর চীৎকার, ওরা মেয়েছেলে! পিঠে ছেলে বাঁধা।' কিন্তু রাইফেল বলল 'শুট!' কে বলল,

'ছোট ছেলে কাঁদছে!' কিন্তু রাইফেল বলল, 'শুট! এখন গুলির পর গুলি। এখন সিপাহী পুলিশ, বিরসাইত মেয়ে-পুরুষ একেবারে সামনা-সামনি! ডোন্‌কা মুণ্ডার চীৎকার, 'পলাও হে!' সোমা মুণ্ডার চীৎকার 'মেয়েছেলা। পিঠে ছেলা বান্ধা আছে!' কিন্তু রাইফেল বলল, 'শুট। গুলি-বেয়নেট! বেয়নেট-গুলি! গৌরী বুঝল সঙীনের ফলা ওর ছেলেকে বিঁধে ওর পিঠ দিয়ে ঢুকছে, বুকে গুলি বিঁধতে তবে গৌরী নিশ্চিন্ত হল। তারপর বেয়নেট-গুলি-চীৎকার-আর্তনাদ-উল্লাস বুটের শব্দ—বারুদের গন্ধ—কক্‌নী গালাগালি—'মা-রে!' কোন্ বালক চেঁচাল—আবার গুলি—

অপারেশন সেল্‌রাকাব ওভার। ইয়েস...ওভার! ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার...

পরে, অনেক পরে মুণ্ডারী মেয়েদের হত্যার জন্য ফর্বস্, রোশ্ ও স্ট্রীট্‌ফিল্‌ডকে মৃদু ভর্ৎসনা করা হয়। কিন্তু তিনজনেই বলেন, গুলি না-করার হুকুম ঠিকমতো বোঝা যায়নি। মুণ্ডা পুরুষ ও মেয়েরা লম্বা চুল রাখে, ওদের রং অত্যন্ত কালো, তাই মেয়ে-পুরুষ পার্থক্য করা যায়নি, না, ছোটছেলের কান্না শুনেও পার্থক্য করা যায়নি। কিন্তু সামরিক ও অসামরিক দপ্তর তিনজনকেই নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। প্রত্যেককে সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য প্রশংসা করেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল।

ঠিক এইরকম মতান্তরই দেখা দেয় হতাহতের সংখ্যা নিয়ে। ২০ জানুআরির 'দ্য ইংলিশম্যান' কাগজ বলেন, 'সরকারী মুখপাত্ররা হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে নীরব। গুজব, পনেরো থেকে কুড়িজন নিহত হয়েছে। এই সংখ্যা বেশি হওয়া স্বাভাবিক, যেহেতু মুণ্ডারা জঙ্গলে পালায়, সেখানেও মরে, এই রাতের অন্ধকারে পাহাড় থেকে সঙ্গীদের মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়ে গোপনে সমাধি দেয়।'

২৫শে মার্চ 'দ্য ইংলিশম্যান' কাগজ বলেন, অন্তত চারশো মুণ্ডা নিহত হয়েছে। উপযুক্ত তদন্ত করা হোক।' ব্যারিস্টার জেকব এই সংখ্যা সঠিক বলে মনে করেন।

১৬ই ফেব্রুআরি 'বেঙ্গল পুলিশ ইন্‌টেলিজেন্‌স' লেখেন, সর্দাররা বলছে, সাতশো মুণ্ডা নিহত।

'দ্য স্টেট্‌সম্যান' আবার লেখেন চল্লিশজন নিহত। রেভারেণ্ড হফম্যান বলেন, শুধু কুড়িজন নিহত। তখন সরকারী বিবৃতিতে বলা হয় সৈল্‌রাকাবে দশজন নিহত ও সাতজন আহত হয়। সরকারী বিবৃতির প্রতিবারে জনৈক পাঠক ইংলিশম্যান সম্পাদককে চিঠি লেখেন, 'আমার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়। এমন সব বিশিষ্ট লোক বলেছেন, জঙ্গলে গেলে গোপনে কোথায় মুণ্ডাদের সমাধি দেওয়া হয়েছে, তা দেখাবেন। বিষয়টি একান্ত জরুরী। এখনি এর বিশদ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।' 'জনৈক পাঠক'-এর চিঠিটি বেরোয় ১৯০০ সালের ১৭ এপ্রিল। তারপর জানা যায়, সরকারী বিবৃতিই চূড়ান্ত। এ-প্রসঙ্গে আর কোনো চিঠি কোনো কাগজে প্রকাশ করা হবে না।

সন্ধ্যার মধ্যে সিপাহীরা ফিরে গিয়েছিল। পুলিশ সৈল্‌রাকাব পাহারা দিচ্ছিল। সন্ধ্যা অবধি ওরা সৈল্‌রাকাবের গুহা থেকে মেয়ে, শিশু, অস্ত্র, ধান, চিনাদানা, ঘাসের চাট্টি, মাটির হাঁড়ি টেনে বের করেছিল। সন্ধ্যা অবধি বন্দী বিরসাইতরা কাঠ কেটে ডুলি তৈরি

করেছিল। সন্ধ্যার মধ্যে ডুলিতে বয়ে আহতদের নিয়ে যাওয়ার কাজও হয়ে গেল।

তারপর অন্ধকার নামল, শীতের রাত। তারপর বাতাস বইতে শুরু করল। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, জঙ্গলের গাছের পাতায় বৃষ্টি, মৃদু শ্বাস, জঙ্গল নিঃশ্বাস ফেলল।

জঙ্গলের গভীরে, অন্ধকারে মাটি থেকে মুখ তুলে নরসিং মুণ্ডা বলল, 'কে মাটি খুদে রে গোমি?'

—'আমাদের লড়াকারা খুঁদে রে দাদা।'

—'কেন?'

—'যারা হেথা মরাছে, গোর গাড়বে।'

—'মোরেও হেথা গোর পাড়িস।'

—'জানুমপিরিতে নিব না?'

—'না। যেথা বিরসাইতের গোর সেথা রাখিস। মোরে টেনে এনাছিলি তুই? না আর কে?'

—'টেনে এনাছি আমি। এখনো আনতাছে ওরা। সৈল্‌রাকাব হতে জঙ্গল অবধি কতজনা পড়ে আছে! অগণন।'

—'কে—ও যেন জানে না কোথা গোর গাড়েছিস রে গোমি। গোরার রাগ বিস্তর। যার লাহাশ দেখবে তার গ্রাম জ্বালিয়ে দিবে, পরিবার উৎখাত করা দিবে।'

—'কেও জানবে না।'

—'তোরা?'

—'পলাব।'

—'পলাস।' মোরে মুখে হাত চাপা দে।'

—'কেন। দাদা?'

—'ভিতর হতে গোঙানি উঠে রে, গোমি রাতে অনে—ক দূর আওয়াজ যাবে। গোরা শুনবে।'

—'দেই।'

নরসিং মুণ্ডার মুখে হাত চাপা দিল, ডান হাত। নিজের রক্তাক্ত বাঁ-হাত নিজের মুখে চাপা দিল। ওর বুকের ভেতর থেকেও হাহাকার উঠে আসছে...

মাটি খোঁড়ার, লাশ টানার শব্দ। পাতার বৃষ্টির মর্মর। গোমির হাত সরিয়ে নিয়ে নরসিং বলল, হেথা জঙ্গল গজায়ে যাবে, কোনো চিহ্ন রবে না। গাছ দেখে মুণ্ডা জানবে হেথা কাদের লাহাশ আছে?'

১১ই জানুয়ারি ফর্বস্ খুন্‌টিতে মুণ্ডাদের, মান্‌কিদের ডাকলেন। কথা বল্‌লেন।

স্ট্রীট্‌ফিল্‌ড বললেন, 'রেভারেন্ড হফ্‌ম্যান যা বলবেন, আমারও সেই মত। রেভারেন্ড হফ্‌ম্যান মুণ্ডারী জানেন। মুণ্ডাদের জানেন। উনি মিশনের লোক। ওঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার, মন করুণাপূর্ণ'।

হফ্‌ম্যান বললেন, 'ওদের দয়া দেখালে বালিতে বীজ ছেটানো হবে। বিরসার ভক্ত পুরুষদের কথা কি বলছেন? ওদের মেয়েরা কি এককাট্টা তো জানেন? না, কড়া শাস্তি দিন।'

—'কি শাস্তি?'

—'বিরসাইতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন। মেয়েরা গ্রামবন্দী থাকুক। যাদের ধরতে পারবেন মেরে ফেলুন। প্রথম দলটা যদি মারা পড়ে, নাইস দৃষ্টান্ত হবে।'

—'নাইস!'

যতক্ষণ না প্রত্যেকটি সশস্ত্র বিরসাইতকে ধরা হচ্ছে, ততক্ষণ অন্য বিরসাইতদের বন্দী করে রাখুন। মান্‌কিরা মুচলেখা লিখে দিক বিরসাকে, তার দলকে, এখন বা ভবিষ্যতে আশ্রয় দেবে না।'

—'ডি. সি.-র ও সেই মত?'

—'হ্যাঁ।'

—'চমৎকার! একজন মিশনারী, আরেকজন ডি. সি.। উপযুক্ত প্রস্তাব বটে। শুনুন, নির্বিচারে অত্যাচার চালানো হবে না, কেননা তাহলে বিরসাইতদের আবার বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেওয়া হবে। আইনভঙ্গ করবার সকল চেষ্টাতে অবশ্যই বাধা দেওয়া হবে। তবে, বিরসা-প্রচারিত ধর্মের ওপর সরকারের কোনো আক্রোশ নেই। এখন কাজ হবে নতুন নীতিতে।'

—'যথা'—

ফর্বস্ একটি কাগজ এগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা আছে ঃ

'বিক্ষোভকারীদের দল, দরকার হলে বলপ্রয়োগে ভেঙে দেওয়া হবে। যারা দাঙ্গা বা অন্য দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে, তাদের বন্দী করে শাস্তি দেওয়া হবে।

'হত্যা, হত্যার চেষ্টা ও অন্য পুলিশগ্রাহ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা হবে।

'বর্তমান ঘটনার সময়ে স্ব-গ্রামে অনুপস্থিত ছিল বলে যে বিরসাইতদের বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাবে, তাদের কাছে উল্লিখিত অনুপস্থিতির জন্য সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তলব করা হবে। "কেন তারা শান্তিপূর্ণ আচরণ করবার জন্য জামিন দেবে না।" সেজন্য তাদের কারণ, প্রদর্শন করতে হবে।

'যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন, বাড়তি পুলিশ রাখতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে।'

হফ্‌ম্যান বললেন, 'এ তো আরও পাকা ব্যবস্থা।'

ফর্বস্ বললেন, 'নিশ্চয়। আপনারা যা চেয়েছেন তার চেয়েও বেশি শাস্তিই দেওয়া হল, শুধু গুলি করে মেরে ফেলাটা করা যাবে না।'

—'পুলিশ যদি গ্রামে ঘুরতেই থাকে তবে তো স্লো ডেথ।'

—নিশ্চয়। পুলিশ থাকা মানে কি! পুলিশ থাকবে, আর্মি থাকবে, তারা খাবে, তাদের ঘোড়া ঘাস খাবে, তাদের জল-কাঠ-খাবার লাগবে। মুণ্ডাদের পক্ষে তা' তিলে-তিলে মৃত্যু

বইকি!'

—'বিদ্রোহীদের ধরার আগে থানা ও মিশন পাহারার ব্যবস্থা?'

—'সব হয়ে গেছে।'

ফর্বস্ হাসলেন। বিরসা! বিরসা দাউদ! বিরসা ভগবান! বিরসা তাঁর জীবনে ভগবান হয়েছে বইকি? ছোটনাগপুরের মতো একটা হতভাগ্য জায়গার কমিশনার হয়ে আসার পর এমন সৌভাগ্য হবে কে ভেবেছিল? রাজদ্রোহিতা দমনের সুযোগ পাওয়া কি একটা সোজা কথা?

বললেন, 'রাঁচি ও সিংভূমের সমস্ত উপদ্রুত অঞ্চলে প্রতি থানায়, প্রতি গ্রামে, প্রতি মিশনে রাইফেলধারী পুলিশ, মিলিটারি থাকছে। দুমকা ও অন্যত্র থেকে মিলিটারি, পুলিস আসছে। ব্যাপারটা কি দরের দাঁড়াচ্ছে বুঝলেন?'

—'বিশাল ব্যাপার।'

ফর্বস্ আবার হাসলেন। বিরসা! বিরসা দাউদ! বিরসা ভগবান!

বললেন, 'ডি. সি.। নেভার ইগনোর দ্য ব্রিটিশ ল। ব্রিটিশ আইনকে কখনো তুচ্ছ ক'র না। আইনের প্যাঁচে ফেললে মুণ্ডাদের যে শাস্তি হবে, অন্য কোনো প্যাঁচেই তা হবে না। প্রথম সুবিধে হল, জজ মুণ্ডারী বোঝে না। দ্বিতীয় সুবিধে হল, মুণ্ডারা আইন-ইংরিজী বোঝে না। তৃতীয় সুবিধে হল, গ্রেপ্তার করে ওদের জেলে রেখে দাও। কেস দাঁড় করবার জন্যে তদন্ত চলতে থাকুক। মাসের পর মাস জেলে মুণ্ডাদের শিরদাঁড়া আপনি ভাঙবে।'

ফর্বস্ হাসলেন। মনের চোখে দেখতে পেলেন, রাজদ্রোহিতা দমনের জন্যে পুরস্কার পাচ্ছেন। না, মিউটিনির সুদিন আর আসবে না। তখন এদিকে প্রোমোশন হয়েছিল, ওদিকে রাজা-জমিদারের বাড়ি লুটে সাহেবরা রাজা হয়ে গিয়েছিল। মুণ্ডাদের বাড়ি লুটে রাজা হওয়া যাবে না। কিন্তু প্রোমোশন তো হবেই। প্রমোশন হবেই। ফর্বস্ বোর্ড অব রেভিনিউর মেম্বার হবেন, কে আটকায়!

—'একটা নোটিশ দিলে হত?'

—ডি. সি. সব ব্যবস্থা করেছি। নোটিশটা পড়ুন। এটা প্রতি গ্রাম-মান্‌কি, হাটসরকার ও অন্যত্র যাবে। সিরগুজা, উদ্দপুর, যাশপুর, রামগড় বানাই, এইসব নেটিভ স্টেটে যাবে। সেরাইকেলা ও পোরাহাটের রাজারা সিপাই পাঠাবেন, নিজেরা বিরসার তল্লাশ করবেন। নোটিশটা হচ্ছে সরকারী অর্ডারের হিন্দী ও মুণ্ডারী অনুবাদ। জোরে পড়ুন।'

স্ট্রীট্‌ফিল্‌ড পড়তে লাগলেন, 'বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ থাকে যে বিরসাইতদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যায়ের জন্য সরকার বাহাদুর বিরসা ও তাহার মুখ্য অনুচরদের জরুরী গ্রেপ্তার পরোয়ানা জাহির করিয়াছেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বন্দগাঁও, খুন্‌টি, সিংভূম ও রাঁচির অন্যত্র সরকারী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। তোমাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে, এ-বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদিগকে তুমি সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। বিরসা ও তাহার প্রধান গুরুরা যদি তোমার গ্রামের নিকট আসে, অথবা নিকটস্থ জঙ্গলে লুকায়, তৎক্ষণাৎ তুমি রাঁচি বা সিংভূমের ডি. সি.-কে অথবা সিপাহী/পুলিশের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীকে সংবাদ দিবে, এবং তুমি ও তোমার গ্রামবাসীরা যখনি দরকার, তখনি বিরসা ও তাহার অনুচরদের

তল্লাশ ও গ্রেপ্তার করিবার জন্য সরকারী কর্মচারীর সহিত যাইবে। যদি উক্ত কর্তব্যে অবহেলা কর, তবে তুমি দায়িক হইবে ও তোমার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তোমার গ্রামসমূহে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হইবে; তুমিসহ গ্রামবাসিগণ পুলিশের ব্যয় বহনে বাধ্য থাকিবে। যদি তুমি ও তোমার গ্রামবাসিগণ সক্ষম হয়, তবে বিরসাকে নিজেরা গ্রেপ্তার করিবে ও বন্দী অবস্থায় তাহাকে ডি. সি.'র নিকট লইয়া যাইবে।

'কোনো ব্যক্তি বিরসা অথবা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের যেকোনো জনকে গ্রেপ্তার করিলে, অথবা গ্রেপ্তারীর সহায়ক কোনো সংবাদ দিলে নিম্নে উদ্ধৃত হারে পুরস্কার পাইবে ঃ

বিরসার গ্রেপ্তারের জন্য	৫০০ টাকা
ডোন্‌কা মুণ্ডা ঃ	
গ্রাম বোর্তোদি ঃ থানা খুন্‌টি	১০০ টাকা
মাঝিয়া মুণ্ডা ঃ	
গ্রাম সেরাংদি ঃ থানা তামার	১০০ টাকা
বুধু মুণ্ডা ঃ গ্রাম সিতিদি	১০০ টাকা
পরান পাহান্‌ ঃ গ্রাম কাটিংকেল	১০০ টাকা
১২-১-১৯০০	স্বাঃ এ-ফর্বস্‌
	ছোটনাগপুরের কমিশনার।'

স্ট্রীট্‌ফিল্‌ড নোটিশটি ফিরিয়ে দিলেন ফর্বসের হাতে। ফর্বস্‌ বলেছেন, 'সিংভূমের কমিশনার ও ডি. সি. ;সিক্‌স্‌থ্‌ বেঙ্গল ইনফ্যানট্রির একটি কোম্পানী নিয়ে ক্যাপটেন রোশ্‌, বন্দ্‌গাঁও ও সিংভূমের অন্যত্র ঘুরবেন। ডি. সি. তুমি ও কর্নেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড পুবদিকে খুন্‌টি ও তামার থানাভুক্ত এলাকায় ঘুরবে। অ্যাসিস্‌ট্যান্‌ট এস. পি. স্টিভেন্‌স ও লেফটেন্যান্‌ট মিড্‌লম্যান তোরপা ও বাসিয়া থানাভুক্ত এলাকায় ঘুরবে। প্রত্যেকটি বিরসাইত গ্রাম তন্ন-তন্ন করে তল্লাশী করা হবে। মিলিটারি ফৌজ আহত ও অন্য বিরসাইতদের ধরবে। ফেরারী বিরসাইতদের ধান-ডাল-বাজরা ও অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। বিদ্রোহীরা যেন একদানা খাবার না পায়। প্রদেশ-সরকারের ইচ্ছে মুণ্ডাদেশে সরকারী-ক্ষমতা বেশ খানিকটা জাহির করা হোক। বিরসা ও তার প্রধান চেলাদের ধরার ব্যাপারে কোনোমতে ঢিলে দেওয়া চলবে না।'

স্ট্রীট্‌ফিল্‌ড মৃদু দুর্বোধ্য হাসলেন।

—'ডি. সি. কি মনে করেন, অপারেশন ফেল করবে?'

—'না' তা মনে করি না।'

—'তবে?'

—'কিছু না।'

বিরসাকে দেখলে ডি. সি. গ্রেপ্তার করবেন, গ্রেপ্তারীতে বাধা দিলে গুলি করবেন। ফর্বসের চেয়েও নির্মম হবেন ডি. সি. মুণ্ডাদের ওপর। আবার, সেইসঙ্গে ডি. সি. এও জানেন, বিরসাকে ধরা না গেলে বোধহয় তিনি অখুশি হবেন না। হাজার হলেও

অপারেশন-বিরসা থেকে লাভবান হবেন ফর্বস্, তিনি নন।

সব কিছুই হল। ইস্তাহার পড়া হল ঢোল বাজিয়ে, লটকে দেওয়া হল সর্বত্র। মিলিটারী পুলিশ ইংরেজ অফিসাররা, দেশীয় রাজারা সবাই চষে ফেলতে লাগলেন শত-শত গ্রাম। বিরসাইতদের গ্রাম লুটে ধানের শেষ কণা নিয়ে যাওয়া হল, উপোস করতে লাগল বিরসাইতরা। বহুজন ধরা পড়ল, বহুজনকে নির্মমভাবে মারা হল, কিন্তু বিরসাকে পাওয়া গেল না। জিউরি গ্রামের বৃদ্ধ, অন্ধ মান্‌কি বলল, 'বিরসার উপর নজর রাখতে আমি টাকা পাই? তোমরা পাও, তোমরা ধর।' তখন ওর পিঠে মেরে চামড়াতে লোহা বসানো চাবুক বউনি করা হল। কলকাতার বড় দোকানে তৈরি করানো স্পেশাল চাবুক। নীলকর সাহেবরা এর নাম দিয়েছিল 'শ্যামচাঁদ'। চল্লিশ বছর বাদে দোকানটিতে শ্যামচাঁদের অর্ডার গেল।

বুড়ো মান্‌কি চাবুক খেতে-খেতে বলল, 'জঙ্গল তারে লুকায়ে রেখেছে, তোরা জঙ্গল হতে বড়?'

বিরসাকে পাওয়া গেল না। অপারেশন-বিরসা চলতে লাগল। ফর্ব্‌স বললেন, 'চলছে, চলবে, আরও চলবে।'

সৈল্‌রাকাব থেকে বোর্তোদি, বোর্তোদি থেকে আয়ুভাতু, আয়ুভাতু থেকে মারাংহাড়া, ঘুরছিল বিরসা। সঙ্গে ডোন্‌কা, সুনারা অন্যরা। দিনে থাকছিল জঙ্গলে, জঙ্গলের গহীনে। গাছের মগডালে বসে নজর রাখছিল কোনো নানক। আস্তে শিস দিচ্ছিল, গ্রাম থেকে যারা গরু চরাতে এসেছিল তারা চোখ তুলে ওপরপানে না চেয়ে শিস দিয়ে সংকেত জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। দিনেরাতে গ্রামে পুলিশ পাহারা। রাতের আঁধারে মেয়েরা 'বাইরে যেছি গো,' বলে বেরিয়ে আসছিল তিনজন। 'হয়া গেছ্য গো' বলে ফিরে যাচ্ছিল দুজন। বাকি একজন, কখনো বালিকা, কখনও যুবতী, কখনো বৃদ্ধা, সাদা কাপড় খুলে বিবস্ত্র হয়ে কালো শরীর আঁধারের কালোয় সমর্পণ করে জঙ্গলে এসে খাবার ও জল রেখে চলে যাচ্ছিল, 'হেতা হতে উ গ্রামে ভয় কম। পুলিস এখনো পৌঁছায় নাই। হোতা দিয়া হাতির পাল গিয়াছে, তাই সিপাইরা ডরে মরে। পরশু যাবে।'

ওরা ঠিকই চলে যাচ্ছিল। বিরসাও যেত, উনিশ দিন ধরে ওরা পুলিশ ও মিলিটারির চোখে ধোঁকা দিয়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু সুনারাকে বিরসা কাঁধে ফেলে হাঁটছিল বলে উনিশ দিনের দিন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে পারল না। তিলাড়ুবুর জঙ্গলে থেকে গেল। সুনারা বলল, 'আমি আর যাব না, ভগবান। মোরে রেখে চলে যাও। বুকের পাথর বাজল সৈল্‌রাকাবে, আজ কতদিন মোরে টেনে লয়ে চলছ, মোর মনে জেনেছি আর বাঁচব না হে।'

বিরসার অস্বস্তি হল। জঙ্গল এখানে তেমন নিবিড় নয়। তাছাড়া জঙ্গলটা বড়-বড় দুটো হাটের যাওয়া-আসার পথে পড়ে। সুনারাকে টেনে নিয়ে চলা সত্যিই কষ্টকর। সুনারাকে বলল, 'এ পাথরটায় শুয়ে থাক্। আমি শুনি তিলাড়ুবু হতে মুরুমুণ্ডা কি বলে, খবর দিয়াছে আসবে!'

—'হেথা এলাম কেন? এ জঙ্গল পাতলা।'

—'মুরু তোরে ঔষধ এনে দিবে।'

—'ঔষধে কি হবে? তুমি হেথা এস।'

—'এই তো আমি।'

—'ভগবান!' সুনারা বিবর্ণ ঠোঁটে যন্ত্রণা চেপে হাসল, 'মনে পড়ে সে—ই বন্দ্গাঁওতে আমি তোমারে গান শুনায়েছিলাম?'

—'ভাল হ সুনারা। আমি তোরে সে-গান শুনাব, এখন আমি ভাল শিখে নিয়াছি।'

বিরসা নিচু গলায় বলল, উঠে এস। ডোন্কা ও মাঝিয়া মাথায় হাত রেখে বসে আছে, সামনে সালী, পরমী।

—'তোমরা।'

—'মুরু আসবে না হে, তারে ধরে নিয়াছে ভোরে। মান্‌কির ভাই তারে ধরায়ে দিল ভগবান!'

পরমীর দিকে তাকাতে কষ্ট হল বিরসার। বিরসা পরমীর বাবার অনুরোধে কবে যেন বলেছিল ওকে আরান্দি করবে কিন্তু পরমীর মন অনেকদিন ধরে বাঁধা ছিল বিরসাইত কনু, রোগোতার কনুমুণ্ডার কাছে। কনু সৈল্‌রাকাবের যুদ্ধে মরে গেল।

ডোন্কা বলল, 'পরিবা কোথা?'

—'মার কাছে।'

—'খবর কি? বিরসা বলল।

সালী বলল, 'তোমার ধর্মে যার বিশ্বাস, সকল মান্‌কির পাট্টা কেড়ে নিয়াছে সরকার, নূতন মান্‌কিরে মুচলেখা লিখায়ে পাট্টা দিতাছে। গুইপাই, রোগোতো, কোটাগারা সঙ্করা, বারোটা গ্রামের মান্‌কির পাট্টা চলা গিছে। যে তোমাদের ধরায়ে দিবে, সে নূতন পাট্টা পাবে, মান্‌কি হবে।'

—'আরও বল্।' ডোন্কা বলল।

—'সক—ল ধান, যব, ডাল, লবণ আমার ঘর হতে, সবার ঘর হতে নিয়া গিয়াছে। শুনলাম, এমন দেড়শত গ্রাম হতে নিয়াছে মুণ্ডাদের উপাসে শুকাবে, আর—'

—'কি?'

—'কোড়া মেরে জাহান বের করে দিতাছে। আর—'

—'যেমন তোমাদের পায় নাই তেমন কোড়া মেরে ধান-চাল কেড়ে, জেহেলবন্দী করে ঘরে-ঘরে কান্না তুলে দিয়াছে। আর মেয়েছেলাদের ইজ্জত—' সালীর গলা বন্ধ হয়ে এল।

খানিক পর সালী চোখ তুলে বলল, 'বোর্তোদিতে মোর মুণ্ডার জন্য সেরাংদিতে মাঝিয়ার জন্য সকল ঘর পোরাহাটের রাজার হাতি দিয়া ভেঙে দিয়াছে। মোরা আর যাব না হে! গেলে ইজ্জত রবে না।'

বিরসা ডোন্কা ও মাঝিয়ার দিকে তাকাল। ওর চোখে বেদনা, প্রশ্ন, দুঃখ, লজ্জা। ডোন্কা ও মাঝিয়া এ-ওর দিকে তাকাল। ডোন্কা বলল 'যত মুণ্ডা ধরা পড়েছে, তার অধিক পলায়ে আছে। তুমি বাহিরে থাকলে উলগুলানের কাজ হবে। মোরা ধরা দিলে

গ্রাম বাঁচে, মুণ্ডা বাঁচে।'

—'আমি একা?'

ডোন্‌কা হাতের কাঠটা মাটিতে ফেলল। বলল, 'মোরা এ-কাঠটার মতো ছিলাম হে ভগবান, তুমি মোদের আগে প্রচারক, পরে লড়কা বানায়েছ। মোরা ধরা দিলে কোনো ক্ষতি নাই।'

সালীকে বলল, 'তোরে ভগবানের হাতে থুয়া গেলাম।'

ডোন্‌কা ও মাঝিয়া সুগানাকে কাঁধে নিয়ে সেদিন রাতে তিলাডুবুর জঙ্গল ছেড়ে চলে গেল। রাতভোর হেঁটে সেখান থেকে ন-মাইল দূরে তোরপা-আউটপোস্টে গিয়া ধরা দিল। বলল, 'বিরসা হোই তুরাবু জঙ্গলে লুকায়ে আছে। তুরাবু তিলাডুবুর উলটো দিকে, বাইশ মাইল উত্তরে, যমকোপাই অঞ্চলে।

যমকোপাই ও কাছাকাছি গ্রাম ঠেঙাতে পোরাহাটের রাজকুমার, কমিশনার ডি. সি. টমসন বক্‌সওয়েল, পুলিশ, মিলিটারি ও এক হাজার গ্রামবাসী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ডোন্‌কা বলল, 'মোদের ধরা দিতে বলাছে মানী পহানী, বোর্তোদির মানি পহানী। বলাছে, ধরা না দিলে ধরায়ে দিবে। তারে কিছু দিও হে, সবারে যেমন টাকা দিতাছ।'

মানী পহানীকে ডাকা হল। সে কোনো কথা না বলে কুড়ি টাকা নিল। ডোন্‌কা বলল, 'সেন্‌ত্রাতে তোর দাদার কাছে যেয়ে থাক্‌গা। বিরসাইত ধরায়েছিস, বোর্তোদিতে থাকলে মানুষ থুথু দিবে।'

—'কেন! তোর ভগবান কোথা? ধরতি-আবা?'

মানী চলে গেল।

২০

সরকারের খাতায় যে-সব মুণ্ডাগ্রাম বিশেষভাবে বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত রোগোতো তাদের মধ্যে অন্যতম। এ গ্রামে অন্তত দশবার পুলিশ ও মিলিটারি ঘুরে গেছে। সেই সেঙ্গেলদার অগ্নিবৃষ্টির পর পৃথিবী যন্ত্রণায় কুঁচকে গিয়ে কাঁপছিল। তারপর, সেই অনাদি অতীতে সিং-বোঙা জঙ্গলের আঁচল দিয়ে ব্যথার জায়গাগুলি ঢেকে দেন। ভু-স্তরের উঁচু নিচু অনুযায়ী জঙ্গল কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। রোগোতো গ্রামের কাছের জঙ্গলে শালগাছের খুঁটির মাচা, মাচার ওপর ঘর। সালী এখানে থাকতে চায়নি কিন্তু বিরসা প্রথমটা যন্ত্রণার্ত গলায় বলেছিল, 'পলায়ে বেঁচে থাকব?' তারপর বলেছিল, 'হেথাই থাক্। সরকার চিন্তা করবে না, যারে ধরতে মুণ্ডাদেশ চষে ফেলেছে হেথা রয়েছে।'

মই বেয়ে উঠে এল মানী পহানী। বলল, 'ডোন্‌কা আর মাঝিয়ারে ধরা দিতে বলাছি তাতেই বিশ টাকা। চাল এনাছি সালী, তরে চিবায়ে জল খাস, রাঁধিস না! ধুমা উঠবে! সবে জানবে'। বিরসাকে প্রণাম করল মানী।

—'খবর কি?'

—'খুব মন্দ। দেঁওরা, পহান্, জমিদার, বেনে, সবে মুণ্ডাদের তরসাতেছে, পুলিশ কোড়া পিঠতাছে। সাহেবের কোড়ায় ধার কি! ডরে সবে ক্রিশ্চান হতাছে।'

—'আবার!' সালী বলল।

—'তাতে কি? মুণ্ডারা অমন ক্রীশ্চান হয়, আবার মিশন ছাড়ে। যখন আবার উলগুলান হবে, আবার চলা আসবে, হবে তো উলগুলান, না কি বল ভগবান!'

মানী পহানীর বৃদ্ধ, জরাকবলিত, কুঞ্চিত মুখে নিশ্চিন্ত হাসি দেখে বিরসার বুক ফেটে গেল। মুণ্ডাদেশের বুকে সৈন্য-পুলিশ-রাজার হাতির মদমত্ত অভিযান! হোলির পর যেমন করে মুণ্ডারা ধর্মমতো শিকারে যেত, সরকার তেমনি করে মুণ্ডাগ্রাম ও ধানের টাল জ্বালিয়ে হোলির আগুন জ্বেলেছে। বিরসা ও বিরসাইতদের বন খুঁচিয়ে বের করতে উৎসবের খেলায় মেতেছে। শুধু এবার সব উৎসবের নাম রক্তোৎসব।

মুণ্ডাদের বুকে সঙিনের ফলা, বন্দুকের গুলি। জঙ্গলে গোপনে যে মুণ্ডাদের সমাধি হল, কেউ জানবে না। বিরসার উলগুলানের ডাকে তারা নেংটি পরে, কুচিলা-তীর হাতে একদিন সসাগরা পৃথিবীর মালিকের ফৌজের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল। শুধু ভবিষ্যতের মানুষ দেখে-দেখে অবাক হবে। শ্যামা অরণ্যানীর বুকে কোথাও-কোথাও কোনো কোনো শাল-পিয়সাল-কেঁদগাছের মাথা যেন বড় বেশি উঁচু। তারা জানবে না উলগুলান খেপা মুণ্ডার শরীরের রক্ত-মাংস-মজ্জা-হাড় গাছগুলির ধাত্রী মাটিকে পুষ্ট করেছে বলে গাছের মাথা এত উঁচু।

তবু মানী পহানী হাসছে, বলছে আবার উলগুলান হবে। বিরসা তবে নিশ্চিত ভগবান, ধরতি-আবা।

মানী বলল, 'সাহেব আর পোরাহাটের রাজা দশটা হাতি, হাজারটা মানুষ, সিপাই লয়ে বন ঠেঙাতে-ঠেঙাতে এদিকে আসছে। ডোন্‌কা বলা দিল তুমি সেনত্রার জঙ্গলে চলা যাও। যারা পলায়ে আছে, তারাও যাবে ধীরে ধীরে। হা দেখ ভগবান! সেরাইকেলা, করাইকেলা, রাজারা ডরে কেন? তাদের দেশে মুণ্ডা আছে? তারা কেন সরকারের হাতে হাত মিলাল?'

—'সব এক টোপী যে'

মানী চলে গেল। পাথরে চাল গুঁড়োতে লাগল পরমী। গুঁড়ো চিবিয়ে জল খাবে। আশ্চর্য, রোগোতোর কনু মুণ্ডা মরে যাবার পর থেকে পরমী ভগবানের সঙ্গে ফেরে, কনুর কথায়। বিরসার কোনো কথা অমান্য করে না ও। কিন্তু চাল দেখলে ওর মনে হয় বিরসাকে অমান্য করে এখনি কাঠ জ্বেলে ভাত রাঁধে, ভাত খায়। বিরসা ওকে ভাত রাঁধতে দেয় না বলে মাঝে-মাঝে মনে হয় রাঁধি, ভাত খাই, তাতে ভগবান ধরা পড়ে তো পড়ুক। রোগোতোর কনু মুণ্ডা তো ভাত খেতে পাবে মুণ্ডারাজ হলে, এই ভেবেই উলগুলান করতে গিয়েছিল। পরমীও ভেবেছিল সব মুণ্ডা মুণ্ডারাজে দু-বেলা ভাত খাবে। কিন্তু এখন ও নিঃশ্বাস ফেলে পাথরে চাল ভাঙতে থাকল।

পরমীকে দেখতে-দেখতে নিশ্বাস ফেলে বিরসা বিষণ্ন হেসে বলল, 'কত জনের কত সাধে আগুন জ্বালায়ে দিয়াছি সালী, কিন্তু উলগুলানের রীত আলাদা। তোর ছেলা, মরদ, ধান, ঘর, সব নিলাম। পরমীরও সব।'

—'দুঃখ কর?'

—'না। কতজন নাই কতজন রবে না, বুঝি আমিও এ-শরীরে রব না। কিন্তু উলগুলান সফল না হলে উলগুলানের শেষ নাই। মোর মরণ নাই। তুই একথা সবারে বলিস সালী।'

রাতে ওরা রোগোতোর জঙ্গল ছেড়ে সেনত্রার জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

পরে, অনেক পরে ব্যারিস্টার জেকব অমূল্যবাবুকে জিগ্যেস করেছিল। 'বিরসার অন্তিম পরিণতি কি হবে তুমি ভেবেছিলে? তুমি যা ভেবেছিলে, সেই পরিণতিই কি ওর হল? কি হল, যেজন্যে ওর নাম করতে তোমার মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে?

—'একটা কথার জবাব দিন আগে।'

'বল।'

—'আপনি কি বিশ্বাস করেন ও ভগবান?'

—'না। আমি মনে করি বিরসা নিপীড়িত মুণ্ডাদের উপযুক্ত নেতা, যোগ্য মুখপাত্র।'

—'আমি এখন মনে করি ও ঈশ্বর।'

—'কোন্ যুক্তিতে?'

—'কেন? বিট্রেয়ালের, বিশ্বাসঘাতকতার যুক্তিতে? মানুষ যখন ভগবান হয়, তখন কোনো-না-কোনো বেইমান তার পতন ঘটায়। তখন সে ভগবানই হয়ে দাঁড়ায়। শেষ অবধি বিশ্বাসঘাতকরাই ওকে ধরাল, তাই না?'

—'বলতে পার...আশ্চর্য!'

—'কি?'

—'যখন মুণ্ডারা মরছিল, শোষিত হচ্ছিল, বেঠকগারী দিচ্ছিল, সেবক-পাট্টা লিখছিল, খুটকাট্টি গ্রাম হারাচ্ছিল, জমিদার-মহাজন-সরকার, তিন হাতে মার খাচ্ছিল, তখন কেউ ওদের কথা ভাবেনি।'

—'যখন ওরা লড়ছিল, তখনো ভাবেনি।'

—'এখন বিরসার আন্দোলন ভেঙে যাবার পর মুণ্ডাদের বিষয়ে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, সহানুভূতিও।'

—'অথচ কি অসম্ভব সব কাণ্ড ঘটল। ধরা পড়ল চারশো বিরাশি জন। একবছর ধরে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের অছিলায় ওদের জেলে রাখা হল। সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে কেস দাঁড় করাতে-করাতে চোদ্দজন জেলে বিচারাধীন অবস্থায় জখম থেকে ঘা বিষিয়ে মরেই গেল, বিরসা বাদে। কেস দাঁড়াল মাত্র আশিজনের নামে।'

—'সেও লঘুপাপে গুরুদন্ড হল বহু কেসে। মিশনারীদের তীর মারার জন্যে পরাণ মুণ্ডার যাবজীবন দীপান্তর হল। গয়ার স্ত্রী, ছেলের বউ, আট বছরের নাতিরও জেল হল।'

—'এত যে হল, তাও তো 'বেঙ্গলী' কাগজে সুরেন ব্যানার্জি, ওদিকে 'স্টেট্সম্যান' কাগজ এত হইচই করল বলে। শেষে দেখা গেল, যারা সরকারী গাফলতির জন্যে জেলে পচে মরল, তারা অনেকেই বেকসুর খালাস পেল। সুরেন ব্যানার্জিকে জান তো? ওরকম বলতে তো কেউ পারবে না? বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে দাঁড়িয়ে যখন একে একে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

—'একথা কি সত্যি যে মুণ্ডাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ ধারায় যে কেস চলছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে?'

—'যদি হয়ে থাকে, তবে কেস তুলে নেবার আগে মুণ্ডারা কত দিন, কত মাস বন্দী ছিল হাজতে?'

—হাজতাধীন অবস্থায় কতজন মুণ্ডা মারা গেছে?'

'কাগজে যা বেরিয়েছে, তা কি সত্যি, যে বহু মুণ্ডাকে আবার নতুন অভিযোগক্রমে ধরা হয়েছে?'

'যদি হয়ে থাকে, তবে সরকার কি তদন্ত করবেন এবং জানবেন, কেন জেলে পাঁচমাস পচার আগে সে-অভিযোগ তাদের নামে দায়ের করা গেল না?'

যারা সেদিন সুরেন ব্যানার্জির বক্তৃতা শুনেছে, তারা বলল, 'বাইজোভ! বুড়ো আবার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে!'

'লাভকি হল? হ্যাঁ, কেস তারপর হল বটে। কিন্তু তার আগে বিচারাধীন অবস্থায় বন্দীরা মারা গেল। জানুআরিতে খুন্‌টি থানা আক্রমণ থেকে গ্রেপ্তার শুরু হল। কেসের রায় বেরুল ডিসেম্বরে। যে কমিশনার ডি. সি. পুলিশ ওদের জেলে বিনা বিচারে পচাল, এই চূড়ান্ত অন্যায় করল, লেফটেন্যান্ট গভরনর জন উডবার্ন স্বয়ং রাঁচি এসে তাদের প্রশংসা করে গেলেন। গভর্নর জেনারেল কার্জনও কিছু বললেন না।'

—'সবাই ইংরেজ যে? বিরসা কি বলেছিল চাইবাসার ইশকুলে।'

—সে তো আমার সামনে বলে বসল, 'জানি, জানি। 'সাহেব-সাহেব এক টোপী হ্যায়' ব্যস! অমনি তাড়িয়ে দিল ওকে।'

—'আমি আইনের পথেই লড়লাম বটে, কিন্তু মুণ্ডা-ট্রায়ালের পর তথাকথিত ব্রিটিশ জাস্টিসের স্বরূপ যেরকম জানা গেল, এমন আর হয়নি। বলতে বাধ্য হচ্ছি।'

—'আপনিও ইংরেজ।'

—'ইংরেজরা আমায় পছন্দ করে না।'

—'মুণ্ডাদের স—ব চেষ্টা ব্যর্থ হল।'

—'না অমূল্যবাবু।'

জেকব সস্নেহে অমূল্যবাবুর হাতে হাত রাখলেন। বললেন, 'কখনো তা ভেব না। আমি সেই সর্দার আন্দোলন থেকে মুণ্ডাদের হয়ে লড়ছি। তা বলে কি কেসে জিতেছি? না, জিতি নি। তবু জেনো, সব যুদ্ধ সব আন্দোলন কখন ব্যর্থ হল, কখন সার্থক হল, তা অঙ্কের নিয়মে হিসেব করা যায় না।'

—'জানি আপনি বলবেন, ব্যর্থ হয়েও এ-আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আমার যে বড্ড বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ জাস্টিসের ওপরে। আমি যখন দেখলাম কিছুই হচ্ছে না। কমিশনার ডি. সি.-এস. পি. মজা দেখছে? যখন দেখলাম মুণ্ডারা কিছু জানে না কেন ওদের বন্দী করা হয়েছে, কোন্ অভিযোগে, তখন অনেক চেষ্টায় একজন 'বেঙ্গলী'র রিপোর্টার আনানো গেল। তিনি লিখলেন, মুণ্ডাদের হাতে হাতকড়া, পায়ে ও কোমরে শেকল। সে ভার টেনে-টেনে তারা জেল থেকে ম্যাজিস্টেটের আপিসে যেতে আসতে

কষ্টে, ক্লান্তিতে পড়ে যায় মুখ থুবড়ে। অথচ তারা বিচারাধীন! কেস তৈরি হয়নি বলে তাদের এইভাবেই যেতে হচ্ছে মাসের পর মাস।'

—'জানি।'

—'লিখলেন, সবাই ছি ছি করল! কিন্তু শেকল তো খোলা গেল না! বিরসাও তো...বিরসাকেও তো...!'

—'যারা ধরিয়েছিল, তাদের ওপর অত নির্মম হয়ো না! মুণ্ডার কাছে পাঁচশো টাকা অনেক টাকা! ভেবে দেখো, শত-শত মুণ্ডা বন্দী অবস্থাতেও বিরসাকে ধরাতে যায়নি। ধরালে বেঁচে যেত!'

কিন্তু শশিভূষণ রাই আর ছ-জন মুণ্ডা ধরিয়ে দিল বিরসাকে, ওদের ভগবানকে। কেননা পাঁচশো টাকা অনেক টাকা। ধরিয়ে দিল পরমী, কেননা ভাতের লোভ বড় লোভ।

দু-দিন দু-রাত হেঁটেছিল বিরসা। সেন্ত্রার জঙ্গলে আশ্রয় নেবার পর সালী ও পরমীকে ঘুমোতে বলে বিরসা জেগে বসেছিল। এখন ওর হাতে দুটো তরোয়াল। সময় এলে ও একটাও চালাতে পারবে কি না জানে না। কেননা শরীর ঢেলে ঘুম আসছে, কেবলই ঘুম আসছে।

—'ঘুম এস না ভগবান!' সালী বলল।

'তুই জাগা আছিস?'

—'ঘুম আসে না।'

—'জাগা থাক, বিহানে ঘুমাস।'

—'পরমী ঘুমায়।'

—'ঘুমাক!'

বিরসা আর কোনো কথা বলেনি। অরণ্যের কথা শুনছিল। পাতার মর্মরে, হাওয়ার কান্নায়, বাঘের ক্ষিপ্র চলাফেরায় অরণ্য ওর সঙ্গে কথা বলছিল। বলছিল সব জানে ও, সব বোঝে। ও জানে বিরসা সকল মুণ্ডাদের ওর কোলে ফিরে দিতে চেয়েছিল। ও বোঝে, বিরসা পারল না।

কর্‌মির মতো, অবোধ মুণ্ডা মায়ের মতো, অরণ্যভূমি বিরসাকে গুনগুন করে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। 'তুমি তো চেয়াছিলে বাপ! তুমি তো জানতে না সকল তোমার হাতে নাই। আমি এই বনভূঁইটা কি আমার আছি? যখন তোমার পিতাপুরুষ আচোটা জঙ্গলে গাছ কেটে আবাদ করে তখন আমি আমার ছিলাম। তা বাদে, মুণ্ডার হাত হতে দিকুর হাতে, দিকুর হাত হতে সরকারের হাতে কিনা-বিচা, বিচা-কেনা হতে-হতে আমি, তোমার আদি জননী, অশুচি হয়া গিয়াছি বিরসা। তোমার কোনও দোষ নাই বাপ।'

আদি জননীর নিঃশব্দ কণ্ঠস্বর বিরসার অন্তরে বৃষ্টির মতো পড়ছিল আর পড়ছিল। তাই শুনতে শুনতে ভোর হল। বিরসা আরক্ত চোখে বলল, 'সালী, তুই ঘুমা। আমিও ঘুমাই রে! কালঘুম ধরাছে মোরে, ঘুমের বিষে অঙ্গ অবশ! পরমী, তুই জেগা আছিস। আগুন জ্বালিস না রে।'

কিন্তু পরমী আগুন জ্বেলেছিল। ধোঁয়া উঠছিল বাতাসে। ভাত রাঁধছিল পরমী!

ভাতের গন্ধ শুঁকছিল।

ওরা ধোঁয়া দেখে-দেখে কাছে এসেছিল। পাঁচশো টাকা অনেক টাকা। দেখেছিল বিরসা ঘুমাচ্ছে, শীর্ণ, ক্লান্ত। দূরে মাটিতে সালী ঘুমাচ্ছে। ওরা বিরসাকে চেপে ধরেছিল। পাঁচশো টাকা! সালী ঝটাপটির শব্দে, পরমীর আর্ত, ভয়ার্ত চীৎকারে জেগে উঠেছিল। প্রথমেই ও চেঁচিয়ে ওঠে, কেননা ও দেখেছিল শশিভূষণ রাই আর মাঝি তামারিয়াকে, সঙ্গে আরও পাঁচজন। শশিভূষণ মাঝি এ মরশুমে দু-হাতে টাকা পিটছিল। বিরসা ছাড়া অন্য মুণ্ডাদের ধরিয়ে দুশো পঁচানব্বই টাকা পেয়েছিল ওরা, বিরসার দাম পাঁচশো টাকা। সালী চেঁচিয়ে ওঠে, বিদ্যুৎ-পৃষ্টের মতো জেগে বিরসা হাতিয়ার খোঁজে, উঠতে চেষ্টা করে, কিন্তু ওকে পালাতে বলে, 'মোর হুকুম!' সালী পালায়, কেননা বিরসা ওর চোখে চোখে চেয়ে হাসে। চেঁচিয়ে বলে, 'তোরা বড়লোক হয়া গেলি মাঝি, পাঁচশো টাকা, জমির পাট্টা! কোথা নিয়া যাবি?'

—বন্দ্‌গাঁও।'

সালী এটুকু শুনে যায়। তাই চেয়েছিল বিরসা। তারপর সালী এতদিনের সতর্কতা ভুলে সেন্‌ত্রা গ্রামের পথ ধরে চেঁচিয়ে চলে যায়, 'ভগবানেরে ধরাচ্ছে শশিভূষণ রাই, মাঝি তামারিয়া! বন্দ্‌গাঁওতে নিয়া যায় হে। মুণ্ডারা মরি গিয়াছ, না জীন্দা আছ? হা দেখ, পাঁচশত টাকার তরে উরা ভগবানেরে ধরে লয়ে গেল!' আর্তচীৎকারে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সালী চলে গেল গ্রামের পথ ধরে। মুণ্ডারা যতজন অবশিষ্ট ছিল বেরিয়ে আসছিল। সেন্‌ত্রা থেকে বন্দ্‌গাঁওয়ের পথে গ্রাম থেকে গ্রামে হেসাদি-কারিকা-সোৎরা-জালমাইয়ে খবর ছড়িয়ে পড়ছিল।

বন্দ্‌গাঁও থেকে খুন্‌টি, খুন্‌টি থেকে রাঁচি, পথের দু-ধারে মানুষ আর মানুষ। পুলিশ জানত না এত অত্যাচারের পরও এত মুণ্ডা গ্রামে গ্রামে ছিল। রাইফেলধারী পুলিশ ও মিলিটারি বিরসাকে রাজসম্মানে সামনে-পেছনে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বিরসার মাথায় পাগড়ি, গায়ে চাদর, শেকল, মাথা উন্নত, মুখে হাসি, চোখের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। একা ও জানছিল রাঁচি থেকে খুন্‌টি, খুন্‌টি থেকে বন্দ্‌গাঁও হয়ে চালকাড়ের পথ ধরে কোনোদিন ঘরে ফিরবে না।

আর ফিরবে না চালকাড়ে, মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে না। আর দাঁড়াবে না ভক্তদের সামনে। শ্যামা অরণ্য, রক্তমৃত্তিকা, নাতিউচ্চ পর্বতমালা সব দেখিয়ে বলবে না, 'সব ফিরে নিব মোরা!' আর হেঁটে হেঁটে রাতের অন্ধকারে গ্রাম থেকে গ্রামে চলে যাবে না জঙ্গল ভেঙে।

বিরসাকে আনা হচ্ছে, একটি আলাদা সেল খালি করা হোক, অর্ডারটা অমূল্যবাবু প্রথমে বিশ্বাস করেনি। তারপর মাগুরাম ওয়ার্ডার ওকে গোপনে বলে গেল, ভরমি ও ধানী ওকে দেখা করতে বলেছে। ধানীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, ধানী বলল, 'একদিন মোদের সঙ্গে রাখো তারে!' অমূল্যবাবু বলল, 'স্নান করার জন্য তাকে বাইরে আনা হবে, তখন কথা ব'লো।' বিষণ্ণ হেসে ধানী বলল, 'আমার সঙ্গে তো সে কথা বলবে না, নইলে আমিই বলতে পারতাম।'

সেল রেডি করতে অমূল্যবাবু কুড়ি মিনিট সময় নিল। কুড়ি মিনিট বিরসা ভরমিদের সেলে ছিল। বিরসা নিচু গলায় বলল, কাঁদবে পরে, কথা বলবে পরে, এখন সময় নাই। যা বলি শুন। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যেয়ে জেরা হবে যখন, তোমরা চারশত মুণ্ডাই বলবে মোরে জান না, আমি কি বলছি তোমরা বুঝ নাই, না বুঝে উলগুলান করাছ।'

—'ভগবান—!'

—'মোরে ঠক্ বল, জুয়াচোর, সকল গাল দাও ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমরা বাঁচ। তাতে মোর শান্তি!'

—'তুমি—'

—'মোরে এরা জেহেল থেকে বেরোতে দিবে না।'

—'একা ঘরে রাখবে ভগবান!'

—'রাখুক! আমি ভগবান তাই তোমাদের সাথে সাথী হয়াছি, হেথা এসাছি ভরমি! ভরমি তোমাদের ছাড়ি নাই! মরাছে ক-জনা?'

—'করার দুনা মুণ্ডা, লোহাজিমির সুখরাম।'

—'কেউ ওষুধ দিয়াছিল?'

—'যা দিয়াছে ওই বাঙালীবাবু?'

বিরসা মৃদু হাসল।

পরে, সলিটারি সেলে কামার এসে বিরসার কোমরে ও পায়ে শেকল পরাল, নিচু গলায় বলল,'শাপ দিও না মোরে!' বিরসা বুঝল, এবার ও জীয়ন্ত বেরোবে না জেল থেকে। হাতে হাতকড়া, কোমরে ও পায়ে শেকল, ছোট কুঠরির দেওয়াল পাথরের। সামনে গরাদের দরজা। দরজার সামনে চব্বিশ ঘণ্টা সশস্ত্র সান্ত্রী। দরজার সামনে ঢাকা বারান্দা, বাইরের আলো বাতাসের পথ বন্ধ। দেওয়ালের উঁচুতে একটি ঘুলঘুলি। সরকারী সিদ্ধান্ত, ওকে সাধারণ ফৌজদারী আসামী হিসাবে বিচার করা হবে। অপরাধ বহুদিন ধরে নরহত্যা ও অগ্নিসংযোগে সহায়তা করা। সরকারী সিদ্ধান্ত, ওকে মুণ্ডাদের সামনে একটা সাধারণ ফৌজদারী আসামী বলে প্রতিপন্ন করা। অথচ সাবধানতা ও সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে একটা গুরুতর রাজনৈতিক আসামীর মতো। বিরসা বুঝল ব্রিটিশ তাকে ক্ষমা করবে না।

কেননা স্বয়ং ডি. সি. তাকে বলে গেলেন, তিনি পুলিস অফিসারদের সহায়তায় সরজমিনে তদন্ত করে সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করবেন বলে উপদ্রুত এলাকায় চলে যাচ্ছেন। বিরসা বুঝল, এখন ডি. সি. সময় নেবেন। বিরসা শুনল জেকব এসেছেন। তারপর যেদিন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ওকে হাজির করা হল সেদিন ও জেকবকে দেখতে পেল। কিন্তু জেকবের সঙ্গে ওকে কোনো কথা বলতে দেওয়া হল না। জেকব বারবার বললেন, 'বিনাবিচারে বন্দীদের আটক রাখা হয়েছে জানুআরী থেকে এপ্রিল অবধি, আজও কেস তৈরি হল না। ব্রিটিশ জাস্টিসের নামে মুণ্ডাদের ওপর চূড়ান্ত অবিচার চলছে। তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো ব্যবস্থা সরকার করেননি। জেকব আপনা হতে এসেছেন। যে-সব অপরাধ মুণ্ডারা করেনি, তার দোষে তাদের অভিযুক্ত করা হবে বলে চার মাস ধরে

প্রমাণ জোগাড় চলেছে। আসলে, কন্‌স্টেব্‌ল হত্যার জন্য পুলিশ খেপে গিয়েছে। বিনাবিচারে আটক রেখে মুণ্ডাদের হয়রানি করা হচ্ছে। বিনাবিচারে আটক রাখার মধ্যে একে-একে আটজন মারা গিয়েছে। এখনি কেস শুরু করা উচিত।'

বিরসা শুনল ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'পুলিশ কেস ফাইল না করলে তিনি কিছু করতে পারবেন না।'

এমনিই চলতে লাগল মাসের পর মাস। এ এক অদ্ভুত খেলা যেন। 'বেঙ্গলী' ও 'স্টেট্‌সম্যান' কাগজে মুণ্ডা-কেস নিয়ে লিখে-লিখে সরকারের বিবেক জাগাবার চেষ্টা চলতেই থাকল। মুণ্ডারা হাতে-পায়ে-কোমরে শেকল টেনে মে মাসে দুরন্ত গরমে কাছারিতে হাজিরা দিতেই লাগল। একের পর এক বন্দী জেলে মারা যেতেই থাকল মাঝে-মধ্যে।

সেলে হাঁটতেই থাকল বিরসা পা ও কোমরের শেকল টেনে টেনে। পাশের ঘরে শেকলবাঁধা অবস্থায় অন্ধকারে বসে ধানী ও ভরমি, গয়া ও সোমা, ডোন্‌কা ও মাঝিয়া মুণ্ডারা শুনতেই থাকল ঝন-ঝন-ঝন, লোহা ও পাথরের ঘষটানির শব্দ। পায়ের শেকল টেনে চলার শব্দ। বিরসা জানে ওর পায়ে এত শক্তি নেই যে টেনে চলতে পারে। ভারী শেকল। কিন্তু বিরসা এও জানে ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত, বন্দী মুণ্ডারা পাশের সেল থেকে এই শেকলের শব্দটা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে। ও যাদের বিস্তৃত অরণ্য, সীমাহীন পার্বত্যভূমি দিতে চেয়েছিল, তাদের দিতে পেরেছে জেলগারদ। এখন আর কিছু দেবার নেই ওর, শুধু এই শেকলের শব্দে জানাবার আছে ও মরেনি।

একা, নির্জন ঘরে একা, নিঃশব্দ নির্বাক। সকালে দরজা খুলে যায়। বেরিয়ে এসে আকাশের নিচ দিয়ে শেকল টেনে টেনে কোর্টে যায় বিরসা। মুণ্ডারা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের দুরন্ত গরমে শেকল টেনে বেলা বারোটায় যখন ফেরে, তখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গরমে, মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

যাবার সময় কারো সঙ্গে কথা হতে পায় না, আসার সময়েও নয়। বিরসা বোঝে মুণ্ডাদের অন্ধকার ঘরে বন্দী রাখা প্রাণদণ্ডের মতোই নির্মম শাস্তি। মনে হতে লাগল ওর, কেবল মনে হতে লাগল, আর শেকল খুলে ফেলে বাইরে যেতে পারবে না ও, এবারকার মতো এই শেষ। তাই, গুলির ক্ষত পচে যেদিন ডেনখানেলের মনদেও মুণ্ডা মরে গেল, মরে যাবার আগে চেঁচিয়ে কেঁদে বলে উঠল, 'গুলির ঘায়ে মরি না হে, শশী দারোগা কোড়া মেরা মেরা ভগবানের নামে মোরে দিয়া মিছা বলাল হাকিমের সামনে, সেই পাপে মরি!'

সেদিন গারদের গায়ে হাতকড়া ঠুকে বিরসা চেঁচিয়ে বলল, 'মনদেও শুন। শুন হে মুণ্ডারা। ধরতি-আবা আমি, মাটি দিয়ে রচনা এ দেহে তেগে না গেলে তোমাদের উদ্ধার নাই। সাহস ছেড় না হে, বল না ভগবান মোদের জেহেলে ঢুকায়ে চলে গেল। সকল হাতিয়ার তোমাদের দিয়াছি, বুকে সাহস দিয়াছি, চিনায়ে দিয়াছি কে তোমাদের দুশমন। সে- হাতিয়ার তোমরা সঁপে দিও না, একদিন তোমরাই জিতবে।

মাগুরাম ওয়ার্ডার ছুটে এল, বলল 'চুপ কর্‌ বিরসা।'

—'কি দিয়াছে মোরে, মার কণ্ঠ জ্বলে, গলা শুকায়ে যায়, নাড়ি হতে রক্ত নেমে যায়?'

—'চুপ কর্।'

—'চুপ আমি করব না! একদিন ফিরা আসব। হোলির আগুন জ্বালায়ে দিব থানায় থানায়, সোমপুরে আঁধি তুলা দিব।

ঘণ্টা বাজাতে শুরু করল জেলখানায়, সান্ত্রী ছুটে এল, দরজা খুলে ঢুকল। বিরসা যন্ত্রণার্ত, বিভ্রান্ত চোখে তার দিকে চাইল। বলল, 'মোরে পাহারা দাও? একদিন তুমিও দেখো হে, এ মুণ্ডাদের লয়ে দেশের মাটি লয়ে আমি ছিনামিনা করব। দুশমনরে আমি ছোটনাগপুরের বাহান্ন পরগনা হতে খেদাব। কি দিয়াছে মোরে, মোর কণ্ঠ জ্বলে যায়? কি দিয়াছে?'

—'সাহেবরে ডাকি?'

—'সাহেব ওষুধ দিলে আমি খাব! মোর গলা শুকায়ে যায় কেন?'

—'কাছারি যেতে হবে যে?'

—'যাব, এখনি যাব। মাঘ মাসের দশ তারিখ হতে আজ জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হয়, কাছারি যেতেছি, যাব। কিন্তু সাহেব যা ভেবেছে, তা হবে না হে! মোর বিনাশ নাই!'

অমূল্যবাবু বলল, 'ওকে কোর্টে না নিলে হয় না?'

সুপার বললেন 'কেন?'

—'ও অসুস্থ।'

'আমি মনে করি ও সম্পূর্ণ সুস্থ।'

জুন মাসের গরম। শেকলের গরম, ভার। নির্মম সূর্য। বৃষ্টি নাই। শোনা গেল কোর্টে বিরসা মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

সকালে সুপার মনে করেছিলেন ও সম্পূর্ণ সুস্থ। বিকেলে জেকব প্রচণ্ড চেঁচামেচি করলেন। ছুটে এলেন ডি. সি.। তখন সুপারকে ডাকতে হল অমূল্যবাবুকে। অমূল্যবাবু বলল, 'ওর নাড়ি ক্ষীণ, চোখ কোটরে বসে গেছে, তেষ্টা পাচ্ছে ওর।'

সুপার ডি. সি.-কে জানালেন, বিরসার কলেরা হয়েছে, 'ওর বাঁচার আশা কম।'

অমূল্যবাবু সে কথা জানাল। জেনে ওর ভেতরে ভয়ে কাঁপন ধরে গেল। বমি নেই, দাস্ত নেই, কলেরার কোনো লক্ষণ নেই। কলেরা হতে পারে তার কোনো কারণ নেই। সুপারের নির্দেশ ছাড়া একদানা ভাত, এক গেলাস জল খায়নি বিরসা। কেন ডাক্তার হয়েও সুপার বলছেন, ওর কলেরা হয়েছে? কেন বলছেন ওর বাঁচার আশা কম?

সরকারী প্রশাসন উপেক্ষা করে অমূল্যবাবু ডি.সি.-কে বলল, 'আমি ওকে দেখতে পারি?'

'ইয়েস ডু।'

অমূল্যবাবু দরজা খুলে ঢুকল। বিরসার মুখের ওপর নিচু হয়ে বলল, 'তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না, বলিস না। কিন্তু মাগুরাম ওয়ার্ডার যা দেবে, তাছাড়া কোন ওষুধ, খাবার, খাস না বিরসা, জলও খাস না। আজ পয়লা জুন। তোদের কেস নিয়ে খুব হইচই উঠে গেছে। এবার বোধহয় ফয়সালা হবে।'

ক্ষীণ হাসল বিরসা। আস্তে আস্তে বলল, 'এবার কথা বলি নাই, সে রাগের বশে নয়। মোর সঙ্গে কথা বললে তুমি বিপদে পড়বে। আমি জানি তুমি মুণ্ডাদের দুশমন নও। কিন্তু

বেরথা চেষ্টা।'

—'কেন?'

—'আমার হায়জা হয় নাই? সে কথা সুপার সাহেব হতে কেও ভাল জানে না। বুঝ না, মোরে জীয়ন্ত বারাতে দিবে না?'

—'আমি যাই।'

—'যাও! বেরথা চেষ্টা! মোর কথা ফলে কি না দেখা নিও!'

—'বহু মুণ্ডা ভেঙে পড়েছে।'

—'ওদের কি দোষ? সাহেবরা কি, তা কি ওরা জানত?'

ছ-দিনেই বিরসার শরীরের উন্নতি হল। মুণ্ডারা জানল এবার ওদের ভগবান বেঁচে গেল।

কিন্তু আট-ই জুন আবার ডি. সি. এলেন। সুপার ও ডি. সি.-র মধ্যে গোপনে কথা হল। সুপার বললেন, 'এখন থেকে বিরসার ঘরে আমি ছাড়া কেউ ঢুকবে না।'

অমূল্যবাবু দেখল, গারদের গায়ে কালো কম্বলের পর্দা টানা। মাথা নেড়ে চলে গেল ও।

নয়-ই জুন ভোরে শোনা গেল গত রাত্রে বিরসার তিনবার দাস্ত হয়েছে।

সকাল আটটার সময় বিরসা রক্ত বমি করে, অজ্ঞান হয়ে যায়। সুপার ওর নাড়ি দেখলেন, ঘড়ি হাতে করে দাঁড়ালেন। এখন রাঁচি জেলের ঘরে ঘরে কান্না শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সুপার তাতে কান দিলেন না। এখন নিশ্চিত জানা যাচ্ছে বিরসা মারা যাবে।

সুপার মনে মনে সব রিহার্সল দিয়ে নিলেন। মৃত্যুর কারণ বলতে হবে কলেরা। পোস্টমর্টেম করতে হবে বিকেলে। সন্ধ্যার পর লাশ জ্বালিয়ে দিতে হবে। পোস্টমর্টেমে লিখতে হবে, বিরসার বুক ওঠা-নামা দেখতে-দেখতে ভেবে নিলেন সুপার লিখতে হবে 'পাকস্থলী জায়গায়-জায়গায় কুঁচকে দলা পাকিয়ে গিয়েছে, ক্ষুদ্রান্ত্র সরু হয়ে গিয়েছে' ক্ষয় হতে হতে। বহু পরীক্ষাতেও পাকস্থলীতে বিষ পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর কারণ কলেরা।'

তারপর লাশ জ্বালাতে হবে। মুণ্ডারা কবর দেয়, দাহ করে না। বিরসার লাশ জ্বালালে ওদের ধর্মবিশ্বাসে ঘা লাগবে। ওরা বুঝবে বিরসা ভগবান নয়, সামান্য আসামী, নশ্বর মানুষ। যে-কোন মানুষের মতোই ওর দেহ বিনশ্বর।

লাশ জ্বালালে জেকব ও অন্য হল্লাবাজরা দেহ আবার চেরাফাঁড়া করার দাবি জানাতে পারবে না। সকাল ন-টা বাজল। সুপার নিচু হলেন। বিরসার নাড়ি, বুক, চোখের মণি দেখলেন। উঠে দাঁড়ালেন।

জেলারকে বললেন, 'এখনি লেখ, বিরসা মুণ্ডা, সুগানা মুণ্ডার ছেলে, জন্ম ১৮৭৫। বয়স পঁচিশ। ডায়েড অফ এশিয়াটিক কলেরা। তারিখ—৯ জুন, ১৯০০ সাল।

ওয়ার্ডারকে বললেন, 'মেথরকে ডাক। লাশ ঢেকে দাও।'

৯ই জুন, ১৯০০ সাল। রাঁচি জেল। সকাল ন-টা দশ।

উপসংহার

অমূল্যর নোটবই থেকে ঃ —'আজ ১৯০১ সাল শেষ হল। নোটবইটা আমাকে শেষ করতেই হবে। আমার জীবনকালে বিরসা, যদি কেউ তোমার আশ্চর্য, অপরূপ কথা জানতে চায়, তাকে খাতাটা দেব। যদি না চায়, তাহলে এমন ব্যবস্থা করে যাব যাতে ভবিষ্যতে যদি কেউ তোমার কথা জানতে চায়, সে আমার নোটবই থেকে সব কথা জানতে পারে।

ব্যারিস্টার জেকবকে ধন্যবাদ। তাঁর সহায়তায় আমি কিছু কিছু কাগজ পেয়েছি।

আমার সামনে আছে "প্রসিডিংস্ অফ্ দ্য হোম ডিপার্টমেন্ট। অগাস্ট ১৯০০, প্রোগ নং ৩৩০, রাঁচি জেলার মুণ্ডাদের বিদ্রোহ।" তাতে দেখতে পাচ্ছি রাঁচিতে ১৮৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর, রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে রাঁচি থানার একুশটি গ্রামে, বসিয়া থানার চারটি গ্রামে, খুন্‌টি থানার দুটি গ্রামে, তামার থানার দুটি গ্রামে, তোরপা, বুন্দু ও রাঁচির একটি করে গ্রামে বিরসাইতরা ক্রিশ্চানদের ওপর তীর চালায়, আগুন ধরায়, হত্যা করে দুজনকে, গুরুতর জখম করে পনেরোজনকে।

সিংভূম জেলায় ২৪শে থেকে ২৮শে ডিসেম্বরের মধ্যে আটটি থানার ৩৪টি গ্রামে আগুন জ্বলে, ৩৫ জন আহত হয়। দুজন নিহত। নিহতদের মধ্যে একজন পুলিশ কন্‌স্টেবল। সিংভূম জেলায় সবই ঘটে চক্রধরপুর থানায়।

পড়তে পড়তে ভাবছি বিরসা, তোমার সন্তানরা যদি তীরই ছুঁড়ল, তবে এমন তীর ছুঁড়ল না কেন, যাতে প্রতিবার শিকার মরে?

আমি জানি তুমি কি বলছ। বলছ, শালো অমূল্যবাবু, দিকু তুমি, ও হাতে শুধা কলম ধরাছ, ধনুক ধর নাই। বলছ ২৪শে ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখানো। তা ভয় আমরা দেখায়েছিলাম। ব্রাডি সৈল্‌রাকাব—মনে নাই?

মনে আছে, খুব মনে আছে। যেমন মনে আছে তোমার আশ্চর্য চোখ, আশ্চর্য হাসি। চোখ দুটো এত হাসত যে-কথা কইতে পারতে না তুমি।

আর মনে আছে জেলে তোমার চেহারা।

জান বোধহয়, তোমার মৃত্যুকে এখনো মনে করা হয় রহস্য? আমি তো জানি কি ঘটেছিল। বিচারাধীন অবস্থায় তোমার মৃত্যুই ছিল অভিপ্রেত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেও তোমাকে জীয়ন্ত রাখতে হত। তোমার মৃত্যুই অভিপ্রেত ছিল। বিচারাধীন অবস্থায়।

তোমার সন্তানদের বিচারের কথাটা লিখি।

সৈল্‌রাকাবে যে গুলি চলেছিল, তাতেই সমাপ্তি সূচিত হয়। সৈল্‌রাকাবে গুলিচালনার পর ১০ই জানুআরি কমিশনার নিজেই গ্রামে গ্রামে ঘোরেন ও বিদ্রোহী মুণ্ডাদের ধরিয়ে দিতে বলেন।

তারপর যা যা ঘটে তা তুমি জান।

যা জান না তা হল, আহত বন্দীদের হাঁটিয়ে আনা হতে থাকে, তারা কেউ কেউ মারা যেতে থাকে।

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জানান, রাঁচির ডি. সি. যেন আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ

সংগ্রহের জন্যে ফিরে যান বিদ্রোহী অঞ্চলে।

গভর্নমেন্ট বলে দেন, তিনি নিজে যেন কেসগুলি বিচার না করেন। করলেই কোর্ট অফ আপীল বলবে, ডি. সি.-র তো ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। ডি. সি.-র কাছে বিচার হলে আসামীদের উক্ত কোর্ট প্রেজুডিস্‌ড বলে মনে করবে।

বিরসা, এদের শাসনের বনেদ এত কড়া, কঠোর, জটিল, তোমার সাধ্য কি মুণ্ডাদের ভগবান, মুণ্ডাদের ভাগ্য পণ রেখে যোদ্ধা ভগবান হয়ে এদের বনেদ টলাও? তুমি পঁচিশ বছরের এক মুণ্ডা যুবক। তোমার বিরুদ্ধে সেদিন বড়লাটের দপ্তর সর্বশক্তি সংহত করেছিল।

ঠিকমতো বিচার হোক, তাড়াতাড়ি ফয়সালা হোক, এ সরকার চায় নি। সরকার চেয়েছিল, সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড়ের নামে তোমাদের অনাদি অনন্তকাল বিচারাধীন অবস্থায় রেখে শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে। বিচারাধীন অবস্থায় বিদ্রোহীদের রেখে দেওয়া, তরুণ ও কিশোরদের চার দেওয়ালে বন্দী করে রাখা বড় কাজ দেয় সরকারকে। আকাশ দেখতে না দিয়ে, অন্ধকারে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য করলে মুণ্ডাদের মনের ভেতরে অন্ধকার নামবে, তা সরকার বুঝেছিল।

সবচেয়ে বেশি যা বুঝেছিল, তা হল, মুণ্ডারা জানে না তারা কোনো অপরাধ করেছে।

জেরায় তারা বলছিল, ভগবান ডেকাছে, মোরা শামিল হয়াছি। মোদের আদি অধিকার চেয়াছি। মোরা কুন দুযে দুষী নয় হে! তোমরা কি বল, কি লিখ অত? বুঝি না মোরা।

সরকার বুঝেছিল, মুণ্ডাদের জীবনেও বোঝানো যাবে না স্বভূমিতে স্বাধিকার ফিরে চাওয়া ভীষণ, অমোঘ, দণ্ডনীয় অপরাধ।

তাই, ওরা যে বিচার-ব্যবস্থার কিছুই বোঝে না, তার ফাঁদে ও জালে ওদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে মনের বল ভেঙে দেওয়া হল সবচেয়ে ভাল।

অতএব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারির হাত দিয়ে যে নির্দেশ এল, তাই বহাল রইল।

১৯০০ সালের ফেব্রুআরি ও মার্চে দুজন স্পেশাল পুলিশ এস. আই. গেল সাক্ষ্যপ্রমাণ তৈরি করে ঝটপট কেস শেষ করার কাজে ডি. সি.-কে সাহায্য করতে।

যাঁকে সাহায্য করতে গেল, তিনি ক্যাম্প ফেললেন ৯ই এপ্রিল। ১৪ই মে অব্দি তিনি ট্যুর করলেন। আমরা শুনলাম, যেসব মুণ্ডারা জেলে আছে, তাদের বিরুদ্ধে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় শেষ।

বড়লাটের আদেশে লীগ্যাল রিমেমব্রানসার ২২শে মে রাঁচিতে এসে বিরসাইতদের বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় হয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখে সাজিয়ে ফেলেন। বিরসাইতদের বিচার কিভাবে করা হবে তাও বলে যান। তিনি বলেন, (১) তদন্ত সম্পূর্ণ করতে হবে। (২) কাউকে মিছেমিছি সাজা দেওয়া চলবে না বটে কিন্তু (৩) সরকারের অসাবধনাতায় দোষী যেন খালাস না পায়।

ব্যাপারখানা বোঝ। বিরসা ধরা পড়ল ফেব্রুআরিতে। লীগ্যাল রিমেম্‌ব্রান্‌সার চলে এলেন বড়লাটের হুকুমে। মে মাসে তিনি জেনে গেলেন সাক্ষ্য যোগাড় শেষ। তুমি কি

জানতে তুমি এত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ? সিমলায় বড়লাটের দপ্তরকে কাঁপিয়ে দিয়েছ? তখন তুমি সলিটারি সেলে। তুমি শেকল টেনে হাঁটতে, আমি শুনতাম।

তুমি শেকল টেনে হাঁটতে। একদিন ৯ই জুন এল, তুমি মারা গেলে।

জুন গেল, জুলাই গেল, আগস্ট যায়, ২১শে আগস্ট লীগ্যাল রিমেম্‌ব্রান্‌সার আবার রাঁচি এলেন। আবার তিনি দেখে খুশি হলেন, সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় শেষ। ফাইলের পাঁজা এখন পর্বতপ্রমাণ।

কিন্তু কিভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় হয়েছিল? স্ট্রিট্‌ফিল্‌ড কি জানতেন না, পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে অন্তত একশোজন, যা বলানো হল, তাই বলে যায়?

তাদের আদালতে দাঁড় করালে আসল কথা বেরিয়ে পড়বে। সেই ভয়েই কি তিনি মে-জুন মাসে বেশ কিছু বন্দীকে বিনাশর্তে ছেড়ে দেননি?

তিনি ডি. সি.। কিন্তু যে-কেস স্বয়ং বড়লাটের নির্দেশে চালিত হচ্ছে, সে-কেসের আসামী ছেড়ে দেবার সময় তিনি তাঁর সরাসরি ওপরওয়ালা কমিশনারকেও কিছু জানাননি। যুক্তি দেখিয়েছিলেন, "এদের বড় তাড়াহুড়োয় ধরা হয়েছিল, তাই খালাস দিয়েছি।"

কমিশনার খেপে গেলেন। তিনি জানালেন ছোটলাটকে। ছোটলাট বললেন, "তাড়াহুড়োয় ধরা হয়নি। খালাস করা হল তাড়াহুড়োয়।" গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াও খেপে গেল। জানাল, "ওদের বিচার করা হবে কি না তা ছেড়ে দেবার আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল।"

বিরসা, বিরসা, তোমাকে আর তোমার সন্তানদের নিয়ে সরকারী মহলে এইরকম রোমাঞ্চকর উপন্যাস ঘটছিল।

অবশ্যই কলকাতার প্রেসে হইচই হয়। শেষে কি দাঁড়ায় ব্যাপারটা? চারশো বিরাশি জনের মধ্যে মাত্র আটানব্বই জনের বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করানো যায়।

তখন বড়লাটের দপ্তরই রাঁচি সরকারকে দোষ দেন। বলেন, আঞ্চলিক অফিসারদের কার্যকলাপ বেঠিক হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকেই এতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণ পড়ে দেখার সময়েই আঞ্চলিক অফিসারদের বোঝা উচিত ছিল যাদের বিরুদ্ধে সাতমাস চেষ্টা করেও কোনো কেস দাঁড় করানো যায়নি তাদের কয়েদ রাখা অনুচিত হচ্ছে।

অবশ্য একটা কথা আগেই ঠিক করা হয়েছিল, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সিদ্ধান্ত, "বিরসাকে রাজনীতিক বন্দী হিসাবে বিচার করা হবে না। দীর্ঘকালব্যাপী খুন ও অগ্নিসংযোগে সহায়তা করার জন্য সাধারণ অপরাধী হিসাবে বিচার করা হবে।"

তারপর অবশ্য তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত পালটায়। কেন পালটায় জান? চুপে চুপে বলি— ফেব্রুআরি থেকে মে অব্দি জেলে পুরে রেখে, পিঠে কোড়া মেরে, তৃষ্ণার জল না দিয়ে, তবু মুণ্ডাদের মনোবল ভাঙা যায়নি। তোমার ওপর বিশ্বাস টলানো যায়নি।

আমি রাতে গিয়ে ওদের ঘরের দেওয়ালে কান পেতে শুনতাম। কোড়ার ঘায়ে রক্তাক্ত শরীর—কালো শরীরে রক্ত বড় লাল দেখায়—রক্তাক্ত শরীরে বিড়বিড় করে

মন্ত্রাবিষ্টের মতো বলে চলত।

"ভগবান বলাছে যতক্ষণ না ই মাটির দেহ ছেড়ে যাই, তুরা বাঁচবি না। ভেঙে পড়িস না রে! মনেও ভাবিস না তোরাদের অকূলে ভাসায়ে চলে গেলাম। তোদের ত সকল হাতিয়ার, হাতিয়ারের ব্যবহারের নিময় শিখায়ে দিয়েছি? তোরা তাই লয়ে লড়বি? হাঁ, ভগবান বলাছে। মার্‌কোড়া, শালোরা, আরও কি আছে লয়ে আয়, মরতে বিরসাইত ডরায় না। যারা বিরসাইত নয়, তারা মরতে ডরায়। যেদিন ধরতি-আবা হয়া বন হতে বেরাল, সেদিনই বলাছে, তোমাদের কোলে উঠায়ে দুলাব না, ভুলাব না, মরতে শিখাব। মার্‌ কোড়া।"

শুনতে শুনতে আমি শুদ্ধশুচি হয়ে যেতাম বিরসা! বিরসা! আমার অনাথাশ্রমের জীবনে ভালবাসিনি কাউকে। তুমি আমার প্রথম ও শেষ মানুষকে ভালবাসা। তুমি আমার বন্ধু, ভাই, সাথী। তুমি জেলে, মুণ্ডারা জেলে, তুমি আমাকে চিনতে চাইতে না আমাকে বিপদে জড়াবে না বলে। মাগুরাম একদিন একটা কথা বলল।

বলল, "ডাক্তারবাবু, আজ মনটা দুখাল।"

আমি বললাম, "কেন?"

ও বলল, "কাল ঝড় হল। একটা চড়াই পাখি বিরসার ঘরে গিয়ে পড়েছিল। ও তার সঙ্গে কথা বলছিল। বলছিল, সনা মোর, ভয় নাই। আজ সকালে দেখি পাখিটা উড়ে গেছে। বললাম, পাখিটা উড়ে গেল? বিরসা হাসল। বলল ও কেন হেথা রবে বল? আমার সেলে রোদ ঢুকে না, বাতাস বয় না। মনটা আমার দুখাল খুব।"

বিরসা, তুমি জেলে, তোমার সন্তানরা জেলে, আমি যেন অশুচি হয়ে থাকতাম।

তাই ছুটে গিয়ে রাতে মুণ্ডাদের সেলের দেওয়ালে কান পেতে শুনতাম। কোড়ার ঘায়ে রক্তাক্ত শরীর—কালো শরীরে রক্ত বড় বেশি লাল দেখায়। রক্তাক্ত শরীরে ওরা মন্ত্রাবিষ্টের মত বলে চলত।

"ভগবান বলাছে, একদিন আমি ফিরে জন্ম নিব হে! হোলির আগুন জ্বালায়ে আগুনে-আগুনে করা দিব বুন্দু, তামার, সিংভূম, কেওনঝাড়, গাংপুর আর বাসিয়া। সোনপুরে ধূলার আঁধি উঠাব। বানো থানার কারকোটা গ্রামের পাহাড়ের উপরে, রেশমপোকা ডিম দিয়াছে। আমার কথা ছড়ায়ে যাবে। মার্‌ কোড়া শালো! মেরা মেরা লৌ ঝরায়ে দে। আমরা বিরসাইত। মরণে মোরা ডরাই না। যারা বিরসাইত নয় তারা মরতে ডরায়। হা দেখ্‌ শালো। বিরসা যেদিন ঝড়বাদলের রাতে বন হতে ধরতি-আবা হয়া বেরাল, সেদিন বলাছিল—হা আমি তোমাদের ভগবান! কিন্তু কোলে তুলা দুলাব ভুলাব তেমন ভগবান লইরে। আমি তোদের শিখাব। হাঁ রে শালোরা, বলাছিল সে! মার, তোদের কোড়া, মেরা মার্যে ফেলা।"

শুনতে শুনতে আমি শুদ্ধশুচি হয়ে যেতাম। ওরা বলত, "কত মারতে পারিস? জানিস না? সেদিনই ভগবান গার্ডরে বলাছে, আজ তুমি মোরে পাহারা দাও, একদিন দেখবা দেশের মাটি লয়ে আমি কি করি? জাঁতায় যেমন বাজরা পিষে, তেমন করে মাটিরে পিষব। গোঁড়ালি যেমন ভাজে, তেমন করা আগুনে ভাজব। দেশ খান্‌খান্‌ হয়া যাক,

আমি দখল ছাড়ব না। আমার সহায় বাহান্ন কিল্লার ছোটনাগপুরের দুশমনদের আমি তাড়ায়ে ফিরব, নাশ করব। কারেও ছাড়ব না আমি। কাঁপায়ে দিব দেশ। হাঁরে শালো ভগবান বলাছে। তবে মার্ মোদের, কত মারবি?"

বিরসা! মুণ্ডাদের এই মনের জোর, এই তোমাতে বিশ্বাস, এই দেখে, এই জেনে তোমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টায়। তখন কারা ঠিক করেছিল তোমার যদি বিচারাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাই সবচেয়ে ভাল—তা আমি জানি না।

জানতে ভয় করে বিরসা। যখন তুমি সলিটারি সেলে ঘুরছ শেকল টেনে টেনে, তখনি কোথাও ঠিক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মুণ্ডাকে খালাস করা হোক, কেননা ওদের সাক্ষ্য জেরার মুখে উড়ে যাবে—তখনি কোথাও ঠিক হয়ে যাচ্ছে তুমি এশিয়াটিক কলেরায় হঠাৎ মারা গেলে সরকারের সবদিক বজায় থাকে। ভাবতে ভয় করে। কেননা মনে হয় তাহলে পৃথিবী-চাঁদ-সূর্য-সব মিথ্যে। ভাবতে ভয় করে, যখন তুমি জীবিত, ৯ই জুন সকালে, তখন কোথাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল তোমার ডেথ রিপোর্ট কিভাবে লেখা হবে।

তোমার মৃত্যুর রহস্য নিয়ে প্রশ্ন জাগুক, প্রতিবাদ উঠুক, তাই চেয়ে চেয়ে আমি অনেক পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকেছিলাম।

শুনেছিলাম, কমিশনার—ডি. সি.—পুলিশ-সুপার—জেল-সুপার সবাই খুব খুশি। ইউরোপীয়ান ক্লাবে নাকি প্রচুর মদ খাওয়া হয়েছে। ডি. সি. বলেছেন, তাঁর সর্বদা ভয় ছিল, বিরসার মুখোমুখি দাঁড় করালে মুণ্ডারা ওর বিরুদ্ধে যে-যা বলেছে সব ফিরিয়ে নেবে।

সে বিচারের জন্যে কত যে আয়োজন!

রাঁচিতে বিরসাইতদের বিচার করার জন্যে জে. এ. প্ল্যাটেলকে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়।

রাঁচির ডি. সি.-র বেলা বলা হয়েছিল তিনি যেন বিচার না করেন। তাহলে কোর্ট অফ আপীল আপত্তি জানাবে। ডি. সি. তো নিজে জড়িত—তিনি বিচার করলে তা আইনসম্মত হয় না।

অথচ সিংভূমের বেলা কানুন উলটে গেল। রাঁচির ডি. সি. স্ট্রীট্‌ফিল্ড যদি নিজে জড়িত থেকে থাকেন, সিংভূমের ডি. সি. ডব্ল্যু. বি. টমসনও বিদ্রোহীদের ধরেছেন। অথচ সিংভূমে বিচারের ভার পেলেন তিনি।

১৮৯৯-এর ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ১৯০০ সালের ৭ই জানুআরি অব্দি যা যা ঘটে তা নিয়ে গোটা পনেরো কেস দাঁড় করানো হয়। এতকেদিতে বে-আইনী সমাবেশ ও কন্‌স্টেবল্‌দের হত্যা—জামরিতে জয়পাল সিং নাগের বাড়ি জ্বালানো,—সারোয়াডোয় দুটি মিশন বাড়ি আক্রমণ—ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ও খুনজখম ঘটিয়ে বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করে বিরসা রাজ কায়েম করার উদ্দেশ্যে বিরসার প্রধান শিষ্যদের বে-আইনী সমাবেশ—এগুলি হল তার মধ্যে প্রধান।

সিংভূমে দুটি কেসকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটি হল চক্রধরপুর কন্‌স্টেবল্ হত্যা,—আরেকটি হল কুন্দুগুটুর জার্মান মিশন জ্বালানো। সৈল্‌রাকাবে বে-আইনী সমাবেশের জন্য কোনো কেস হয়নি। মুণ্ডাদের কাছে সৈল্‌রাকাব যত গুরুত্বপূর্ণ

হোক, সরকারের বিচার বুদ্ধি অন্যরকম। সরকারের কাছে খুন্‌টি থানা আক্রমণ সৈল্‌রাকাবের চেয়ে বড় ঘটনা। সৈল্‌রাকাবকে কেসে টেনে আনলে সেখানকার "রক্তস্নান" বড় বেশি লোকের চোখে পড়বে।

তাছাড়া দেখা যাচ্ছিল, আদালতে বিরসা ও বিরসাইতদের রাজদ্রোহিতার অপরাধে দাঁড় করানো কঠিন। সাক্ষ্যপ্রমাণের নথি পাহাড়প্রমাণ, কিন্তু তাতে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য তথ্য তেমন নেই।

মে মাস থেকেই তোমরা আদালতে যেতে আসতে থাক বিরসা। জেকব তোমাদের হয়ে লড়তে থাকেন কিন্তু সমানে সরকার বলতে থাকে—সময় দেয়া হোক। এখনো প্রমাণ যোগাড় শেষ হয়নি। তাই তোমাদের যাওয়া-আসাই সার হয়। আর বিচারাধীন অবস্থায় মুণ্ডারা মরতে থাকে, মরতেই থাকে। কিন্তু বিচারাধীন মুণ্ডাদের মাঝে-মাঝে মৃত্যু এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয় যে সে-জন্য সরকার মুণ্ডাদের "নাকাল ও হয়রানি করে মনোবল ভেঙে দেবার নীতি" পাল্টাবে।

বিচারের সময়ে রাঁচিতে এক কোম্পানী মিলিটারি পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়। "যতদিন না জেহলাজতভুক্ত বন্দীদের বিরুদ্ধে দায়েরীকৃত বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তি হইতেছে, বিদ্রোহের মনোভাব সম্পূর্ণ শান্ত হইতেছে, ততদিন তাহারা মোতায়েন থাকিবেক।"

"বিরসা, বিরসা, নিজেকে তুমি যত গুরুত্ব দিয়েছিলে, ভারত সরকারও সমান গুরুত্বই দিয়েছিল তোমাকে! বুঝতে পারছ?"

রাঁচিতে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস সরগরম করেন জেকব। তিনি তোমাদের কাউন্‌সেল। সর্দারদের পুরানো বন্ধু তিনি। কলকাতায় ব্যারিস্টারী করে পয়সা কামান, আর মুণ্ডাদের পক্ষ হয়ে লড়ে যান বিনে পয়সায়।

ওঁর নির্ভীক ডিফেন্‌স আর অসামান্য জেরার মুখে সরকারের সাক্ষীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

কলকাতার "দি বেঙ্গলী" আর "দি স্টেট্‌সম্যান" কাগজ জেকব বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখতে থাকে—তাঁর সহানুভূতি পক্ষপাতী, আর সেজন্য যখন লড়েন, তখন মরণ পণ করে লড়েন। সৎ ও বিবেকী তিনি, লক্ষ্য স্থির। ওঁর মতো লোককে পেয়েছে এ মুণ্ডাদের সৌভাগ্য।

"হ্যাঁ বিরসা, আমি রিপোর্ট পাঠাতাম জেকবকে, লুকিয়ে। উনি সে খবর চাউর করতেন। সুরেন ব্যানার্জির আগ্রহ ছিল। "দি বেঙ্গলী" তোমাদের খবর ছাপত।

সুবিচার হোক, মুণ্ডারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোক পাক, এ নিয়ে প্রবল জনমতের চাপ এসেছিল।

বলা হয়েছিল, মানে খবর বেরিয়ে পড়েছিল, কেসের টাকা তোলার জন্যে সমদরদী মুণ্ডাদের জমায়েত ভেঙে দেয় পুলিশ, টাকা কেড়ে নেয়।

খবর বেরোয়, জেল অথরিটির প্রতি দরদ দেখিয়ে সরকার আইনবিরোধীভাবে জেলেই বিচার সেরে দিতে চাইছেন।

আসামীদের কথা বলতে কেউ নেই। স্থানীয় উকিলদের সাহায্য তারা পাচ্ছে না।

যে অপরাধ তারা করেনি, তার জন্য তারা দীর্ঘদিন হাজতবন্দী এ চিন্তা ভয়াবহ।

একজন কন্‌স্টেবল্‌ হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর পুলিশ আসামীদের ডিফেন্‌সে বাধা সৃষ্টি করেছে। এগুলো "স্টেট্‌সম্যানের" খবর।

ডি. সি. স্ট্রীট্‌ফিল্‌ড-এর জবাবে 'দি স্টেট্‌সম্যান কাগজে সম্পাদককে চিঠি লেখেন, "মহাশয়, আপনার সংবাদদাতার খবরগুলি মিথ্যা। প্রতিটি অভিযোগ আমি অস্বীকার করছি। আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ আসামীদের দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই সে কথা আমি মানছি। ওদের জেলে রাখা হয়েছে সাবধানতামূলক ব্যবস্থার জন্য। কেননা গোলমাল তো লেগেই আছে। কর্তৃপক্ষ জমিদারদের সঙ্গে এককাট্টা, এ হল নীতিজ্ঞানহীন হল্লাবাজদের অভিসন্ধিপূর্ণ কথা।"

"দি স্টেট্‌সম্যান" কাগজের চিঠির তারিখ ছিল ৩রা এপ্রিল, ১৯০০ সাল। সেদিনই "আমাদের সংবাদদাতার উত্তর' সহ চিঠিটি বেরোয়। "দি স্টেট্‌সম্যান"-এর সংবাদদাতা লেখেন, এর কোনো কথাই মানা চলে না। আত্মপক্ষ সমর্থনের সব সুযোগ মুণ্ডাদের দেওয়া হয়েছে, এ কথা "চূড়ান্ত মিথ্যা।"

বিচার যে কিভাবে চলতে থাকে বিরসা! কেস চলতে চলতেই পরের দিকে প্ল্যাটেলকে পাঠানো হয় ফরিদপুরে। স্ট্র্যাচেন কুটস শেষ অব্দি বিচার চালান।

সেই একদিনের কথা মনে পড়ে বিরসা?

১৯০০ সালের ষোলোই মে। ২১৭ জনের মধ্যে তিনজনের জামিনের জন্য জেকব দাবী জানান।

বলেন, "ওদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আছে শুধু ডি. সি. স্ট্রীট্‌ফিল্‌ডের একটি রিপোর্ট, যে ওরা বিদ্রোহে জড়িত বলে অনুমান। ওদের বিরুদ্ধে কোনো একদিন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে বলে ওদের দীর্ঘদিন হাজতে রাখা হয়েছে। বহু বিচারাধীন বন্দী জেলে মারা গেছে।"

জেকবের কথার উত্তরে চলে বাক্‌যুদ্ধ।

জেকব ঃ আমি জানতে চাই ১১২ নং ফৌজদারী কার্যবিধি আইন মতে আমার মক্কেলরা কোনোদিন কোর্টে আসার নোটিশ পেয়েছিল কি?' এ তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এদের মধ্যে বহুজন মারা গেছে। এরা জানে না পাঁচমাস এদের কোন্‌ অপরাধে নির্বান্ধবে, উকিল-ছাড়া অবস্থায় কয়েদ করে রাখা হয়েছে। ওদের প্রতিনিধি হিসাবে আমার সে কথা জানতে চাওয়ার অধিকার আছে। সম্মানিত হুজুরকে আমি সে কথা জানাতে বলছি।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আপনাকে সে কথা জানানোর জন্যে আমি এখানে আসিনি।

জেকব ঃ সেকি! আমাদের মক্কেলদের কোন্‌ অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাও বলবেন না? যাতে, আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি ওদের সাহায্য করতে পারি?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ মক্কেলদের কাছেই সে কথা শুনুন।

জেকব ঃ তারা তো সে কথা জানেই না। কেন ওদের ধরে রেখেছেন তা যদি আমাকে

না বলেন তাহলে বিচারের স্বার্থে আমাকে অন্যত্র আপীল করতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ যা ইচ্ছে করতে পারেন।

জেকব ঃ এই দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসের আগে বন্দীদের আদালতে একজামিন করা হয়েছিল কি না তা জানবার অধিকার আমার আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সেটা কোনো প্রশ্নই নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আপনার মক্কেল কারা?

জেকব ঃ এই যে তাদের নামের তালিকা।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আচ্ছা বেশ। প্রথম আসামী চাঁদ মুণ্ডার বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।

জেকব ঃ তাহলে তাকে জামিনে খালাস করতে পারি?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ রেকর্ড দেখছি আমার পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট ৭ই এপ্রিল, একটি অর্ডার দেন তাতে একশো টাকা দিলে ওর জামিনে অধিকার মঞ্জুর করেন, এর এবং সকলেরই।

জেকব ঃ সেকি! অপরাধের গুরুত্ব যার যাই হোক, সকলের একই শর্তে জামিন মঞ্জুর?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ঠিক তাই।

জেকব ঃ এ অর্ডারের কথা ওদের জানানো হয়েছে কিনা জিগ্যেস করতে পারি?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ তা আমি জানি না।

জেকব ঃ রেকর্ডে সে কথা লেখা তো থাকবে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ না।

জেকব ঃ এ যে তাজ্জব কথা হল।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ এ যে তাজ্জব কেস।

জেকব ঃ খুবই তাজ্জব। হুজুর কি জামিনের অর্ডার কনফার্ম করছেন?

ইন্‌স্পেক্টর অফ পুলিস ঃ হুজুর, আমার একটা আর্জি দাখিল করছি। আমার আবেদন, বন্দীদের ৬৭ জনের বিরুদ্ধে খুন, খুনে সহায়তা ও অন্যান্য চার্জ আনা হোক।

জেকব ঃ সেকি? এখন? এই যে ঘোর অন্যায়। ৭ই এপ্রিল আমার মক্কেলরা যদি জানতে পেত তারা জামিন পেতে পারে, তারা আজ জেলে থাকত না। তা ছাড়াও এদের বিরুদ্ধে চার্জ আনতে পুলিশের পাঁচ মাস লেগে গেল এ গর্হিত অন্যায়।

ইন্‌স্পেক্টর ঃ হুজুর যদি কাল অব্দি সময় দেন, আরও ক'জনের বিরুদ্ধে হয়তো একই চার্জ আনতে পারব।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ কি বলেন, মিঃ জেকব?

জেকব ঃ আমি শুধু এই বলব, এসব কাণ্ড আমাকে অবাক করে দিচ্ছে। যারা হয়তো একেবারে নিরাপরাধ, তাদের বিরুদ্ধে চার্জ আনতে পাঁচ মাস। তারাই জেলে পচছে। আরও অবাক কাণ্ড হল, এখন পুলিশ আর্জি দিচ্ছে অন্যদের বিরুদ্ধে চার্জ বানাতে একটা দিন চাই। বানাতে—আমি বলছি 'বানাতে'। তাহলে কি আপনি মিঃ প্ল্যাটেলের অর্ডার

সংশোধন করবেন? আপনি তা পারেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ কেন? আপনিই তো সে অর্ডারের রিভিউ চাইলেন।

জেকব ঃ কখনোই না। আমি তা বলিনি। ৭ই এপ্রিল আমার মক্কেলরা জামিনে খালাস পেতে পারত তা জানতাম না। তাই বলছি এখন ওদের জামিন চাই সেই অর্ডার কার্যকরী করা হোক।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ওই ৬৭ জন তো জামিন কোনোমতেই পাবে না। অন্যদের বিষয়ে ইন্‌স্পেক্‌টর কি বললেন তা তো শুনেছেন।

জেকব ঃ তাদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কোনো চার্জ নেই। তবে কেন তাদের ধরে রাখা হবে? আমি বলছি, ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত অবমাননা করা হয়েছে। চূড়ান্ত অবমাননা। এখানে ২১৭ জন বন্দী আছে প্রায় পাঁচ মাস যাবৎ। কি অপরাধে তা তাদের জানানো হয়নি। এই মাত্র, আজই, হঠাৎ একটা পুলিস আর্জির ভিত্তিতে তাদের জামিন অযোগ্য অপরাধে দোষী করা হল।

এই হতভাগ্যদের মধ্যে ৯৩ জন আমার মক্কেল। কিন্তু কি ঘোর অন্যায়! তাদের মধ্যে ৬৭ জনকে আজ যে অপরাধে অভিযুক্ত করা হল তা মেনেও নিই যদি, তবু দাবী জানাচ্ছি—ওদের বিরুদ্ধে কি কি সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে তা আমাকে জানানো হোক। যাতে ওদের জামিনে খালাস করার জন্যে আপীল করতে পারি।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ পুলিশের আর্জি পেয়েই আমি হুকুম দিয়েছি। ওই যে, ৬৭ জন অভিযুক্ত, তারা জামিন পাবে না। বাকী রইল যারা, তাদের নাম, তাদের গ্রামের নাম, সব দিলে পরে শুধু তাদের জামিনের কথা বিবেচনা করব।

জেকব ঃ কিন্তু সম্মানিত হুজুর, ওই ৬৭ জনের মুক্তির বিষয়ে আমার বক্তব্য আপনাকে শুনতে হবেই। যদিও ওদের এখন জামিনের অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হল।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আরে! বললাম না ওদের বিষয়ে হুকুমজারী করে দিয়েছি। অন্য লোকগুলোর নাম, গ্রামের নাম দিন আমাকে। ওদের আবার এক রকম নামই সব!

জেকব ঃ গ্রামগুলোর নাম পেতে কিছু সময় লাগবে। সেকাজ চলতে থাকুক, কিন্তু আমি আবার বলছি—যে ৬৭ জনকে পুলিশ এখনি চার্জ করল, তাদের জামিনের বিষয়ে আমার বক্তব্য আপনাকে শুনতেই হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ও বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।

জেকব ঃ কিন্তু ফৌজদারী কার্যবিধি আইন ৪৯৭ ধারা মতে আমি, "আমার বক্তব্য আদালত শুনুন," এ দাবী জানাচ্ছি। সেই ধারায়, আমি পড়ছি, আপনি শুনুন—"কোনো ব্যক্তি জামিন-অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক বিনা ওয়ারেন্টে আটক বা আদালতে নীত হইলে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে। যে অপরাধে সে অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসাধ্য কারণ থাকিলে তবে সে জামিন পাইবে না।"

পরের প্যারায় বলা হচ্ছে,—"এইরূপ অফিসার বা আদালতের নিকট তদন্ত বা বিচার

চলিবার কালে যদি মনে হয় যে আসামী জামিন-অযোগ্য অপরাধ করিয়াছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই কিন্তু তাহার অপরাধ সম্বন্ধে আরও তদন্ত করা প্রয়োজন তবে এইরূপ তদন্ত সাপেক্ষ আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে।"

"অতএব হুজুর, পুলিশ এখন যে ৬৭ জনকে চার্জ করল, তাদের বিরুদ্ধে আনীত অপরাধগুলি যদিও জামিন-অযোগ্য, তবু তাদের জামিনে খালাসপ্রাপ্তি বিষয়ে আমার বক্তব্য শোনা হোক এ দাবী আমি জানাচ্ছি।"

কথাবার্তা যখন এতদূর এগিয়েছে, তখন ডি. সি. স্ট্রীট্‌ফিল্‌ড (যিনি শুনানী-চলাকালে এক সংলগ্ন কামরায় বসেছিলেন) হঠাৎ এজলাসে ঢুকে পড়লেন, ও ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে কথা কইলেন। তাঁর কথা শেষ হলে এজলাসের উদ্দেশে মিঃ জেকব কথা বললেন।

জেকব ঃ আইনের যে ধারাটি পড়ে শোনালাম, তা অনুযায়ী আমার কথা শুনবেন কি?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত তো নিয়ে নিয়েছি।

জেকব ঃ কিন্তু কোন্ যুক্তিসংগত কারণে আপনি আমার কথা শুনতে অস্বীকার করছেন?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ যুক্তিসংগত কারণ না থাকলে তো ওরা অভিযুক্তই হত না।

জেকব ঃ শুধু সেইজন্যে আমার কথা শুনবেন না? এই একমাত্র যুক্তিতে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ পুলিশের আর্জিও আছে, পড়ে দেখতে পারেন।

জেকব ঃ ধন্যবাদ। আমার কথা শুনতে আপনার নারাজ হবার মতো কোনো যুক্তিসংগত কারণ দর্শায় এমন কিছু আর্জিতে নেই। এতে শুধু বলা হয়েছে বন্দীদের ৬৭ জনের নামকে যেন জামিন-অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। আমি আরও আবেদন জানাচ্ছি, ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১০৭-১০৮-১০৯-১১ ধারা মতে এদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নাকচ করা হোক। ওই চারটি ধারা মতে আসামীকে যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৎভাবে থাকার অঙ্গীকারযুক্ত জামিন মুচলেকা দানের আদেশ দিতে পারেন—(পুলিশ হ্যান্ডবুক ৮৩-৮৪ পৃঃ) আমি জানি না কখন ওদের অভিযুক্ত করা হল, জানি না এই নতুন অভিযোগে ওদের কারাবন্দী রাখা চলে কি না। পুলিশ খুব চালাকি দেখাল বটে কিন্তু তা ভেস্তে গেল। এদেশে কোথাও কোথাও আইন আছে, বিচার আছে। এই ৬৭ জনের অপরাধে বিশ্বাস করার কি যুক্তিসংগত কারণ আছে, মহামান্য হুজুর তা আমাকে বলবেন কি?

ম্যাডিস্ট্রেট ঃ আমি তো আপনাকে বলেছি, যুক্তিসংগত কারণ না থাকলে পুলিশ ওদের সোপর্দ করত না।

জেকব ঃ এই কি আপনার একমাত্র কারণ? অভিযুক্ত ৬৭ জনের অপরাধে বিশ্বাস জন্মায় এমন একটি কথাও পুলিশের এ আর্জিতে নেই। কতকগুলো অপরাধে ওদের দায়ী করা হয়েছে ও ওদের আরও হাজতে রাখার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। কোথায় সেই যুক্তিসঙ্গত কারণ যাতে আপনি আমার কথা শুনবেন না বলে প্রভাবিত হলেন। ওদের বিরুদ্ধে তিলমাত্র সাক্ষ্য কি রেকর্ডে আছে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ হ্যাঁ।

জেকব ঃ কার সাক্ষ্য?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ তা আপনাকে এখনি বলতে আমি বাধ্য নই।

জেকব ঃ কিন্তু আমি বলছি, আপনি বাধ্য। ওদের মুক্তির অপরাধের গুরুত্ব বিষয় কি কি 'যুক্তিসংগত কারণ" রেকর্ড করা হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ অন্যদের বিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে কি?

জেকব ঃ তাহলে এই ৬৭ জনের অপরাধে আপনার বিশ্বাসের যুক্তিসংগত কারণ কি, তা আমাকে বলবেন না?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সাক্ষ্যের রেকর্ড আছে।

জেকব ঃ এ এক নতুন খবর জানলাম। আসামীরা কেউ এর অস্তিত্ব জানে কি? কি সে সাক্ষ্য? জানার অধিকার আছে আমার।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আইন মতে দরখাস্ত দিন। সাক্ষ্য আছে।

জেকব ঃ আমি বলছি, সে সাক্ষ্যের মোদ্দা কথা জানার অধিকার আমার আছে। এখনি আমি সার্টিফায়েড কপি চেয়ে দরখাস্ত দিচ্ছি।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ দিন দরখাস্ত। এক মিনিট দাঁড়ান। (এক মিনিট বাদে আদালতের পিয়নের হাতে তিনি একটি চিরকুট পাঠালেন মিঃ স্ট্রীট্‌ফিল্‌ডকে) হ্যাঁ, বলুন মিঃ জেকব।

জেকব ঃ যে ৬৭ জনকে এখন অভিযুক্ত করা হল, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের বক্তব্যটা আমাকে জানতে দেবেন মশাই? (আবার বাধা পড়ল) কোর্টপিওন ফিরে এল একটি চিরকুট নিয়ে। ম্যাজিস্ট্রেট সেটি পড়তে থাকলেন।)

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ শেষে কি বললেন, শুনতে পাইনি।

জেকব ঃ বলছিলাম, যেসব যুক্তিসঙ্গত কারণে আপনার বিশ্বাস জন্মেছে ওই ৬৭ জন দোষী, তার সারমর্মটা আমায় জানান্।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ডেপুটি কমিশনার মিঃ স্ট্রীট্‌ফিল্‌ড হলফ করে এক জবানবন্দী দিয়েছেন, সেটি আছে।

জেকব ঃ কখন দিলেন?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ যখন কপি পাবেন তখন জানবেন।

জেকব ঃ বেশ! উকিলবাবু, দরখাস্ত তৈরি করুন।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ও ৬৭ জনের বিষয়ে আর কিছু শুনতে আমি নারাজ। আপনার তালিকা তৈরি?

জেকব ঃ তাহলে আমি এই ধরে নেব, যে ২১৭ জন হতভাগ্য গত পাঁচ মাস জেলে আছে তারা ডেপুটি কমিশনারের হলফ করা জবানবন্দীর ভিত্তিতেই কয়েদ হয়েছে? আমার ৯৩ জন মক্কেলের গ্রামের নাম জানতে চেয়েছেন আপনি। গ্রাম অসংখ্য, এবং দূরে দূরে অবস্থিত। যে অপরাধ ওরা করেছে বলে ধরা হচ্ছে, যে জন্য ওরা পাঁচ মাস জেলে আছে, ডেপুটি কমিশনার কি ২১৭ জনকে সে অপরাধ করতে দেখেছেন? জবানবন্দীতে তাই বলেছেন হলফ করে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আমি পুলিশের আর্জির ওপর অর্ডার দিয়েছি। ও ৬৭ জন জামিন পাবে না।

(এখন ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হল যে কেসগুলি তাঁর ফাইলেই নেই।

ডেপুটি কমিশনার তো পাশের ঘরেই বসেছিলেন। তাই এ ত্রুটি নিমেষে শুধরে নেওয়া হল।)

জেকব ঃ তাহলে আমি কি ধরে নেব, পুলিশ আজ যে ৬৭ জনকে চার্জ করল তারা বাদে অন্য সবাই, (সবাই আবার আমার মক্কেলও নয়) জামিন পেতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আমি পুলিসের কাছে জেনে নিই ওদের বিরুদ্ধে কোন চার্জ আছে কি না।

মিঃ জেকবের লিস্টে যাদের নাম আছে, আজ যাদের নতুন চার্জ দেওয়া হল, সকলের নাম ম্যাজিস্ট্রেট ও ইন্স্পেক্টর খুঁটিয়ে দেখলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ (মিঃ জেকবকে) যারা জামিন পেতে পারে এই যে তাদের নামের লিস্ট। তাদের প্রত্যেককে একশো টাকার মুচলেকা দিতে হবে।

জেকব ঃ প্রত্যেকের আর্জির গুরুত্ব তুচ্ছ করে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ঠিক বলেছেন।

জেকব ঃ জামিনের টাকা কমানোর ব্যাপারে আমার বক্তব্য আপনি শুনবেন না?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আমার পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট জামিনের টাকা ঠিক করে গেছেন।

জেকব ঃ তাহলে আমি বলব হুজুর, আমার মক্কেলদের বিরুদ্ধে এজলাসের কার্যকলাপ একেবারে বে-আইনী হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১০২ ধারা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, "১০৭-১০৮-১০৯-১১০ ধারায় কার্যকরী কোনো ম্যাজিস্ট্রেট যখন উক্ত ধারা মতে কোনো ব্যক্তিকে জামিন দেওয়া দরকার মনে করেন, তিনি এক লিখিত অর্ডার দেবেন ('দেবেন' শব্দটি লক্ষ্য করুন)। তাতে বিশদ লিখবেন প্রাপ্ত খবরের সারমর্ম, কত টাকার জামিন, কতদিন এ জামিন কার্যকরী থাকছে, জামিননামার সংখ্যা-ধরন-শ্রেণী কি।" আমার মক্কেলদের পাঁচ মাস হাজতবাস কালে কারো বিষয়ে কখনো এ অর্ডার দেওয়া হয়েছে কি?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ রেকর্ড কিছু নেই।

জেকব ঃ তাহলে কি ধরে নেব সরকার নির্দেশিত কার্যবিধি এ কেসে অবলম্বন করা হয়নি?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আমার পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট কি করেছেন, কি করেননি সে বিষয়ে আমি অনবহিত। আপনি যে সব নিয়মের কথা বলেছেন, তা মানা হয়েছে কি না তার কোনো রেকর্ড নেই। ধরে নিচ্ছি, মানা হয়েছে।

জেকব ঃ কিন্তু নিয়মানুযায়ী কাজ হয়ে থাকলে তার কিছু রেকর্ড থাকত?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ কোনো রেকর্ড নেই।

জেকব ঃ অত্যাশ্চর্য! মিঃ প্ল্যাটেলের মতো একজন ম্যাজিস্ট্রেট। এ কেসের পক্ষে তাঁর বদলী হওয়া খুব দুর্ভাগ্যের হয়েছে। তাহলে কি ধরে নেব নিয়মমাফিক কাজ হয়নি?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আমি জানি না।

জেকব ঃ তাহলে আমার অবস্থা কি দাঁড়াল?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আমি জানি না। হয়তো কোনো ভুল হয়ে থাকতে পারে, অবশ্য আমি বলছি না ভুলই হয়েছে।

জেকব ঃ ভুল? পুলিশ ওদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কেস খাড়া করবে বলে আমার মক্কেলরা হাজতে? ঘটনাপরম্পরার যোগাযোগ বেজায় আজব! পাঁচ মাস ওরা জেলে পচল। তারপর ওদের পক্ষ সমর্থনে আমি আজ এসেছি বলে কিজন্যে বেচারারা জেলে পচছে পুলিশ তা আজই আবিষ্কার করতে পারল্। দেখছি ডেপুটি কমিশনারও এখন শহর থেকে ফিরে এসেছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ দয়া করে নিজের কেসের কথাই বলুন।

জেকব ঃ আমি বলব, ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে ১৭৭ ধারা মতে এই ৬৭ জনকে এজলাসে হাজির করা হোক। তাদের অপরাধ কি, তা বুঝিয়ে দেওয়া হোক।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ অহ্।

জেকব ঃ ওদের বিরুদ্ধে যে চার্জ আনা হয়েছে তার সত্যতা যাচাই করার জন্য ওদের এজলাসে আনবার হুকুম অব্দি আপনি দেবেন না?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ঠিক বলেছেন।

জেকব ঃ কোন্ আইনের কোন্ ধারা মতে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আপনার বাকি মক্কেলদের কথা বলুন। আমার আরও আরও কেস বিচার করতে হবে।

জেকব ঃ জামিনের টাকা কমানো বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সে-বিষয়ে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।

জেকব ঃ আপনি বলছেন, জামিন ধার্য করবেন মিঃ প্ল্যাটেল্?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ হ্যাঁ।

জেকব ঃ কিন্তু কোন্ ধারা মতে? বন্দীদের কোন্ অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আমি শুধু এই জানি। রেকর্ড দেখা যাচ্ছে আদালতই জামিন ধার্য করেছিল।

জেকব ঃ ১২২ এবং ১১৫ ধারা মতে ওদের ওপর কোনো নোটিস জারি করা হয়েছিল কি?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আমি তা জানি না।

জেকব ঃ আমাকে দয়া করে রেকর্ড দেখতে দেবেন কি? কি সাক্ষ্য আছে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ কোনো সাক্ষ্য নেই।

জেকব ঃ ওদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকেই ওদের টানা পাঁচ মাস হাজতে রাখা হয়েছে। বলুন, তাই হয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ওদের কেস ওঠেনি এখনো।

জেকব ঃ ওঠেনি? ওদের কি এর আগে একবারও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সে আমি বলতে পারি না।

জেকব ঃ রেকর্ড দেখে নিশ্চয় তা জানা যাবে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ না, যাবে না। তবে ধরে নিচ্ছি হাজির করা হয়েছিল। কেননা জামিন দেবার হুকুম আছে।

জেকব ঃ কে জামিন ধার্য করে? আদালত, না পুলিশ?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ওটা মিঃ প্ল্যাটেলের অর্ডার।

জেকব ঃ শুধু ওই কথাটুকু আছে রেকর্ডে?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আপনাকে ত বলেছি, কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ রেকর্ড করা হয়নি।

জেকব ঃ এখন পুলিশ যাদের অভিযুক্ত করল, সেই ৬৭ জনের জামিন বিষয়ে আদালত তবে আমার বক্তব্য শুনবে না?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সে-বিষয়ে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি আমি।

জেকব ঃ কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, যে সংবাদের ভিত্তিতে অ্যাকশন নেওয়া হল, সে সংবাদের সত্যতা নিরুপণ করতে ১১৭ ধারা মতে আপনি বাধ্য। পাঁচ মাস ওদের জেলে রাখা হবে, ওদের বিরুদ্ধে আনীত সংবাদ সত্যি মিথ্যে তা যাচাই অব্দি করা হবে না, এ ঘোর অন্যায়। কেন, গতকালই ত পাঁচ মাস বাদে ৪৫ জনকে হাজত থেকে খালাস দেওয়া হল? এরাও ত নির্দোষ প্রমাণিত হতে পারে? তবু পাঁচ মাস ওদের জেলে পুরে রাখা হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ বুঝতে পারছি না কি বলতে চাইছেন।

জেকব ঃ এই ৬৭ জনের জামিন বিষয়ে আমার বক্তব্য আপনাকে শুনতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ওহ্।

জেকব ঃ এরা যতদিন ধরে জেলে আছে তার মধ্যে ওদের ওপর ১০৭-১১২-১১৫-১১৭ ধারা মতে কোনো নোটিশ জারি করা হয়েছে কখনো?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ তা বলতে পারি না।

জেকব ঃ ১০৭ ধারা মতে "নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য" রেকর্ড করা হয়েছে, রেকর্ডে তার কোনো নজির আছে কি? তা না হয়ে থাকলে এদের ধরে রাখা সম্পূর্ণ বে-আইনী হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ওহ্।

জেকব ঃ এ এক অত্যাশ্চর্য কেস।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ হ্যাঁ।

জেকব ঃ যে কার্যবিধি অবলম্বন করা হয়েছে তাও অত্যাশ্চর্য।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ওহ্।

জেকব ঃ যে ৬৭ জনকে এখনি এই প্রথম অভিযুক্ত করা হল, তাদের কথা শুনতে তো আপনি নারাজ। যাদের জামিননামা রেখে ছেড়ে দিতে রাজী আছেন, তাদের ধার্য জামিন হ্রাসের বিষয়ে আমার বক্তব্য শুনবেন? মাথা পিছু ১০০ টাকা মানে ৩৩০০ টাকা। এ টাকা জোগাড় করা অসম্ভব। এ অর্ডারের মানে দাঁড়ায়, কাউকেই ছাড়া হবে না। এ একেবারে সাধ্যাতীত জামিন। জামিন হ্রাস বিষয়ে আদালত আমার কথা শুনবেন কি?

জামিনের ব্যাপারটি পুরোপুরিই আদালতের বিবেচনাসাপেক্ষ। এটি এত বেশি হতে পারে না।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ যে অর্ডারের রেকর্ড আছে তাতে হস্তক্ষেপ করতে আমি নারাজ।

জেকব ঃ অতীব অদ্ভুত কাণ্ড !

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ অদ্ভুত না অত্যদ্ভুত, তা আমি দেখতে যাচ্ছি না!

জেকব ঃ জামিন বেজায় বেশি। আপনি কি ওদের আদালতে আনতে পারেন না? ওদের সাধ্য কি, তা জেনে নিয়ে প্রত্যেকের জামিন ধার্য করতে পারেন না? ওই ৬৭ জনের বেলা পুলিশ যা করতে পাঁচ মাস সময় নিল, তাই ওদের বেলাও করবে—এই আশাতেই ওদের জেলে পুরে রেখেছে বলে মুণ্ডাদের সন্দেহ।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ওই ৩৩ জনের জামিনের ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত আছেন?

জেকব ঃ জামিনের টাকা হ্রাস বিষয়ে আমার বক্তব্য কি আপনি শুনবেন না?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আমি অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। (অর্ডারটি পড়েন ও ইন্‌স্‌পেক্টরকে বলেন) এই ৩৩ জনের বিরুদ্ধে আপনার কোনো অভিযোগ আছে?

ইন্‌স্‌পেক্টর ঃ এখনও নেই বটে, তবে হুজুর যদি আমাকে কাল অব্দি সময় দেন, আমি সেই সময়ই চেয়েছি, যদি সময় দেন, আমি রেকর্ড ঘেঁটে-ঘুঁটে দেখব ওদের কোন্ অপরাধে অভিযুক্ত করা যায়।

জেকব ঃ ঘোর অন্যায়! পৈশাচিক কাণ্ড! ৬৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জ তৈরি করতে চার মাস সময় লেগে গেল। আর বাকি ক'জনের বিরুদ্ধে যা-হয়-কিছু দাঁড় করাবার জন্য একদিন চাইছেন? (ম্যাজিস্টেটকে) আমি হুজুরকে বলছি। এ দরখাস্ত না-মঞ্জুর করুন। এমনিতেই ত নির্দোষ মানুষগুলো জেলের ভেতর মরছে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ (ইন্‌স্‌পেক্টরকে) মিঃ জেকবের লিস্‌টের সঙ্গে নিজের লিস্‌ট চেক্ করুন। আমাকে জানান, এখন যাদের চার্জ করা হল সেই ৬৭ জন কারা?

জেকব ঃ এ কি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ বুঝতে পারছেন না? ভারী দুঃখিত হলাম। তা, আপনার পথ ত খোলা রইল।

জেকব ঃ ডেপুটি কমিশনার কি বলছেন, আমি দেখতে চাই। দয়া করে আমাকে রেকর্ড দেখতে দেবেন? তার আসল কথা কি তা জানার অধিকার আমার আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সদাসর্বদা যা করা হয়, তা ছাড়া অন্যমতে আপনাকে কিছু জানতে দেবার জন্যে আদালত বসেনি। দরখাস্ত করুন, সময়মতো তা বিবেচনা করা হবে।

জেকব ঃ কথা দিয়েছি, দরখাস্ত দিচ্ছিও। কিন্তু সময় বাঁচাবার জন্যে দয়া করে ডেপুটি কমিশনারের হলফ-করা জবানবন্দীটা আমাকে এক নজর দেখতে দিন।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ দরখাস্ত দিন। আদালত এখন মুলতবী থাকল।

জেকব ঃ জামিনে হ্রাস বিষয়ে আমার বক্তব্য শুনবেন না?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সে বিষয়েও একটা দরখাস্ত দিন। ব্যাপারটা বিবেচনা করতে সময় লাগবে। আমার সিদ্ধান্ত ২২শে জানাব।

বিরসা, “বেঙ্গলী” কাগজ থেকে একদিনের ঘটনা তুলে দিলাম।

বিরসা, বিরসা, জেকবের মর্মযন্ত্রণা আমি দেখেছি। দেখেছি উনি ডাকবাংলোয় থাকেন, কোনো সাহেব ওঁর সঙ্গে কথা কয় না।

দেখেছি উনি মাঝে মাঝে কলকাতা চলে যাচ্ছেন। আইনের বই আর ফাইল নিয়ে ফিরে আসছেন। ভীষণ জেদে লড়ে চলেছেন।

আমাকে বলতেন, 'অলরাইট, অলরাইট, বিরসা তোমার বন্ধু, তুমি খুব বিচলিত। কিন্তু ট্রাই টু আন্‌ডারস্ট্যান্ড দিস্, মাই বয়!'

আমি বলতাম, 'কি?'

'বিরসা ভগবান, মুণ্ডাদের মুক্তিদাতা, বিরসা যোদ্ধা, বিরসাকে নিয়ে হাজারটা লোকগীতি, বিরসাকে মনে রেখে মুণ্ডারা জেলে অত্যাচার সইছে।'

'হ্যাঁ।'

'ও যতদিন ছাড়া ছিল তদ্দিন ব্রিটিশ বুরোক্রেসী ওকে ভয় পেয়েছে। কিন্তু জেলে ঢোকবার পর বিরসা ওদের কাছে কি?'

'বিরসা ত মারা গেছে।'

'না না, ওর শরীর মারা গেছে কিন্তু ওর আদর্শ মুণ্ডাদের মনের মধ্যে ভেরি মাচ বেঁচে আছে।'

'আপনি মুণ্ডাদের মতো কথা বলছেন।'

'চামড়ার নিচে ত হাফ মুণ্ডা হয়ে গেছি। কবে থেকে ওদের হয়ে লড়ছি।'

'তাতে মুণ্ডাদের মানে, জেলের ভেতরে ও বাইরে যারা আছে তাদের মনোবল অনেকটা ফিরেছে।'

'কিন্তু আমি যে কিছু করতে পারছি না? মাই বয়, ডোন্ট্ মেক ওয়ান মিস্‌টেক।'

'কেন এ কথা বলছেন?'

'বিরসা মাস্ট্ হ্যাভ বীন্ এ ফোর্স্। কেননা, একটা কথা বলি, যতবার মুণ্ডাদের হয়ে লড়েছি, জেনেছি আমার অসুবিধে কোথায়। মুণ্ডাদের কোনো লিখিত ভাষা নেই। ওরা আদিবাসী। চিরকাল ওদের ওপর অন্যায় করা হয়। বদমাস উকিলগুলো ওদের কেসে ফাঁসিয়ে নিঃস্ব করত। কোর্ট আইন—কীর্তিত-মহিমা ব্রিটিশ জুডিশিয়ারির সততা ওরা কিছুই বুঝত না।'

'না।'

'সেসব হ্যান্ডিক্যাপ মেনে নিয়েই কেস লড়তাম। কিন্তু কোনোবার এরকম সুপরিকল্পিত ভাবে আইনের অবমাননা দেখিনি। আমি লড়ছি বটে, কিন্তু 'দি বেঙ্গলী'র রিপোর্ট পড়ে দেখ? যেন বাতাসে তরোয়াল ঘোরাচ্ছি।'

'তাই মনে হয়।'

'এই ডেলিবারেট মিস্‌ক্যারেজ অফ জাস্টিস্ কেন? কেন সব নিয়ম অমান্য করে ওদের হাজতে রাখা? সিংভূমের লোককে রাঁচির কেসে রাঁচির লোককে সিংভূমের কেসে ফাঁসানো? কেন বিচারাধীন বন্দীদের মৃত্যু ঘটে চলেছে? না, এতেই বুঝছি বিরসা ওয়াজ এ

ফোর্স। সে বেসিক হিউম্যান রাইটগুলো চেয়ে ইংরেজকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

'দেখ, শাসক ব্রিটিশ তোমাদের এডুকেশন-প্রেস-য়ুনিভার্সিটি-রেলওয়ে দিতে পারে। তাতে তাদের স্বার্থও সিদ্ধ হয়। কিন্তু তারা তোমাদের, শাসক তোমাদের, বেসিক হিউম্যান রাইট দিতে চায় না। দিতে চাইলে তাদের যারা পিলার ছোটনাগপুরে সেই মহাজন-বেনে-জমিদার-রাজাদের স্বার্থে ঘা পড়ে।'

'আপনি কি হতাশ হয়ে পড়ছেন?'

'মোটেই না। তাছাড়া এতদিন। সরকার চটে যাবে বলে বাঙালী উকিলরা চুপ করেছিল আমার সৌভাগ্য, কলকাতার হইচইয়ে তাদের টনক নড়েছে। লোকাল বারের অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন। অবশ্য আদালতে দাঁড়াচ্ছেন না এসে। তা আমিও চাই না। দেখছ ত সরকার রাঁচি শহরে একটা সন্ত্রাসের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে? "দি বেঙ্গলী'র নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট পড়।"

আমি পড়লাম।

তাতে লেখা ছিল ঃ "আজ সকালে রাঁচি পৌছেছি। এখন রাত ৮-৩০টা বাজে। এ-পর্যন্ত মুণ্ডা'জ রায়ট প্রসিকিউশন নিয়ে যত লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, সবাই মুখ বুজে বোবা হয়ে থেকেছে। এখানে চলেছে "রেইন অফ টেরর।" এতজনকে এত মাস ধরে নিষ্ঠুরভাবে বন্দী করে রাখার পর দায়রা আদালতে তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে, তাদের কয়েদ করে রাখা ভুল হয়েছে। সে-বিষয়েও কেউ একটি কথা বলছে না। জেলে এখনো ২১৭ জন বন্দী বিচারাধীন অবস্থায় আছে। তাদের উপর যে কি জঘন্য অপরাধ ঘটেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ করা হচ্ছে মাত্র। কিন্তু কি সে অপরাধ তা এখনো আবিষ্কার করা যায়নি, সে-বিষয়ে কেউ কিছু জানেও না। রিপোর্টার হিসাবে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ত্রিশ বছর ধরে ঘুরছি। নির্ভয়ে, প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে বলব, মুণ্ডা রায়ট কেসগুলিতে যে বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, ব্রিটিশ জাস্টিসের আইডিয়ার সঙ্গে তার যেমন বিরোধ, তেমনটি আর কিছু আমার চোখে পড়েনি।

কেসগুলোর ফয়সালা হয়ে হাইকোর্টে আপীলের জন্যে যাবে। মফঃস্বলে বিচারের নামে কি চলে, জেলার প্রভুর কাছে আইনকে কিভাবে মাথা নোয়াতে হয়, তা আপনারা তখন জানতে পারবেন।

আপনারা বলেন, বেচারী বন্দীরা পচছে। গোড়ায় যাদের ধরা হয়, তাদের কতজন বন্দী অবস্থায় মারা গেছে জানতে ইচ্ছে করে। তথাকথিত রায়টে কতজনকে নির্মমভাবে গুলি করে মারা হয়েছে, জানতে পারলে আরো ভাল হত। ভগবান জানেন, কোথায় ডেপুটি কমিশনার কি রায়ট দেখেছিল, হয়তো দু-এক দিন বাদে আমি বলতে পারব কতজন মারা হয়েছে।

জনসাধারণ হয়তো চমকে যাবেন।

নির্দোষ, বোঝাই যাচ্ছে তারা নির্দোষ। ডেপুটি কমিশনার চার্জ করেছে তাদেরই। তাও করেছে, বহু মাইল দূরে বসে যে খবর পেয়েছে, তার ভিত্তিতে। এদের হাতে হাতকড়া

দিয়ে, পায়ে ও কোমরে ভারী শেকল পরিয়ে দিনের পর দিন আদালতে আনা হয়, অথচ বিচার করা হয় না, এ সভ্যতার কলঙ্ক।

জেল থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস তিনশো গজের কিছু বেশি দূরে। শেকলগুলো এত ভারি, যে এটুকু যেতেই বেচারীরা থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে। জেল থেকে ওরা বেরোয়। এজলাস বসে সকাল সাতটায়। জানি না সকালে তার আগে ওরা কিছু খেতে পায় কি না। তবে ডাকবাংলোয় বসে বসে দেখি জেলে ফেরার সময়ে ওরা অবসন্ন হয়ে পড়ে যাচ্ছে পথে।"

"দি বেঙ্গলী" খুব লড়েছিল বিরসা। রাঁচিতে ম্যাজিস্ট্রেট, ডি. সি. ও পুলিশ অশুভ মৈত্রী নিয়ে চোখা ইংরিজীতে শ্লেষ করেছিল। সুরেন ব্যানার্জি শুধু "দি বেঙ্গলী"-তে সম্পাদকীয় লিখছিলেন, রিপোর্টার রাঁচিতে বসিয়ে রেখেছিলেন, তাই নয়— লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিলে ভাষণ দিয়েছিলেন।

জার্মান মিশনের ডাঃ এ. নরকোট মিশনারী, প্রেম ও দয়ার ধর্মে দীক্ষিত। একা তিনি ডেপুটি কমিশনার স্ট্রীট্‌ফিল্‌ড্‌কে অভিনন্দন জানান। বন্দী মুণ্ডাদের কোর্টমার্শাল করা হোক, বলে দাবী তোলেন।

সে তিনি একাই।

"দি স্টেট্‌সম্যান" ও "দি বেঙ্গলী" কাগজে মুণ্ডাদের বিচারের প্রহসন নিয়ে যুদ্ধ চলছিল। তাতেই কি ভারত সরকারের টনক নড়ল?

ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত ও বিচার চলল ১৯০০ সালের অক্টোবরের শেষ অবধি।

সুরেন ব্যানার্জি মুণ্ডা ট্রায়ালের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। তুমি জান বিরসা, তিনি কত বড়, কত নামী ও দামী লোক?

তুমি ত টুইলা বাজাতে, বাঁশী বাজাতে। একদিন আখারায় তোমার মতো নাচতে কেউ পারেনি। চাইবাসার মিশনে মাঝে মাঝে জামা হাতে আমার কাছে চলে আসতে। বলতে, 'বল তো? কুথা দিয়া মাথা ঢুকাই, কুথা দিয়া হাত ঢুকাই?'

তুমি বলতে, 'একদিন দেখিস বাজার হতে সকল লবণ কিনা মোর মাকে দিব।'

"বেসিক হিউম্যান রাইট" কথাগুলোর মানে তোমার কাছে কি ছিল, তাই ভাবি।

লবণ—ঘাটোর সঙ্গে, জঙ্গল-আবাদী জমিতে ফসল ফলিয়ে নিজের গোলায় ফসল তোলা, বেঠবেগারী না-দেওয়া, নিজেদের অরণ্য-জীবনে শান্তিতে থাকা।

এ কি আকাশ থেকে সূর্যটাকে চাওয়া?

তেমনি স্পর্ধিত, উদ্ধত চাওয়া?

হয়তো তাই।

নইলে কেন বিচারের নামে সভ্যতার মুখে কালি লেপে দিয়ে বিচারাধীন বন্দীদের ওপর এত নির্যাতন?

কেন সুরেন ব্যানার্জি কাউন্‌সিলে গর্জে উঠেছিলেন, ফৌজদারী কার্যবিধি আইন ১০৭ ধারা মতে মুণ্ডাদের বিরুদ্ধে যে কেস, তা তুলে নেওয়া হয়েছে?

যদি তা হয়ে থাকে, তবে উক্ত ধারায় বিচার চলাকালে কতদিন মুণ্ডারা বন্দী ছিল?

হাজতে কয়জন বিচারাধীন মুণ্ডা মারা গেছে?

কাগজে যে বেরিয়েছে নতুন চার্জে খালাসপ্রাপ্ত মুণ্ডাদের আবার ধরা হচ্ছে। এ সংবাদ কি সত্য?

যদি নতুন চার্জে তাদের ধরা হতে থাকে, তবে কি সরকার তদন্ত করবেন, ওরা জেলে পাঁচ মাস ছিল যখন তখন কেন সে চার্জ আনা সম্ভব হয়নি?

"দি স্টেট্সম্যান" বলেছিল, সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল নির্দোষীদের কয়েদে রাখা। লর্ড কার্জনের কাছে সুবিচার, সত্বর বিচার চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল।

কিন্তু শাসনের চাকা কি সহজে নড়ে!

সবই হচ্ছিল বিরসা। কিন্তু জেলে গিয়ে যখন মুণ্ডাদের সামনে দাঁড়াতাম, আমার বুক ফেটে যেত।

ওরা সব বুঝত।

কত স্নেহে ধানী মুণ্ডা, ভরমি মুণ্ডা বলত, 'বাবু! তু কি করবি বল্? তুর কুন দোষ নাই। ওরা মোদের বিরুদ্ধে কুন দোষ পাচ্ছে না। তাই জেহেলে যন্ত্রণা দিয়ে সবারে মারতে চায়। ওরা বুঝে না, ভগবান যেথা মরল, সেথা মরব, বিরসাইত এই চায়।'

শাসনের চাকা যখন নড়ত না বিরসা, আমি তখন মিরাক্‌ল চাইতাম। হ্যাঁ, অলৌকিক কিছু ঘটুক। মুণ্ডা রায়ট ট্রায়ালের কলঙ্কিত দুঃস্বপ্ন শেষ হোক।

বড়লাট চাপ দিতেন ছোটলাটকে। ছোটলাট চাপ দিতেন স্ট্রীট্‌ফিল্‌ডকে। স্ট্রীট্‌ফিল্‌ড আর কুটসের তখন ধারণা হয়ে গিয়েছিল, ওরা ভগবান। ওরা সব কিছুর উপরে এবং বাইরে।

অদ্ভুতভাবে চাকাটা ঘুরছিল।

গভর্নর-জেনারেল-ইন্-কাউন্‌সিল লক্ষ করেছিলেন, "আদালতের কাজ শুরু হবার সময় থেকেই মিস্‌ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে"..."কেস দাঁড় করিয়ে ফয়সালা করতে তারপর লজ্জাকর দেরি হয়"—খালাসপ্রাপ্ত মুণ্ডাদের মধ্যে ষাট জনকে "বিচার শুরু করার আগে প্রায় একবছর আটক রাখা হয়।"

বুঝতে পারছিলেন, "বিচারটি তড়িঘড়ি ঠিকমতো শেষ হওয়া উচিত ছিল"—"ট্র্যাজিডি হল, কেস ঝুলিয়ে রাখার সময়ে চোদ্দজন মারা গেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের—দীর্ঘসুত্রতার শহীদ তারা। তাদের মধ্যে বহুজন নির্দোষ, খালাস হুকুমও হয়েছিল।"—"এই বিলম্বের ফল অশুভ হয়েছে। সরল আদিবাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা বিষয়ে এতে কোনো ভাল ধারণা জন্মাচ্ছে না।"

গভর্নমেন্ট অফ্ ইন্‌ডিয়া বলেন, "কেস তৈরি করার সময়ে এত বিলম্বের কারণ হল প্রয়োজনীয় অফিসার নিয়োগ না করা, সমস্ত কার্যভার আঞ্চলিক শাসনযন্ত্রের ওপর ফেলে রাখা।"

আঞ্চলিক প্রশাসন এ-মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন বটে, কিন্তু বিচার চলাকালে কর্মদক্ষ প্ল্যাটেল্‌কে সরিয়ে ছোকরা ও অনভিজ্ঞ কুট্‌সকে নিয়োগের কোনো সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পারেন না।

গভর্নমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া এ-ব্যবস্থাপনা "যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত" মনে করেন না এবং বলেন, "অতর্কিতে, অপ্রত্যাশায় প্ল্যাটেলকে বদলী করার ফেলে কেস নিষ্পত্তি হতে দেরি হয়েছে,— ডেপুটি কমিশনার স্ট্রীট্ফিল্ড কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখিয়েছেন। কেস চলার সময়ে এজলাসে ঢুকে পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট কুট্সের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিজেকে সমালোচনার সম্মুখীন করেছেন।"

ছোটলাট "বিচারকার্যে বিলম্বের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলেন" এবং দাবী জানালেন "বিদ্রোহ দমনে স্থানীয় প্রশাসন দ্রুততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সাফল্য দেখিয়েছেন"— "খুঁতখুঁতে বিচারককে খুশি করার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে গিয়ে এক বিদ্বিষ্ট অঞ্চলে তাদের খুব অসুবিধে হয়েছে তাতেই এত দেরি। এই বিলম্ব এমন দোষণীয় নয়, তাতে আগেকার সাফল্য ম্লান হয় না।" লর্ড কার্জন বললেন, আঞ্চলিক প্রশাসন যে-কাণ্ড করেছে, তাতে "এসব ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মোটেই মেলে না।"

অবশেষে কি হয়েছিল জান বিরসা? স্ট্রীট্ফিল্ড আর কুট্স পুলিশকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল বলে জেলকর্তৃপক্ষ মজা পেয়ে গিয়েছিল।

ওরা বন্দীদের আত্মীয়স্বজনদের বলত, 'টাকা আন্, খাবার আন্, শুধা হাতে কেউ আসামী দেখতে আসে!'

মুণ্ডাদের মা-বাপ-বউ-ছেলে-ভাই-বোনের দেবার ক্ষমতা কত তা তো তুমি জান।

ওরা যথাসাধ্য এনে এনে দিত। আর চোখ মুছতে মুছতে ফিরে যেত। জেকবকে ডেকে বলে যেত, 'সাহেব গো, আজও দেখতে দিল না।'

জেলের ভিতরে গিয়ে পুলিশ মুণ্ডাদের বলে, 'কেউ দেখতে আসে না তোদের। কেও খোঁজ নেয় না। নিজেদের বিরসাইত বলিস? তোদের আপনজন সব বিরসার ধর্ম ছেড়া দিছে!'

বলত, 'জেহেলে থাকিস, সরকারের ভাত খাস। উ দিকে আকালে তোদের সব মরতাচে। মিশন-মহাজন-দিকু-জমিদার সবারে মারতে চেয়াছিলি? এখন তারা কেউ সাহায্য করে না। করবে কেন? বাঁচায়ে রাখত তারা, বেইমানি করিস্ নাই তোরা? বেইমানী করার কালে মনে ছিল না?'

আমি ওদের কাছে যাব, সান্ত্বনার কথা বলব, সে-পথও ছিল না। আমার মুণ্ডাদের সঙ্গে দেখা করার, বলার হুকুম ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস থেকে দায়রা আদালত। অবশেষে ১৯০০ সালের মাঝামাঝি দায়রা আদালতে জুডিশিয়াল কমিশনার এফ. আর. টেইলরকে সাহায্য করতে একজন অতিরিক্ত দায়রা জজ নিয়োগ করা হয়।

ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত সকলকে টেইলর খালাস করে দেন। তিনি ষড়যন্ত্র আইনের এক নতুন ব্যাখ্যা করেন। বলেন, "অপরাধ সংঘটনের সময় অবধি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল না নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে না পারলে, কাউকে ষড়যন্ত্রের অপরাধে সাজা দেওয়া যাবে না।"

দলে দলে মুণ্ডা খালাস পেতে থাকে। তাতে গভর্নমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া আঞ্চলিক প্রশাসনের ওপর আরও খেপে যান। "দি স্টেট্স্ম্যান" আর "দি বেঙ্গলী" যা বলে

চেঁচাচ্ছিল, তাই তো প্রমাণ হল? কাগজ দুটি তো বরাবর বলে আসছে, "অধিকাংশ মুণ্ডা নিরপরাধ। কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই তবু ওদের বে-আইনে জেলে রাখা হয়েছে বছরখানেক।"

লীগাল রিমামব্রান্সারের ওপর এবার ছোটলাটও চটে যান। তিনি না বলেছিলেন, "প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রচুর সন্তোষজনক সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করা হয়েছে?" তিনি বলেছিলেন, "পুরো দলটাই সাজা পাবে?"

জেকব, "দি বেঙ্গলী" ও "দি স্টেট্‌সম্যান" একজোটে যুদ্ধ করার ফলে ১৯০০ সালের নভেম্বরে একদিন মুণ্ডা রায়ট কেস শেষ হল। সেদিন দেখা গেল রাঁচি ও সিংভূমে ৪৮২ জন মুণ্ডার বিচার হয়। শুধু আটানব্বই জন সাজা পায়, আটষট্টি জনকে শান্তি রক্ষা করে চলতে বলা হয়, দুশো ছিয়ানব্বই জন খালাস পায়। ৪৬২ জনের হিসেব পেলে তো? বিচারাধীন অবস্থায় মৃতের সংখ্যা, তোমাকে নিয়ে এতদিনে কুড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিল যে?

এতকেদিতে কন্‌স্টেব্‌লকে মারার জন্যে গয়া মুণ্ডা তার ছেলে সান্‌রে মুণ্ডা আর চক্রধরপুরে কন্‌স্টেব্‌ল হত্যার জন্য সুখরাম মুণ্ডার ফাঁসির হুকুম হয়।

যাবজ্জীবন দীপান্তর হয় ৪০ জনের। সাত বা ততোধিক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় পাঁচজনের। পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ৪ জনের। তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় ছয়জনের। তিন বছরের কম সশ্রম কারাদণ্ড হয় চারজনের—গয়া মুণ্ডার মেয়ে, বউ, ছেলের বউ একটি একবছরের শিশুর ও। মেয়ে, ছেলের বউ ও শিশুটিকে শেষ অবধি টেইলর একদিনের কারাদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দেন।

শুধু বিরাশি জনের কথা লিখতে পারলাম। বাকি ষোলোজনের কথা জানি না।

গয়া, সান্‌রে ও সুখরামের ফাঁসির হুকুম রদ করতে জেকব বড়লাটের কাছেও আপীল করেছিলেন। বড়লাট সেকথা রাখেননি। সব হয়ে যাবার পর আমার সঙ্গে গয়া, সান্‌রে ও সুখরামের কথা হয়। তখন আর আমার সঙ্গে কথা কইতে ওদের নিষেধ ছিল না কোনো।

গয়া হঠাৎ আমাকে বলেছিল, 'যতদিন আমরা আছি, ততদিন তু থাকিস, বাবু।'

কেন বলেছিল? ও কি বুঝেছিল, ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরে, আমার মূল্যবোধে আমার বিবেকে কোথাও একটা অধ্যায়ের মৃত্যু ঘটবে?

ও কি বুঝেছিল, আমি কাজ ছেড়ে দেব? নইলে কেন পিতার মতো, স্নেহময় পিতার মতো, ও বলল, 'তু খাবি কি? তু কি মুণ্ডা যি না খেয়ে অভ্যাস আছ?'

পিতার মতো —! অথচ পিতা কি মাতা কি, জানি না আমি। অনাথাশ্রমের দোরগোড়ায় ফেলে দেওয়া আঁতুড়ে শিশু।

আমার চোখ ছাপিয়ে জল পড়ছিল। ফাঁসির হুকুম শুনে,আপীল আর্জি বিফল হয়েছে জেনে এক নিরন্ন, গরিব, বৃদ্ধ মুণ্ডা, আমি কি খাব তাই ভাবছে।

ধানী মুণ্ডা বলেছিল, 'ছেলেটা কান্‌ল কেনে?'

গয়া মুণ্ডা বলেছিল, 'মোর সান্‌রে, মোর জাইমাসির মত ছেলা ত। মোদের দুঃখে কানে।'

আমাকে বলেছিল, 'জানিস না রে? মরতে মোরে সত্যিই ডর নাই। মরতে বিরসাইত ডরে? তারে মরতে দেখাছিস, সে ডরাছিল?'

গয়া ও সুখরামের আগে ফাঁসি হল। তারপর সান্‌রের ফাঁসি হয়ে গেল। মরার আগে ও অনেক জলে স্নান করতে চেয়েছিল, নতুন ও অখণ্ড বস্ত্র পরতে চেয়েছিল, কিছু খেতে চায়নি।

ওরা তিনজনের কেউই পহানের মন্ত্রোচ্চার শুনতে চায়নি। ওরা তোমার নাম করেছিল।

তারপর আমি কাজে ইস্তফা দিলাম।

জেকব বললেন, 'কেন?'

কেন, তাই কি ছাই নিজেই জানি। কিছুই ত নেই আমার। আমি এই শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থার মানুষ। এই ব্যবস্থা আমাকে না দেয় বেসিক হিউম্যান রাইট, না শেখায় বিবেক বোধ। মুণ্ডা রায়ট কেসে বাঙালী ক্রিশ্চান অমূল্য আব্রাহাম কষ্ট পায় কেন? কেন কেসের সমাপ্তিতে চাকরি ছাড়ে?

আমার যে আর কিছু ছাড়ার নেই। আমি যে আর কিছু করতে পারি না। আমার আঙুলগুলো কি পাতলা, চামড়া কি নরম, আমি না পারি তীর ছুঁড়তে, না জানি বলোয়া চালাতে। আমি শুধু এইটুকুই পারি। বাকী জীবনটা বুঝতে চেষ্টা করতে।

তোমাকে। তুমি কে? তুমি কি সময়ের আগে জন্মেছিলে, না, সময়ই তোমাকে সৃষ্টি করে?

তোমার আন্দোলন কি? মুণ্ডারা কি অরণ্যের অধিকার পাবে? খুটকাটি গ্রামে তাদের জন্মাধিকার স্বীকৃত হবে? তাদের জীবন থেকে মহাজন-বেনে-জোতদার-জমিদার-হাকিম-আমলা থানা-বেঠ বেগারীর পাষাণ ভার নেমে যাবে?

যতদিন না যাবে, ততদিন কি তুমি মরতে পার? শরীর মরে গেলে অমূল্য আব্রাহামের মত মানুষরা মরে যায়? শরীর মরলে বিরসাও মরে?

আমি চালকাড় গিয়েছিলাম। আগে গিয়েছিলাম বোর্তোদি। ডোন্‌কা মুণ্ডার আগে হল ফাঁসির হুকুম, তারপর আপীলের ফলে হল যাবজ্জীবন দীপান্তর।

সেই খতিমগাছ দেখলাম বিরসা। এখন ১৯০১ সালের নভেম্বর। এখনো সে গাছে ফুল রয়েছে।

গাছের নিচে সালী বসেছিল। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ধানী। ধানীর সঙ্গে আমাকে দেখেই ও বুঝে নিল আমি ওর শত্রু নই।

আমাকে দাওয়ায় বসাল। খুদ সিদ্ধ খেতে দিল। পরিবা ধুলো মেখে খেলছিল। সালী বলল, 'কথা শুনে না। খালি খেলা করে।'

চলে আসার সময়ে সালী আর ধানী গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। আমি বলেছিলাম, 'ডোন্‌কা নেই। এখন তোমাদের চলবে কি করে?'

সালীর চোখ হেসে উঠল। বলল, কেন? কষ্ট করা? ভগবান শিখায়ে দিয়া গেছে উলগুলানের শেষ নাই। ভগবানের মরণ নাই। মুণ্ডার জীবনে কষ্ট ফুরালে ত ভগবানের

মরণ, উলগুলানের শেষ মেনা নিতে হয়। বল?'

কিছু বলতে পারিনি আমি। তারপরে, এসেছে, চালকাড়ে।

আমি যেখানে বসে নোটবই লিখছি বিরসা, এটা একটা চ্যাটাল পাথর। পাথরটার নিচ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীটার নাম জানি না, কোনো একদিন জেনে নেব।

লিখছি, আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখছি। সামনে নদীর দিকে চেয়ে বসে আছে এক জরতী মুণ্ডা মা। তোমার মা। কর্‌মি।

রোজ সকালে কোম্‌তার বউ ওকে হাত ধরে নিয়ে আসে, এখানে বসিয়ে দিয়ে যায়। দুপুরে কোম্‌তার বউ ওকে এখানে খাবার এনে খাইয়ে যায়। রোজ বিকেলে নদীতে বাঘের জলখাবার সময় হলে কোমতার বউ, নয়তো সুগানা— তোমার বাপ, ওর হাত ধরে তুলে নিয়ে যায়।

ওর স্থির বিশ্বাস, একদিন তুমি ফিরে আসবে বলে অপেক্ষা করতে করতে ও পাথর হয়ে যাবে। সেদিন ওকে ঘরে ফিরতে হবে না।

ও বলে, 'তোমরা আমাকে ঘরে তুল কেন? এই নদী গাছ পাহাড় মাটি দেখতে দেখতে আমি তারে ফিরা পাই।'

এখন ওকে দেখলে পাথরের মূর্তি বলেই মনে হচ্ছে। ওর রুক্ষ সাদা চুল জড়িয়ে বাঁধা, শরীরের চামড়ায় ও মুখে অজস্র রেখা, নিরশ্রু চোখ বহুদূরে তোমাকে দেখতে পাচ্ছে।

আমি লিখছি। আমার ঠিক নিচ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। আমি ভেতরে তার কথা শুনতে পাচ্ছি। পাথুরে মাটি নিষ্ফলা গাছের জংলা বন দিগন্ত অবধি ঢেউ খেলানো উদ্ধত পাহাড়। আমার গায়ে লাগছে হিমেল-বাতাস। ওরা সবাই আমাকে বলে চলেছে, 'আমাদের যেমন চিরকালের সংগ্রাম, বিরসার সংগ্রামও তাই। কিছুই ফুরোয় না পৃথিবীতে— মুণ্ডারী দেশ-মাটি-পাথর-পাহাড়-বন-নদী-ঋতুর পর ঋতুর আগমন—সংগ্রামও ফুরোয় না, শেষ হতে পারে না। পরাজয়ে সংগ্রাম শেষ হয় না। থেকে যায়, কেননা মানুষ থাকে, আমরা থাকি।

আমি শুনছি। বিশ্বাস করতে এখনো পারছি না। তবে শুনতে শুনতে তোমার মাকে দেখতে দেখতে, একদিন বিশ্বাস করতে পারব তাও জানি বিরসা। এখন শুধু শুনি তবে? উলগুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ নাই। উলগুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ নাই। উলগুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ ....।

আমাকে শুনতে দাও। শুনতে না শিখলে আমি বিশ্বাস করব কেমন করে?